৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিকপত্র

দ্বাদশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

দ্বাদশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড—আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

অজানার ডাক (কবিতা) শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ৪৪১
অপটু (কবিতা) শ্রীরামেন্দু দত্ত ... ১০৮
অপূর্ব্ব সৌভ্রাত্র (গাথা) শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ... ২২৪
অমলা (উপন্যাস) শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৮৭, ৫২৯, ৬২৫, ৭৫৮
অবসর-বিনোদন—শ্রীরণদা উকীল ... ৯০০
আকাশের কথা (বিজ্ঞান) শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় বি-এসসি ... ১৮৬
আগমনী (কবিতা) শ্রীরামেন্দু দত্ত ... ৫৮৩
আত্মসংযম (দর্শন) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ... ৩২১
আনাতোল ফ্রান্স (জীবন কথা) শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল, ৯৩২
আফ্রিকান কয়লা ও বোম্বে বাজার (শিল্প-বাণিজ্য)
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৯৬
...দের ব্যথা (মাতৃমঙ্গল) শ্রীমতী গিরিবালা রায় ... ৮৪৯
...দের সম্বন্ধে (মাতৃমঙ্গল) শ্রীমনোরমা দেবী ... ২৭১
আহারে ব্যভিচার (স্বাস্থ্য-তত্ত্ব) ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়
এল-এম-এস ... ৮২৯
উকীল ও ব্যারিষ্টার (ব্যঙ্গ চিত্র) ... ২১০
উলা বা বীরনগর (কাহিনী) শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী ... ৮৭৬
একাকার (কবিতা) শ্রীগিরিজা কুমার বসু ... ১০৩
কন্যাকুমারী (কবিতা)—রায় শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর
বি-এল ... ৬৪০
কমলাকান্তের পত্র (ব্যঙ্গ ও বঙ্গ) শ্রীকমলাকান্ত ... ৬৭৬
কবিবিতান (কবিতা) কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ৬৮৯
কালুদাদা (গল্প) শ্রীরমলা বসু ... ৩৮
কৃষ্ণের কংসবধ (নক্সা) শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৪৭
কে তুমি (কবিতা) শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল ... ৯২১
কেরাণী (ব্যঙ্গ চিত্র) ... ১৭৩
কেশ-বিন্যাস ... ৯৪৪
কেষ্ট পাওয়ার ফল (গল্প) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ ... ৪৭৩
কোম্পানীর রাজত্বে শিক্ষা-বিস্তার (শিক্ষা) শ্রীমন্মথনাথ সিংহ... ৮৩৪
কোষ্ঠীর ফলাফল (নক্সা) শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৭, ৩৪৮,
কৌতুকাঙ্কন (ব্যঙ্গ চিত্র) শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এসসি ... ৭৭৮
খবরাখবর ... ৮০০
খাদ্যের অপরিহার্য্য উপাদান (স্বাস্থ্য-তত্ত্ব) শ্রীপাঁচুগোপাল
নন্দী এম-এসসি ... ৫৬২
গঙ্গাতীরে (ভ্রমণ) শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী ... ৩৬৬
"গঙ্গাতীরে"র প্রতিবাদ শ্রীপুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬৩১
গরবিনী (কবিতা) ৺অমলা দেবী ... ৮৭১
গুরু-গিরী (চিত্র) রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর ... ৭৭৪
...বরণে (কবিতা

গোয়ালিয়র মানমন্দির (ভ্রমণ) শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২
গোলদীঘি (নক্সা) অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যারত্ন এম-এ ... ৭
চট্টগ্রামের কয়েকটি দৃশ্য (বিবরণ) শ্রীজিতেন্দ্রকুমার দত্ত ... ৫
চণ্ডীদাস (কবিতা) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহ ... ৫
চণ্ডীদাসের নূতন গান (সাহিত্য) শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্যরত্ন ... ৩
চালিয়াৎ (গল্প) শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ ... ২
চিঠি (গল্প) শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দাস ... ৩
চির-অভাগিনী (গল্প) শ্রীলীলাবতী দত্ত ... ৬
চির তরুণ (কবিতা) শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
এম-এ, বি-এল ... ৪
চির-রাত্রি (গল্প) শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এম-এ ... ৭
চীন ও জাপান (ভ্রমণ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৪২
ছানি (Cataract) (চিকিৎসা-তত্ত্ব) শ্রীবঙ্কিমবিহারী ঘোষ
এম-বি ... ৩
জন্মাষ্টমী ... ৪
জন্মাষ্টমী (কবিতা) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৩২
জমীদারী বন্দোবস্ত (রাষ্ট্রনীতি) শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত
এম-এ, ডি-এল ... ৬
জব্বলপুর (ভ্রমণ) শ্রীযতীশচন্দ্র বসু বি-এ ... ৮২
জাগরণী (কবিতা) শ্রীরাধারাণী দত্ত ... ৭
জৈন ত্রিরত্ন (দর্শন) শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ বি-এ ... ৯০
থাকো (গল্প) শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৯
দয়াল (কবিতা) শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন ... ২
দানের মর্য্যাদা (উপন্যাস) শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ৮, ১৬৫, ৩২
৫০০, ৬৪৬, ৮
দাম্পত্য জীবনে নারীর স্থান (মাতৃ-মঙ্গল) শ্রীফণীন্দ্রনাথ বক্সী ... ৫৫
দারজিলিংয়ের আশেপাশে (দৃশ্যাবলী) শ্রীপ্রতুলচন্দ্র মজুমদার ... ৭
দুঃখবাদ ও জীবনের আদর্শ—একটা চ্যালেঞ্জ (দর্শন)
অধ্যাপক শ্রীকামাখ্যানাথ মিত্র এম-এ ... ৪৮
দুঃখের সুখ (কবিতা) শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ... ৯১
দুটী সনেট (কবিতা) শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ ... ৬২
দেবতা (গল্প) শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ... ৬
দেশ-বিদেশের সভ্যতায় বাঙ্গলার দান (ইতিহাস) শ্রীসত্যেন্দ্র
নারায়ণ গুহ বি-এ ... ৯০
দ্বন্দ্ব (উপন্যাস) শ্রীমতী সরোজকুমারী বন্দ্যোপা...

...জেন্দ্রলাল ও তাঁহার সঙ্গীত (আলোচনা) শ্রীদিলীপকুমার রায়
২৫০, ৫০৯
...জেন্দ্রলালের বাল্যকথা (জীবন-কথা) শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায় ১৭৪
...জেন্দ্র-সাহিত্যে—প্রেম (সাহিত্য)—শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী
বি-এসসি ... ৪৩৫
দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ (দর্শন) অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সেনগুপ্ত
এম-আই-এস-ই ... ৯৪
ধরণীর শিশু (কবিতা) শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ... ৫৫৬
ধর্ম্ম ও জীবন (ধর্ম্ম) শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ ... ৯৫
ধারাপাত (কবিতা) শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ... ৪৯৯
নওরোজা (কবিতা) শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
এম-এ, বি-এল ... ৭০
নবদ্বীপে (কবিতা) শ্রীগিরিজাকুমার বসু ... ৬৪৫
নববর্ষ (কবিতা) কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ... ১
নববিধান (উপন্যাস) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৫৩, ৬৩৩, ৭৯৩
নবীন ভাস্কর শ্রীমতিমোহন দত্তগুপ্ত ... ৮২
নারীহৃদয় ... ৮৭৫
নারীসমস্যা (মাতৃমঙ্গল) ভিক্ষু অকিঞ্চন ... ৪১২
নিখিল-প্রবাহ (বৈদেশিকী) শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এসসি
১৪০, ২৩৬, ৪০১, ৫৬৯, ৯২২
নিন্দক (কবিতা) শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ... ৭০
নির্দ্দোষিণী (গাথা) শ্রীনরেন্দ্র দেব ... ৭০৮
নির্ভর (কবিতা) শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি এল ৯৩১
নুরন্নেহার (গল্প) শ্রীমতী আবেদা খাতুন ... ৯১১
নৃতত্ত্ব (বিজ্ঞান) শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল ভাষাতত্ত্ব রত্ন এম-এ ১৮৮
পঞ্জিকা-সংস্কার (আলোচনা) উপাধ্যায় রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
বাহাদুর বিদ্যানিধি এম-এ ... ৫২০
পতিতার কথা (মাতৃ-মঙ্গল) শ্রীহরিপদ মহলানবীশ ... ৮৫২
পরকীয়া (গল্প) শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৭২
পাঁচু পরামাণিক (গল্প) শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী ... ৩০০
পাগড়ে'র ইঙ্গিত (কবিতা) শ্রীগিরিজাকুমার বসু ... ৪১১
পার্ব্বতী (গল্প) শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ... ২০১
পাহাড়ীফুল (গল্প) শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এম-এ ... ৮৫৭
"পুষ্পপরাগ" (সমালোচনা) শ্রীনরেন্দ্র দেব ... ৪১৮
পুস্তক-পরিচয় ... ৪৬১
পূর্ব্বভারতের দ্বীপাবলী (বিবরণ) শ্রীনরেন্দ্র দেব ১১৩, ২৭৬
পৃথিবী ভ্রমণ (বিবরণ) শ্রীতারকনাথ মল্লিক ... ৪২৬
প্রজাস্বত্ব আইন ও দেশের অবস্থা (রাষ্ট্রনীতি) শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন ১৯৩
প্রতিবাদের প্রতিবাদ (মাতৃ-মঙ্গল) অধ্যাপক শ্রীসত্যশরণ সিংহ
বি-এস, এম-এ-জি-এ ... ৭২
প্রতিশোধ (গল্প) শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি-এল ... ১৮৭
প্রত্নতত্ত্ব (নক্সা) শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ... ৬৮৫
প্রায়শ্চিত্ত (গল্প) শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি এল ৬৭৯
ফিলিপাইন (বিবরণ) শ্রীনরেন্দ্র দেব ৪৪৪, ৫৮৪
বাদরে (কবিতা) শ্রীরামেন্দু দত্ত ... ৪০০
ভারতবর্ষের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা (শিল্প-বিজ্ঞান)
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি-এ-সি ... ৮৪১
ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরবাদ (দর্শন) অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী ১৬১
ভারতীয় সংবাদপত্র (আলোচনা) অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার
... ৩৩৩

ভারতে খাদ্যদ্রব্যাদির ব্যবসায় (বাণিজ্যতত্ত্ব) শ্রীশচী...
সরকার
ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা (ভ্রমণ-কাহিনী) শ্রীদিলীপকুমার রায়
২৬১, ৬৯৯, ৯৩৭
মন্দিরে—কি সিন্ধুনীরে ? (কবিতা) শ্রীকালিদাস রায়
কবিশেখর বি-এ ... ৮০৭
ময়ূরভঞ্জ (প্রত্নতত্ত্ব) শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু ... ২৫৩
মহীশূর-ভ্রমণ (ভ্রমণ কাহিনী) শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই ২২৫
"মা" (গল্প) শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৫৬
মা (গল্প) শ্রীরামেন্দু দত্ত ... ৭৮৬
মাতৃবাণী (কবিতা) শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ ... ৪৪০
মাদ্রাজের উপকূলে (ভ্রমণ) শ্রীযতীশচন্দ্র বসু বি-এ ... ৩১
মিনতি (কবিতা) শ্রীবুদ্ধদেব বসু ... ৬৮
"মিলন মিলত না" (কবিতা) শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ ...
মুক্তি (কবিতা) ৺ অমলাদেবী ... ৭৯৯
মেঘের খেলা (নাট্য) শ্রীরমলা বসু ... ২৫৪
মোটরে মধুপুর (ভ্রমণ) শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ... ৯৪৫
য়ীহুদী (গল্প) শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৬১০
রসতত্ত্ব (দর্শন) অনারেবল্ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ ৬৩১
রাজগী ! (উপন্যাস) ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডিল-এল
২৭, ১৭৭, ৩৩৮, ৫১৫, ৬৭০, ৮১৯
রাজর্ষি রামমোহনের রচনা-রীতি (সাহিত্য) শ্রীশিবরতন মিত্র ৩৫৪
৺রাজা বনবিহারী কাপূর বাহাদুর ... ১৪৯
৺রাজা শ্রীনাথ রায় ... ১৬০
রাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতি (রাষ্ট্রনীতি) শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র এম এ ... ৩৩১
রোগ ও উপায় (আলোচনা) শ্রীকালিদাস বাগচী এম-এ ... ৫৫৯
লম্বকর্ণ (গল্প) পরশুরাম ... ৭১৭
বর-বরণের নূতন ছড়া (কবিতা) শ্রীকামিনী রায় বি-এ ... ২১৭
বর্ত্তমান ভারতের ক্ষাত্রশক্তি (রাষ্ট্রতত্ত্ব) শ্রীশচীন্দ্রকুমার সরকার
৪২১, ৮৩৯
বাঁধনহারা (কবিতা) মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী বি-এল ১১২
বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটী (বিবরণ) শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ৬৫৫
... ৮৪৪
বাউল (কবিতা) শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ
... ৬৭৫
বাঙ্গলার কৃষক
বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-উপনিবেশ (স্বাস্থ্যতত্ত্ব) ডাক্তার শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
এম-এ, পিএইচ-ডি, পি-আর-এস, আই-ই এস ... ৮১৫
বাজিকর (গল্প) শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ... ৩৯৬
বাদল-বেদন (কবিতা) শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বি-এ ... ২৩৫
বাদলে (কবিতা) মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী বি-এল ৪৭২
বিজ্ঞান ও সভ্যতা (বিজ্ঞান) শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি এ-সি ৩৯০
বিপত্নীক (গল্প) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৩৭৬
বিলাস-পরিণাম (গল্প) নাট্যবিদ্যাভারতী শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিভূষণ ... ৫৫০
বিবর্ত্তন (নক্সা) শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৬৯০
বিশ্বামিত্র-মেনকা (সমালোচনা) মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
... ৭৭
বৃটিশসাম্রাজ্য প্রদর্শনী ... ৭২৯
বেগম সমরুর জীবনী (ইতিহাস) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৯
ব্যর্থ (কবিতা) শ্রীঅনাথবন্ধু ঘোষাল ... ১৮৫
শরতের ডাক (ভাবপ্রবাহ) ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ
ডি-এল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

[illegible]রদ-লক্ষ্মী (কবিতা) বন্দে আলি মিঞা ... ৭২৮
শুভ্রোত্থান (কবিতা) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৬২
শোক-সংবাদ ... ১৪৫, ৬৩২, ৭৮৯,
শ্যামভূমি (বিবরণ) শ্রীনরেন্দ্র দেব ... ৭৬১, ৯০১
শ্রাবণে (কবিতা) শ্রীরামেন্দু দত্ত ... ৩১১
শ্রীক্ষেত্র (কবিতা) শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর. বি-এ ... ৯৪৩
সঙ্গীতের সংস্কার-প্রকাশভঙ্গী ও ব্যক্তিত্ব (সঙ্গীতশাস্ত্র) শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ১০৪
সভ্যতা বিকাশের আর্থিক ব্যাখ্যা (সমাজতত্ত্ব) অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ ... ১৭
সম্পাদকের বৈঠক ... ১৫০, ২৯৫, ৪৬৭
১৫৭, ৩১২, ৪৭৮, ৬৩৮, ৯৫৮
স্যর আশুতোষ চৌধুরী ... ১৪৬
স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ... ১৫৮
সাহিত্য-সংবাদ ... ১৬০, ৩২০, ৪৮০, ৬৪০, ৮০০, ৯৬০
সিদ্ধেশ্বরের সিদ্ধি (গল্প) শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ ... ৭৫২
"—সিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে" (বিজ্ঞান) অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ ...
সেবা ও সেবক (কবিতা) শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ...
সোণার কাঠি (গল্প) শ্রীরমেশচন্দ্র বসু ...
সোণার তরী (সাহিত্য) শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ...
সোম (বিজ্ঞান) শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ ... ১৮২,
সোলতান সেথ (কবিতা) শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ...
সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও "মরমী" কবিতা (সাহিত্য) শ্রীগোপাল হালদার বি-এ ...
স্বপ্ন (উপন্যাস) শ্রীমণীন্দ্রলাল ... ১৩৫,
স্বপ্নাবস্থার সহিত জাগ্রত অবস্থার সম্বন্ধ (বিজ্ঞান) অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম-এ ...
হাতীধরা (শিকার) শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ... ২১১,
হিজলীতে পোর্ত্তুগীজ (ইতিহাস) শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ ...
হিন্দুর পরলোকতত্ত্ব (দর্শন) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ ...
হুমায়ুন্-নামা (ইতিহাস) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...

চিত্র-সূচী

আষাঢ়—১৩৩১

কৌম নদী ... ৩১
আদেয়ার নদী ও বোট ক্লাব ... ৩১
সেনেট গৃহ—মান্দ্রাজ ... ৩২
প্রেসিডেন্সি কলেজ—মাদ্রাজ ... ৩৩
চেপক প্রাসাদের এক অংশ ... ৩৩
ময়লাপুরের হিন্দু-মন্দির ... ৩৪
স্যানথোম গির্জ্জা ... ৩৫
[illegible] ... ৩৬
একটী কূপ ... ৩৭
সমুদ্রতীর—দ্বারকা ... ৪৭
দ্বারকানাথের মন্দির ... ৪৮
গোমতীতীরস্থ মন্দির ... ৪৯
সমুদ্র-বন্দর ... ৫০
দ্বারকানাথের বিগ্রহ ... ৫১
বাতাসিয়া লুপ ... ৭৯
সেভোকের দিকে তিস্তা ... ৭৯
কালিম্পংয়ের দিকে তিস্তা ... ৮০
রায়াং লুপ— ... ৮০
কালীঝোরা ... ৮১
তিস্তার উপর ঝোলাসেতু ... ৮১
রায়াংয়ের নিকট তিস্তা ... ৮২
ভাস্কর শ্রীমতিমোহন দত্তগুপ্ত ... ৮২
শ্রীমতী এনিবেসান্ত ... ৮৩
পরলোকগত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৩
পূজারিণী ... ৮৪
সাঁঝের বাতি ... ৬৪
কালীয় দমন ... ৮৫
শচী ও রুদ্রপীড় ... ৮৬
[illegible] মন্দির ... ৮৬
"গঙ্গাতীরে" ... ৮৬
ক্ষেত্র কর্ষণ ...
সুমাত্রার সুসজ্জিত কিশোর ...
যবদ্বীপের একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ...
মুর্গীর লড়াই ...
মাদুরা দ্বীপের সুন্দরী ...
মুর্গীর লড়াইয়ের খেলোয়াড়রা ...
রবার গাছে অস্ত্রোপচার ...
সুগন্ধ পত্র চয়ন ...
রবারের আটা সংগ্রহ ...
তুলা সংগ্রহ ...
বালীদ্বীপের সুন্দরী ...
বালীর একটী মন্দির-প্রাঙ্গণ ...
সুমাত্রায়...কর্ণাভরণ ...
বালীর...এসেছে ...
সুমাত্রার সম্ভ্রান্ত মহিলা ...
যবদ্বীপের চাষার মেয়ে ...
বালদ্বীপের কীর্ত্তনী ...
বালীদ্বীপের পথ ...
যাবন দম্পতী ...
বালীন দম্পতী ...
বালীর...বিশ্রামালাপ ...
কড়াইসু টী বাছাই ...
পূর্ব্ব যবদ্বীপের সুন্দরী ...
পিতলের উপর কারুকার্য্য ...
খুবাভয়ার খাবারওয়ালী ...
তৈরী ভাতের ফেরিওয়ালা ...
জোক্‌জোকর্ত্তার বিচারালয় ...
যবদ্বীপের খৃষ্টানরা ...
বীজবপন ...
পূর্ব্ব যবদ্বীপের নিরাভরণ সৌন্দর্য্য ...
পশ্চিম যবদ্বীপের সুন্দরী ...
যবদ্বীপের পল্লীবাসিনী ...

[illegible]গরবিনী (কবিতা) [illegible]
[illegible]গুরু-গিরা (চিত্র) রায় শ্রী[illegible] সেন বাহাদুর
৭৭৪ স্বপ্ন (উপন্যাস) শ্রীমতী সরোজকুমারী [illegible]

অধ্যয়ন ... ১২৫
পর অভিনেতা ... ১২৫
বীরপুরুষ ... ১২৬
সম্ভ্রান্ত মহিলা ... ১২৭
পর কর্ম্মকার ... ১২৮
মের আড্ডার সর্দ্দার ... ১২৮
এক ধনপতির গৃহদ্বার ... ১২৯
র দরিদ্র কুটীর ... ১২৯
পের উদ্যানচারিণী ... ১৩০
র ধনী গৃহ ... ১৩০
কার......হয়েছে ... ১৩১
কাটা ... ১৩১
পের নারিকেলকুঞ্জ ... ১৩২
দের জলবিহার ... ১৩৩
তার ছোট নদী ... ১৩৩
রি মাঝী ... ১৩৩
শল্প ... ১৩৪
র পল্লী-দম্পতী ... ১৩৪
ও জিম ... ১৪০
ওঙ্গো ... ১৪০
কাঁটার ঘড়ী ... ১৪০
রের যষ্টি ... ১৪১
গ্রাফোন ... ১৪১
র বীজাণু পরীক্ষা ... ১৪২
র উপকারিতা ... ১৪২
ড়ত দীপ সংযুক্ত ক্ষৌর দর্পণ ... ১৪২
হর ক্ষয় ... ১৪৩
দর্পণ ... ১৪৩
টর সাইকেলে মাল সরবরাহ ... ১৪৪
পের কাজের......উচিত নয় ... ১৪৪
লার ধারে......উচিত নয় ... ১৪৪
টতে পড়িয়া......ক্ষতিকর ... ১৪৪
র আশুতোষ চৌধুরী ... ১৪৫
র আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ... ১৪৭
জা বনবিহারী কাপুর বাহাদুর ... ১৫০
জা শ্রীনাথ রায় ... ১৫৯

বহুবর্ণ চিত্র

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—প্রচ্ছদ পট
সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি ৩। বিশ্বামিত্র-মেনকা
সঙ্গীতের বিকাশ ৫০। পরদানসিন

শ্রাবণ—১৩৩১

রাণী ... ১৭৩
কীল ও ব্যারিষ্টার ... ২১০
তীর কোট ... ২১১
ন ধরা হাতীকে তিনটী পোষা হাতী দিয়া বাঁধিয়া লইতেছে ... ২১২
া পড়িবার......হইয়াছে ... ২১৩
ন হাতীকে......হইতেছে ... ২১৫
তী পরতালা......হইতেছে ... ২১৫
মানমন্দিরের বাহিরের দৃশ্য ... ২
মানমন্দিরের চক ... ২২০
রাণীতাল ... ২২১
গুর্জ্জরী মহল ... ২২২
গোয়ালিয়র দুর্গের মানচিত্র ... ২২৩
দেবতার শোভাযাত্রার রথ ... ২২৭
গোপুরম্ ... ২২৯
পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ......অনুশোচনা ... ২৩১
পথের বরফ সাফ করবার কল ... ২৩৬
রাস্তা পরিষ্কার......হচ্ছে ... ২৩৬
শূন্যে উত্তোলিত অট্টালিকা ... ২৩৭
নানাপ্রকার......ঘটে ... ২৪৭
দূরবীণ নিয়ে......করছেন ... ২৩৮
সূর্য্যের অগ্নিময় ক্ষেত্র ...
সূর্য্যের মণ্ডলত্রয় ... ২৩৮
বজের সহিত খেলা ... ২৩৯
মাংসপেশীর.........যন্ত্র ... ২৩৯
কুকুর.........ধরেছে ... ২৪০
বালকগণ......হচ্ছে ... ২৪০
চোর ধরবার......হচ্ছে ... ২৪০
চিত্রসাহায্যে......হচ্ছে ... ২৪০
রেডিয়ম মিশ্রিত পানীয় ... ২৪১
যন্ত্রের দ্বারা......হচ্ছে ... ২৪১
নরমুণ্ডের ঘড়ি ... ২৪১
হাত ভাঙার চিকিৎসা ... [illegible]
স্বভাব নিরূপণ করবার যন্ত্র ... ২৪২
পা ভাঙার চিকিৎসা ... ২৪২
কোমর ও ঘাড় ভাঙার চিকিৎসা ... ২৪৩
মাটী খোঁড়বার......যন্ত্র ... ২৪৩
পৃথিবীর......মুখ ... ২৪৩
খোলাফ্রেমের সার্শী ... ২৪৪
নক্ষত্রের......যন্ত্র ... ২৪৪
ডিপ্‌থেরীয়ার নূতন চিকিৎসা ... ২৪৫
অক্সিজেনপূর্ণ কক্ষ ... ২৪৫
শরীরের উপর মস্তিষ্কের প্রভাব... ... ২৪৬
সাঙ্কেতিক......কৌশল ... ২৪৭
মা ছেলের......নিচ্ছেন ... ২৪৭
চার কোটী বৎসরের পুরাতন হংসডিম্ব ... ২৪৮
কাগজে উঠান পায়ের ছাপ ... ২৪৮
ম্যাগেজিন গেট ... ২৬১
পৃথ্বীরাজ-মন্দির দিল্লী ... ২৬১
দেওয়ানী আম—আগ্রা ফোর্ট ... ২৬৩
জুম্মামসজিদ-আগ্রা ... ২৬৩
পুরাতন গোবিন্দজীর মন্দির—বৃন্দাবন ... ২৬৫
শেঠেদের মন্দির—বৃন্দাবন ... ২৬৫
সাজীও মন্দির—বৃন্দাবন ... ২৬৭
লালাবাবুর কুঞ্জ—বৃন্দাবন ... ২৬৭
বঙ্কুবিহারীর ঘেড়া—বৃন্দাবন ... ২৬৯
যমুনাতীর—মথুরা ... ২৬৯
রণতরী ... [illegible]
সুসজ্জিতা দায়াক সুন্দরী ... [illegible]

কায়ানের দেবপূজা ...
কায়ানদের মুদ্রা ...
দায়াক বালক-বালিকা ...
শুভাশুভ নির্ণয় ...
ভূত ছাড়াবার.....নৃত্য ...
ক্লেমেন্তান তরুণীদ্বয় ...
কায়ান মেয়ে ...
নবান্ন পর্ব্বে নৃত্যোৎসব ...
সুলক্ষণযুক্ত পাখীদের বাসস্থান ...
শিশুর মাথা চ্যাপ্টা করা হচ্ছে ...
ক্লেমেন্তান কবর ...
কেণীয়াদের পল্লীদেবতা ...
মহাকাম নদীতীরের সমাধি ক্ষেত্র ...
দায়াকের ফুল্‌কাট দাঁত ...
লক্ষণ বিচার ...
দায়াকের মুদ্রা ...
রণসাজে সজ্জিত বরণীয়বাসী ...
স্তূপাকৃতি ক্লেমেন্তান সমাধি ...
ঋতু নির্ণয় ...
বরণীয় যোদ্ধা ...
গৃহের রক্ষাপ্রাকার ...
পুনান মেয়েরা.....যায় ...
কুম্ভীর বন্ধু ...
মুর্গীর লড়াই ...
লাইরঙ যোদ্ধা ...
রণজয়ী দায়াক বীর ...
যুদ্ধে সংগৃহীত নরমুণ্ড ...
দায়াকের বিবাহ-সভা ...

বহুবর্ণ-চিত্র

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রচ্ছদপট

২। রথাগ্রে শ্রীচৈতন্য ৩। নিস্তব্ধ নিশীথে

৪। জলবালা ৫। সন্ধ্যা-প্রদীপ

ভাদ্র—১৩৩১

মায়াপুরে.....শায়িত ...
মায়াপুরে.....সমাধি ...
মায়াপুরে.....বিগ্রহ ...
প্রাচীন.....দৃশ্য ...
মায়াপুরে চৈতন্য মঠ ...
বামুনপুকুরে চাঁদ কাজীর গোর ...
বামুনপুকুরে বল্লাল ঢিবি ...
শ্রীপুরে.....শিবমন্দির ...
শ্রীপুরে বুড়াশিবের মন্দির ...
শ্রীপুরে চণ্ডীমণ্ডপ ...
শ্রীপুরে গোবিন্দজীউর মন্দির ...
সুখড়িয়ায় হর.....মন্দির ...
সুখড়িয়ার.....নবরত্ন মন্দির ...
সুখড়িয়ার দুর্গাপূজার দালান ...
সুখড়িয়ার.....প্রাসাদ ...
সুখড়িয়ার.....দৃশ্য ...
সুখড়িয়ার.....মন্দির ...
সুখড়িয়ার.....কারুকার্য্য ...
২৭৭ নবনির্ম্মিত বিমানের ভিতরের দিক ... ৪০১
২৭৮ রসকোষের সন্ধান ... ৪০২
২৭৮ রসকোষের পরীক্ষা ... ৪০২
২৭৯ যূর্ণিবায়ু (প্রথম অবস্থা) ... ৪০২
২৭৯ যূর্ণিবায়ু (দ্বিতীয় অবস্থা) ... ৪০৩
২৮০ যূর্ণিবায়ু (তৃতীয় অবস্থা) ... ৪০৩
২৮০ শিশুর রসকোষের চিকিৎসা ... ৪০৩
২৮১ বধিরের শ্রবণশক্তি ... ৪০৪
২৮২ কনুইয়ের হাড় জোড়বার কৌশল ... ৪০৪
২৮২ হাঁটুর ঐ ঐ ... ৪০৪
২৮৩ চোয়ালের হাড় জোড়বার কৌশল ... ৪০৫
২৮৪ বেতারে লেখা ... ৪০৫
২৮৪ গুলি পরীক্ষা ... ৪০৫
২৮৪ নিক্ষিপ্ত গুলি পরীক্ষা ... ৪০৫
২৮৪ প্রাপ্ত গুলি পরীক্ষা ... ৪০৫
২৮৫ লোহার পিপা (প্রথম অবস্থা) ... ৪০৬
২৮৫ ঐ ঐ (দ্বিতীয় ঐ) ... ৪০৬
২৮৫ ঐ ঐ (তৃতীয় ঐ) ... ৪০৬
২৮৬ চোখের বালি ... ৪০৬
২৮৬ শ্রমের ওজন ... ৪০৭
২৮৭ বরুণপুরের প্রদীপ ... ৪০৭
২৮৭ আখরোট-ভাঙ্গা কল ... ৪০৮
২৮৮ পাথরের মূর্ত্তি ... ৪০৮
২৮৮ পরীক্ষাগারে এডমণ্ড সাহেব ... ৪০৯
২৮৯ চন্দ্রের অভ্যন্তর ... ৪০৯
২৮৯ চন্দ্রের প্রাকৃতিক দৃশ্য ... ৪১০
২৯০ বিলিয়ার্ড বলের জন্ম (১) ... ৪১০
২৯০ বিলিয়ার্ড বলের জন্ম (২) ... ৪১০
রোদ পোহান ... ৪১১
মোটরে ভূপ্রদক্ষিণ-কারিণী মিস ওয়াণ্ডারওয়েল ... ৪২৭
ওয়াণ্ডারওয়েল ভ্রাতা-ভগিনী ... ৪২৮
আইগোরোটদের সমর-নৃত্য ... ৪৪৪
আইগোরোট কুলি-রমণী ... ৪৪৪
৩৫৭ ফিলিপাইনের সুসজ্জিতা তরুণী ... ৪৪৫
৩৬৭ আইলোঙ্‌গোট কুলী-রমণী ... ৪৪৫
৩৬৮ ফলওয়ালী ... ৪৪৬
৩৬৮ সুবুয়ানো মেয়ে ... ৪৪৬
৩৬৯ জঙ্‌লী আইলোঙ্গোট্ ... ৪৪৬
৩৬৯ উৎসব সাজে সজ্জিতা কলিঙ্‌গা মেয়ে ... ৪৪৭
৩৭০ গৃহকর্ম্মরতা ... ৪৪৭
৩৭০ মোরো চৌকীদার ... ৪৪৭
৩৭১ মান্দায়া শিকারী যুবক ... ৪৪৮
৩৭১ বাগালো সুন্দরী ... ৪৪৮
৩৭৩ তিঙগুইয়ান্ সর্দ্দারণী ... ৪৪৮
৩৭৩ পসারিণী ... ৪৪৬
৩৭৪ ফিলিপাইনের মুসলমান যোদ্ধা ! ... ৪৪৯
৩৭৫ মানোবোদের বৃক্ষবাটিকা ... ৪৫০
৩৭৫ রজকিনী ... ৪৫০
৩৭৭ আগুশান সৈরিন্ধ্রী ... ৪৫০
৩৭৯ ফিলিপাইনের বর-ক'নে ... ৪৫১
৩৮১ উৎসব বেশে ফিলিপাইন বাদকদ্বয় ... ৪৫১

কুম্ভবাহিনী, আইগোরোট যোদ্ধা ... ৪৫২
প্যাপীর অনুতাপ, আইগোরোটের কুটীর, মান্দায়া যুবতী ৪৫৩
আইলোঙ্গোট মেয়ে, কলিঙ্গা মেয়েদের সাজ-সজ্জা ৪৫৪
টুপি বোনা, বীরবেশী বাগালো যুবক, বাগালো সর্দ্দার ৪৫৫
কলিঙ্গা সর্দ্দার ও তাহার পত্নী কলিঙ্‌গা ছেলে, বেঙগুয়েত বালিকা ৪৫৬
কলিঙ্‌গা মেয়ে ... ৪৫৭
ডুবালী ছোকরা, আইগোরাট মহিলা ... ৪৫৮
ফিলিপাইনের বনবালা ... ৪৫৯
জন্মাষ্টমী ... ৪৬৬

বহুবর্ণ চিত্র

১। রাজনারায়ণ বসু—প্রচ্ছদপট

২। শেষ সম্বল ৩। কাশ্মীর-ডালহ্রদে মাঝিয়াল

৪। "চনাব তীরে রঞ্জা" ৫। রাধিকারমণ

আশ্বিন—১৩৩১

নক্ষত্রচক্র ... ৫২১
পরীর পাহাড় হইতে ... ৫৩১
পরীর পাহাড়—অপর দৃশ্য, ডবল মুরিং জেটী ... ৫৩৩
চট্টগ্রাম বন্দর ... ৫৫৪
চট্টগ্রাম বন্দর—অপর দৃশ্য ... ৫৩৪
পাহাড়তলী যাইবার পথে, পাহাড়তলী যাইবার একটী পথ ৫৩৫
আক্কর খাঁর দীঘি, সার্কিট হাউস ... ৫৩৬
বায়জিদ বোস্তামী ... ৫৩৭
চট্টগ্রামের অপর দৃশ্য ... ৫৩৮
সঙ্ঘবদ্ধ হস্তীবর্গ ... ৫৩৯
আসামের গভীর জঙ্গল ... ৫৪০
আসামের অপর জঙ্গল ... ৫৪১
হস্তীগণের নদীপার ... ৫৪২
ময়মনসিংহ—ব্রহ্মপুত্র, হাতীর আহার সংগ্রহ ... ৫৪৩
হস্তীর স্নান ... ৫৪৪
ঈথরের ঢেউ, তড়িৎ পরিচালন, তড়িতের হ্রাসবৃদ্ধি ৫৪৭
তড়িৎ পরিচালক, কারাগারভনে বেতার আফিস ... ৫৪৮
পরীক্ষাগারে ডাঃ লি ডিফরেষ্ট ... ৫৬৯
আগুণ নিভাবার কল, পরীক্ষাগারে শেবিংহাম ৫৭০
কৃত্রিম দিবালোক, ভুল বসা, ঠিক দাঁড়ান, ভুল দাঁড়ান, ঠিক বসা ৫৭১
বিজ্ঞানসম্মত বসবার চেয়ার, মার্কামারা বাড়া (১) ৫৭২
মার্কামারা বাড়ী (২) ... ৫৭২
মার্কামারা বাড়ী (৩) ... ৫৭২
পরীক্ষাগারে মিস্ নিকোলেট, ব্যায়ামাগারে বুথনার ৫৭৩
রণজেশ গাড়ী (১), রণজেশ গাড়ী (২) ... ৫৭৪
কম ওজন ধরবার কল ... ৫৭৪
শূন্যে ফটো তোলবার কল (১), ঐ (২), ... ৫৭৫
একখানি ছবি, পাখীধরা ছিপ (১), পাখীধরা ছিপ (২) ৫৭৫
আইগোরোটদের নৃত্য-লীলা, আইগোরোট বাজনদার ৫৯২
পঞ্চায়েতের সভাস্থল, তিঙগুইয়ান পরিণয় ... ৫৯৩
বলির উদ্যোগ ! ইফুগায়োদের নৃত্য ... ৫৯৪
বাঁশ তরঙ্গ, গোঁসাই মা, ইলোঙ্‌গোট যোদ্ধা ... ৫৯৫
ঐ তালীলা, নিগ্রো রমণী ... ৫৯৬
ইফুগায়া মেয়েরা, তিঙগুইয়ান যোদ্ধা ! ... ৫৯৭
বৃদ্ধ ইফুগায়ো বীর, বংশীবাদক তিঙগুইয়ান, সুবানুন রমণী ৫৯৮
সুসজ্জিত শবদেহ ... ৫৯৯
মহামহোপাধ্যায় ৺ যাদবেশ্বর তর্করত্ন ... ৬৩২

বহুবর্ণ চিত্র

১। রাজা রামমোহন রায়—প্রচ্ছদপট

২। দরগা-দুয়ারে ৪। একলব্যের গুরুদক্ষিণা

৩। দেবদাসী ৫। সোপান-পথে

কার্ত্তিক—১৩৩১

বাঁশবেড়িয়া দুর্গের তোরণদ্বার ... ৬৫৫
বাঁশবেড়িয়ার তোরণদ্বারের সম্মুখে বকুলকুঞ্জ ... ৬৫৫
বিষ্ণুমন্দির (১), বিষ্ণুমন্দির (২) ... ৬৫৬
হংসেশ্বরী মন্দির ... ৬৬৭
হংসেশ্বরী মন্দিরের নাট্য-মন্দির ... ৬৫৭
বাঁশবেড়িয়ার ৺শ্রীরাধিকা, ৺শ্রীগোপাল জীউ ৬৫৮
বাঁশবেড়িয়ার মন্দির সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান ... ৬৫৯
বাঁশবেড়িয়ার ৺সয়ম্ভবা ... ৬৫৯
বাঁশবেড়িয়ার বিষ্ণু বা বাসুদেব ... ৬৬০
বাঁশবেড়িয়ার ৺বাসুদেব ও সয়ম্ভবা মন্দির ... ৬৬০
বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী দেবী ... ৬৬১
বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী মন্দির ... ৬৬২
বাঁশবেড়িয়ার রাজবাটীর উত্তরাংশ—অভ্যর্থনাগৃহ ৬৬৩
বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয় ... ৬৬৩
বাঁশবেড়িয়ার.....সনন্দ ... ৬৬৪
বাঁশবেড়িয়ার.....ইয়াদ্‌দস্ত ... ৬৬৫
গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস ... ৬৬৫
বঙ্গের ছোটলাট সার জন উড বরণ ... ৬৬৫
বাঁশবেড়িয়ার রাজা পূর্ণেন্দুদেব রায় মহাশয় ৬৬৬
বাঁশবেড়িয়ার.....ইয়াদ্‌দস্ত (২) ... ৬৬৩
বাঁশবেড়িয়ার.....ইয়াদ্‌দস্ত (১) ... ৬৬৭
কুমার মুনীন্দ্রদের রায় মহাশয় ... ৬৬৯
বাঙ্গলার কৃষক ... ৬৭৫
মান্দ্রাজ—লাটপ্রাসাদ ... ৬৯৯
সমুদ্র হইতে মান্দ্রাজ ... ৭০০
সমুদ্র হইতে মান্দ্রাজ—কাটামারান্স ... ৭০১
এগমোর ষ্টেসন—মান্দ্রাজ ... ৭০১
কবলেশ্বর মন্দির—মাইলাপুর ... ৭০২
মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ... ৭০৩
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হল—মান্দ্রাজ ... ৭০৪
মান্দ্রাজ—চেপুক প্রাসাদ ... ৭০৫
সেনাপতি নীলের প্রতিমূর্ত্তি ... ৭০৬
লম্বকর্ণ ... ৭১৭
দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা ... ৭১১
হজোর ... ৭২০
ছুটে বল্লে হালুম ... ৭২৩
মরচি টাকার.....খেতে ... ৭২৪
লুচি কখানি খেতেই হবে ... ৭২৭
লম্বকর্ণ ... ৭২৮
পাতিয়ালায় পশু-চর্ম্ম-বিন্যাস ... ৭২৯
চা-বাগানের দৃশ্য ... ৭২৯
হ্রদ হইতে রাত্রিকালের দৃশ্য ... ৭৩০
প্রদর্শনীতে মান্দ্রাজ বিভাগ ... ৭৩০
মহীশূরের কাষ্ঠের উপর কারুকার্য্য ... ৭৩০
পঞ্চাবের চালায় সরঞ্জাম ... ৭৩১
নীলের কারখানা, ভারতীয় প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয় ৭৩২

Printing Works.

বৃটিশ গবর্মেণ্টের আফিস, বিকানীর প্রদর্শনী, ... ৭৩২
ভারতীয় প্রদর্শনীর প্রধান প্রবেশদ্বার ... ৭৩২
হংকংয়ের প্রদর্শনী, ব্রহ্মদেশের প্রদর্শনী ... ৭৩৩
ত্রিবাঙ্কুরের কাষ্ঠের উপর কারুকার্য্য, ব্রহ্মদেশের কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্বার ৭৩৪
বরোদা প্রদর্শনী, বাঙ্গলা দেশের রৌপ্যের কারুকার্য্য ৭৩৫
কাশ্মীর-প্রদর্শনী, মহীশূরের চন্দন কাষ্ঠের কারুকার্য্য ৭৩৫
সমগ্র......সর্ব্বোৎকৃষ্ট, মান্দ্রাজের কারুকার্য্য ... ৭৩৬
মহীশূরের শিকারলব্ধ হস্তীদন্ত ইত্যাদি ... ৭৩৬
লাক্ষা কারখানা, সম্রাট......দৃশ্য, বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীর ৭৩৭
আমোদ প্রমোদ বিভাগ, প্রদর্শনীতে বোম্বাই শিল্পসদন ৭৩৮
জয়পুরের কাঁসার কারুকার্য্য, বোম্বাই......কক্ষ ... ৭৩৯
বাঙ্গলার পল্লী......দৃশ্য, প্রদর্শনীতে ইকনমিক জুয়েলারী ষ্টল ৭৪০
লাহোর আর্ট স্কুলের নির্ম্মিত মণ্ডপ ... ৭৪১
প্রদর্শনীতে মালয় উপদ্বীপের অঙ্গন ... ৭৪১
ভারতের যুক্তপ্রদেশের দ্রব্য-সম্ভার, বিকানীরের কাঠের কাজ ৭৪২
শ্যামভূমি, চূড়ামুণ্ডনের জন্য সুসজ্জিত বালক ... ৭৬১
চৈত্রমরু উৎসব, শ্মশান-যাত্রা ... ৭৬২
নৃপতি সুলালন কর্ণেরচিতামঞ্চ, চূড়ামুণ্ডনের অধিবাস রাত্রে ৭৬৩
শ্মশান-ভূমি, ভূমিকর্ষণ উৎসব ... ৭৬৪
বাজারের একটী দোকান, কাবেন তরু ৭৬৫
ফ্রাপাতুমের বৌদ্ধমন্দির, মীয়াও ... ৭৬৬
রাজপ্রাসাদের দ্বারে, ঘুটি খেলা ৭৬৭
চূড়ামুণ্ডন, শ্যামের নর্ত্তকী ... ৭৬৮
কামু বালকদ্বয়, মীয়াও বালিকা ... ৭৬৯
রঙ্গমঞ্চের উপর নৃত্য ৭৭০
বৌদ্ধমঠ ও ভিক্ষুর দল, নাটকাভিনয়ের একটি দৃশ্য ৭৭১
গৃহকর্ত্রী ও [illegible] বালক ভৃত্য ৭৭২
দোল পর্ব্ব, শ্যামভূমির মানচিত্র ... ৭৭৩
ব্রিটিশ সিংহদল, টেক্সর চাপন, ধরে রাখা দায় ... ৭৭৮
ঝুটি ছাঁটা, রুটির নাগাল, জাগরণ, লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায় ৭৭৯
ফরাসীর দুঃস্বপ্ন, দোসরা ঘর দেখো, জলের পিপে ৭৮০
আয়কর, নিজের নাক কেটে পারর যাত্রা ভঙ্গ ... ৭৮১
সিংহ ও শার্দ্দূল, রেতার বিড়ম্বনা ৭৮১
আয়-আয়, অসার ভোট, কর্ত্তার মর্জ্জি ... ৭৮২
রাষ্ট্রীয় রথে, শিশু বলি ... ৭৮৩
চাচা আপন প্রাণ-বাঁচা ... ৭৮৩
খাদ্যের দুর্ম্মূল্যতা, হাটে হাঁড়ি ভাঙা, আশার বাণী ৭৮৪
একাই একশ, মার্কিণের মার্কা, জজের ডাক্তারী ... ৭৮৫
৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু ... ৭৮৯

বহুবর্ণ-চিত্র

১। দীনবন্ধু মিত্র—প্রচ্ছদপট
২। ওং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী ৪। হরপার্ব্বতী
৩। ...ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার ৫। চঞ্চল চল চরণে...

অগ্রহায়ণ—১৩৩১

জব্বলপুর ... ৮২৩
রবার্টণ আঞ্জুমান ইসলামিয়া স্কুল ... ৮২৪
ষ্টেসন ... ৮২৫
গৌর নদীর সেতু ... ৮২৬
আলগা প্রস্তর খণ্ড, আদালত গৃহ ... ৮২৭
চৌনষট্ মন্দির ... ৮২৮
[illegible] হৃদয় ... ৮৭৫
উলার ৺উলাইচণ্ডী তলা ... ৮৭৬
বৈশাখী পূর্ণিমার মেলা, টীন আচ্ছাদিত চণ্ডীমণ্ডপ... ৮৭৭
দুর্গাপূজার চণ্ডীমণ্ডপ ... ৮৭৮
কাষ্ঠের উপর কারুকার্য্য ... ৮৭৯
চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরের কারুকার্য, যোড় বাঙ্গলা মন্দির ৮৮০
যোড় বাঙ্গলা মন্দিরের কারুকার্য্য ... ৮৮১
৺বিষ্ণু মন্দির ... ৮৮২
বোধনের প্রাচীন বিল্ববৃক্ষ, মুস্তৌফীবাটীর সদর দরজা ৮৮৩
যোড়া শিব মন্দির, ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী ... ৮৮৪
নিষ্কর ভূমির দানপত্র ... ৮৮৫
কয়েকটি ভগ্ন স্তম্ভ, ৺চাঁদরাণীর যোড়া শিবমন্দির ... ৮৮৬
আত্মবিক্রয় পত্র ... ৮৮৭
রাজার দীঘি, দুর্গামন্দিরের সম্মুখ ভাগ ... ৮৮৮
দুর্গামন্দিরের পার্শ্ব ভাগ, ঠাকুরবাড়ীর পশ্চিমের শিবমন্দির ৮৮৯
উলার ৺অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা ... ৮৯০
মুখোপাধ্যায় বাটীর সিংহদ্বার ... ৮৯০
অবসর-বিনোদন ৯০০
শববাহী রাজ-তরণী, শ্যামের পল্লীভবন ৯০১
মহারাজের শবাধার ... ৯০২
রাজতরণী, শ্মশান পথেশববাহী রথ ... ৯০৩
যুবরাজের প্রব্রজ্যা, রেকুন উপলক্ষে রাজার শোভাযাত্রা ৯০৪
বন্যহস্তী শিকার ... ৯০৫
শ্যাম রাজ্যে শিক্ষা-সচিব, বৌদ্ধমঠে উপাসনা ... ৯০৬
শ্যামভূমির সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক, রাজ্যাভিষেক সভা ৯০৭
চোর ও পুলিশ ... ৯০৮
সুসজ্জিত চিতামঞ্চ ... ৯০৯
গিরা সেটি ... ৯২২
ক্লোরিণ চিকিৎসা ক'রবার অন্দর ঘর, রোগী থাকবার ঘর ৯২৩
আদর্শবিদ্যালয়, আট হাজার ফিট উপরে, বত্রিশ হাজার ফিট উপরে ৯২৪
হাঁসপাতাল, রসায়ন পরীক্ষা সমিতি (১), রসায়ন পরীক্ষা সমিতি (২) ৯২৫
রসায়ন পরীক্ষা সমিতি (৩), তেরমেসে পঞ্জিকা ... ৯২৬
নবাবিষ্কৃত উনান (১), নবাবিষ্কৃত উনান (২) ... ৯২৭
মারণরশ্মি ... ৯২৭
মারণরশ্মি পরীক্ষা, পরীক্ষাগারে হেরী সাহেব ... ৯২৮
বীজাণু পোষ, রেডিওফোণ ... ৯২৯
আনাতোল ফ্রাঁস ... ৯৩২
মহাত্মা গান্ধী ... ৯৩৯
শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ... ৯৪১
কেশ বিন্যাসে ... ৯৪৪
মোটরে মধুপুর ... ৯৪৫
প্রথমবার টায়ার বদলান হইল ... ৯৪৯
আবার টিউব ফাটিল ... ৯৫০
১০০ মাইল উৎসব এইখানেই সম্পন্ন হইয়াছিল ... ৯৫১
কিঞ্চিৎ সুখানুভূতি ... ৯৫৫
আরও কিঞ্চিৎ ... ৯৫৬
"সুখের নাহিক ওর!" ... ৯৫৭
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীঅনিলবরণ রায় ... ৯৫৯

বহুবর্ণ চিত্র

১। প্যারিচাঁদ মিত্র—প্রচ্ছদপট
২। ভ্রষ্টলগ্ন ৩। মৎস্যগন্ধা

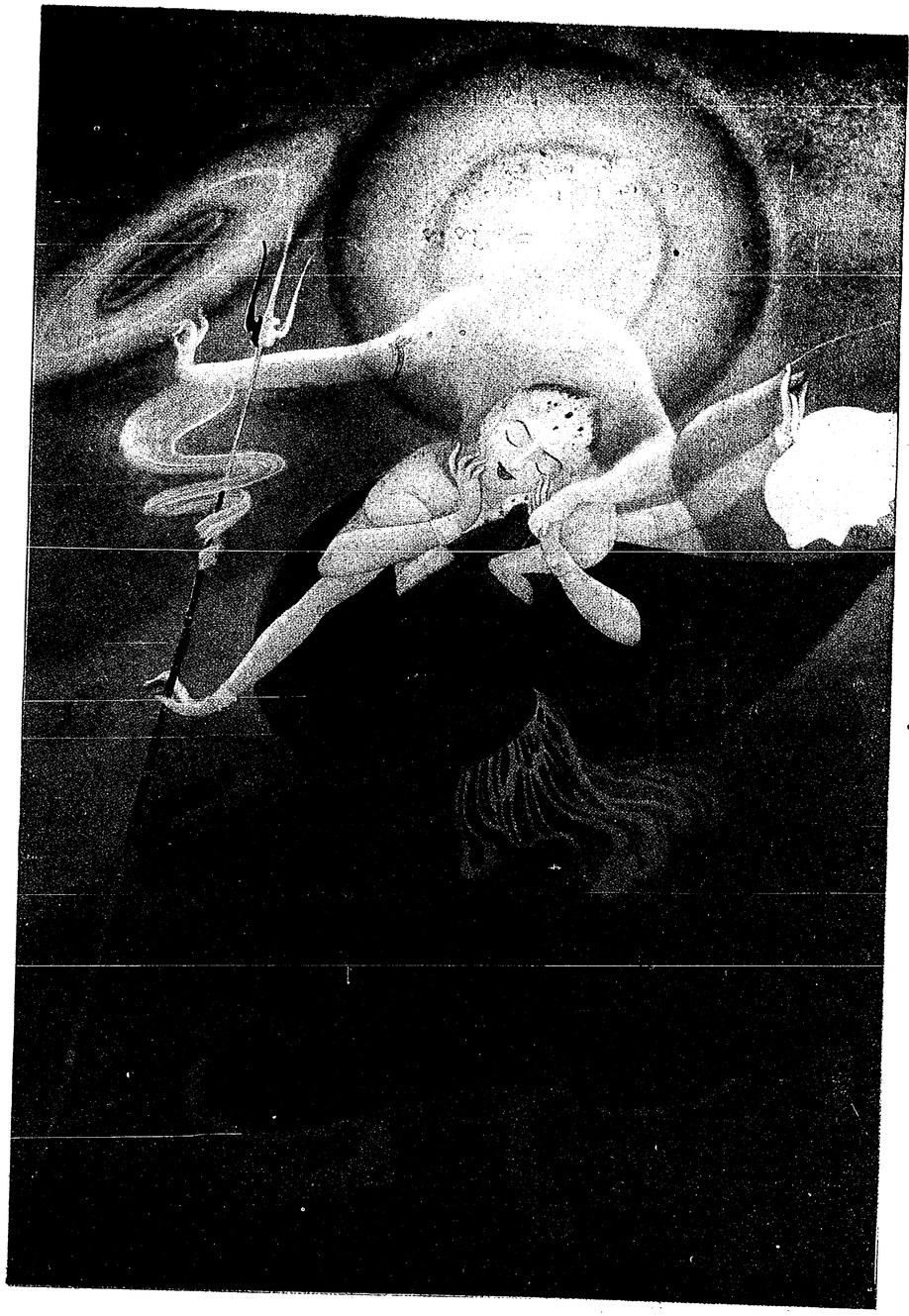

সাংখ্যের—পুরুষ-প্রকৃতি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিল্পাচার্য্য—অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ভারতবর্ষ

আষাঢ়—১৩৩১

প্রথম খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষ

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

যুগ-যুগান্তের সেই প্রথম প্রভাতে,
এসেছিল নব-বর্ষ এ বিশ্ব-নন্দনে ;
এমনি আরক্ত-রাগ অরুণ সম্পাতে,
কুহরিল শত পিক শ্যাম কুঞ্জবনে !
তখন আশার স্বপ্নে আছিল বিভোর,
ভবিষ্য সুখের লাগি তৃষাতুর প্রাণ ;
পোহাইল অতীতের মহানিশা ঘোর,
ধরি চক্ষে প্রকৃতির রূপ সুমহান্ ।
সেইদিন বিকশিল নব সৌর-করে,
শ্যামলা বসুধা-কান্তি !—তরুণ তমাল !—
বেদমন্ত্র-মুখরিত মেঘমন্দ্র-স্বরে,
ওঙ্কার ঝঙ্কার ওঠে গম্ভীর, রসাল !
নববর্ষ ! আজো সেই স্মৃতি বেগবতী,
ভারতবর্ষের বুকে চির মধুমতী !

সাহিত্য পরিষৎ
কলিকাতা

হিন্দুর পরলোকতত্ত্ব

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

মৃত্যুর পর আত্মার কি হয় এ বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন মত দেখা যায়। খৃষ্টধর্ম্মের মতে মৃত্যুর পর আত্মা দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করে; যখন পৃথিবীর ধ্বংস হয়, তখন আত্মা কবর হইতে উঠিয়া আসে; ঈশ্বরের নিকট তখন সকলের বিচার হয়; সেইদিনকে বিচারের দিন বলে—Day of Judgment—; সেই বিচারে যাহারা সাধু বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় তাহারা স্বর্গে যায়, যাহারা পাপী তাহারা নরকে যায়। এই স্বর্গ এবং নরকবাস অনন্তকালের জন্যই হয় বলিয়া মনে হয়, কারণ বাইবেলে এই প্রসঙ্গে e'ernal, everlasting এই সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মুসলমান-ধর্ম্মেও স্বর্গ ও নরকের ব্যবস্থা দেখা যায়, এবং সে স্বর্গ ও নরক অনন্তকাল স্থায়ী বলিয়াই বোধ হয়। অনন্ত স্বর্গের কল্পনাতে কোন কষ্টই না থাকিতে পারে, কিন্তু অনন্ত নরকের কল্পনা অতি ভয়াবহ। অনেক সময় লোকে শিক্ষার অভাবে বা সঙ্গ-দোষে বা সাময়িক দুর্বলতার প্রভাবে পাপ করিয়া ফেলে। তাহার জন্য তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী করা যায় না—বিশেষতঃ যদি পূর্ব্বজন্ম স্বীকার না করা যায়, যেমন খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্ম করেন না। এরূপ পাপের জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও অনন্ত নরকের কথা নাই। এজন্য হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক। যুক্তির দিক দিয়া দেখিলেও মনে হয় যে, মানুষের পাপ যখন অনন্ত নহে, তখন তাহার ফলে নরক কেন অনন্ত হইবে? হিন্দুর পরলোকতত্ত্ব কর্ম্মফলবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে কর্ম্মের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব অনুসারে গুরু এবং লঘু কর্ম্মফলের ব্যবস্থা আছে; পরিমিত স্বর্গ এবং নরক আছে। আবার পুনর্জন্ম আছে;—এক জন্ম যদি ভুলের উপর কাটিয়া গেল, তাহা হইলেও সাধু জীবন যাপন করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। ইহাতে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। মানুষই পশুর ন্যায় কর্ম্ম করিয়া পশুদেহ প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝিয়া জ্ঞানী হিন্দু নিজের পশুপ্রকৃতি দমনের চেষ্টা করেন, এবং পশুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ হইতে বিরত হন। এই সকল কারণে হিন্দুর পরলোকতত্ত্ব যুক্তিপূর্ণ এবং শিক্ষাপ্রদ। মোটামুটি সকল হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পরলোকতত্ত্ব একরূপ হইলেও, কোনও কোনও বিষয়ে সম্প্রদায়-ভেদে সামান্য মতভেদ দেখা যায়। অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত।

জ্ঞান কর্ম্ম এবং ভক্তি অনুসারে জীব মৃত্যুর পর বিভিন্ন প্রকারের গতি প্রাপ্ত হন। যিনি ইহজন্মে ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন—অদ্বৈতবাদীর ভাষায় যিনি নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন—মৃত্যু হইবামাত্র তিনি ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন, বা মোক্ষলাভ করেন। কারণ, ব্রহ্মদর্শন হইলে মায়ার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

"যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করে।" মায়ার প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে জীবের তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হয়; তাহা হইলে আর পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। গীতা

অগ্নি যেরূপ বীজকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞান সেইরূপ কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে, অর্থাৎ কর্ম্মের ফলোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট করে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ উপনিষদ

সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়, সকল সংশয় ঘুচিয়া যায়, এবং কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বিনাশ হয় বটে, কিন্তু যে কর্ম্মগুলির ফলভোগ বর্ত্তমান জন্মে আরম্ভ হইয়াছে, সেই প্রারব্ধ কর্ম্মগুলির ফল ভোগ করিতে হয়। তবে অজ্ঞানাবৃত ব্যক্তি যে ভাবে কর্ম্মফল ভোগ করেন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সে

ভাবে কর্ম্মফল ভোগ করেন না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয় ঘটনায় হর্ষ বা বিষাদ প্রাপ্ত হন না, কারণ তিনি স্পষ্ট দেখিতে পান যে, এই জগৎ-সংসার মিথ্যা; ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই সত্য বস্তু নাই।

যথাইদমিন্দ্রজালমিতি জ্ঞানবান্ তৎ ইন্দ্রজালং
পশ্যন্নপি পরমার্থমিদমিতি ন পশ্যতি। বেদান্তসার

যেমন ইন্দ্রজালিকের ক্রিয়া দেখিবার সময় যে ব্যক্তি জানেন যে ইহা ইন্দ্রজাল, তিনি ঐ সকল ব্যাপারকে সত্য বলিয়া মনে করেন না, জ্ঞানী ব্যক্তিও জগৎ-ব্যাপার সেই-রূপ দেখেন।

সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব।
সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব॥ উপনিষদ

ব্রহ্মজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত ব্যক্তির চক্ষু থাকিলেও তিনি চক্ষু-হীনের ন্যায় অবস্থান করেন (কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন বস্তু আছে, তাঁহার এ জ্ঞান হয় না)। তাঁহার কর্ণ থাকিলেও তিনি কর্ণহীন ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করেন। তাঁহার মন এবং প্রাণ থাকিলেও তিনি মনহীন এবং প্রাণহীন ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করেন (ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তু তাঁহার মনে স্থান পায় না, আর কোন বস্তু লাভ করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হন না)।

অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ। উপনিষদ

যাঁহার দেহাভিমান নাই, বা দেহাত্মবোধ নাই, তাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় বোধ হয় না।

এই ভাবে জীবন-যাপন করিয়া যখন তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেহত্যাগ করেন, তখন মৃত্যুমাত্র তিনি ব্রহ্মলাভ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইয়া যান। অপর সকল ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তাহাদের বাসনা প্রভৃতি গঠিত সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কোন বাসনা থাকে না, সুতরাং তাঁহার পরলোকগমনোপযোগী সূক্ষ্মশরীরও থাকে না। তাঁহার স্থূলদেহ পড়িয়া থাকে এবং তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান।

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদ

অপর সকল ব্যক্তির মৃত্যুর সময় প্রাণ যেরূপ দেহত্যাগ করিয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণ সেরূপ দেহত্যাগ করে না।

তাহা হইলে প্রাণের কি হয়?

"অত্রএব সমবলীয়ন্তে"। বৃহদারণ্যক উপনিষদ

ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়।

ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যক্‌দর্শননিষ্ঠানাং
গতিরাগতির্বা ক্বচিদপ্তি। শঙ্করাচার্য্যকৃত গীতা: ৪র্থ ৮,২৪

যাঁহারা ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যুমাত্র সদ্যোমুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের পরলোক গমনাগমন নাই।

এই ভাবে যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা মৃত্যুমাত্র মোক্ষলাভ করেন। ইহাই উৎকৃষ্ট গতি। যাঁহারা একনিষ্ঠ হইয়া সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, মৃত্যুমাত্র তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন না। মৃত্যুর পর তাঁহারা দেবযান পথ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলোক অভিমুখে গমন করেন। এ পথে গেলেও আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, এবং শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মলাভ হয়। তবে বিলম্বে হয়, এ জন্য এই পথ প্রথমোক্ত পথ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। গীতা এবং উপনিষদ উভয়ত্রই দেবযান-মার্গের উল্লেখ আছে।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ গীতা,৮,২৪

মৃত্যুর পর যোগিগণ যে "কালে" গমন করিয়া পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসেন না, এবং যে "কালে" গমন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসেন, হে অর্জ্জুন, আমি তোমাকে তাহা বলিব। এই "কাল" শব্দ সময়বাচক নহে, ইহা মার্গ-বাচক। শ্রীধর স্বামী ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

কাল শব্দেন কালাভিমানিনীভিরতিবাহিকীভিঃ দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে।

কালাভিমানী দেবতাগণ যে মার্গে (মৃত্যুর পর সাধককে লইয়া যান, সেই মার্গ লক্ষ্য করিয়া এখানে কাল শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

গীতায় পরবর্ত্তী শ্লোকে দেবযান-মার্গের বর্ণনা করা হইয়াছে। অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ৮।২৪

অগ্নি ও জ্যোতিঃ দেবতার নাম। তাঁহারা যতদূর তাঁহাদের অধিকার, ততদূর সাধককে আগাইয়া দেন। 'অহঃ' মানে দিবসাভিমানিনী দেবতা (দিবসের দেবতা)। শুক্লঃ হইতেছেন শুক্লপক্ষের দেবতা। তাহার পর উত্তরায়ণের ছয় মাসের দেবতা। এই সকল দেবতা জীবকে নির্দ্দিষ্ট

পথে লইয়া যান। এই পথে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা অবশেষে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, কারণ তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ।

উপনিষদেও দেবযানের কথা আছে,—তে অর্চিষমভি সম্ভবন্তি, অর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমানপক্ষম্। আপূর্য্যমানপক্ষাৎ যান্ ষন্মাসান্ উদঙঙাদিত্যো এতি, মাসেভ্যো দেবলোকম্।

তাঁহারা অর্চি দেবতার নিকট যান, তাঁহার নিকট হইতে দিবসের দেবতা, তথা হইতে শুক্লপক্ষের দেবতা, শুক্লপক্ষের দেবতা হইতে যে ছয়মাস সূর্য্য উত্তরে থাকেন তাহার দেবতা, তথা হইতে দেবলোক।

গীতাতে আছে 'অগ্নির্জ্যোতিঃ', তাহার পরিবর্ত্তে উপনিষদে বলিয়াছেন 'অর্চিঃ'। উভয় বাক্যের সামঞ্জস্যের জন্য শ্রীধর স্বামী গীতা-ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, অগ্নির্জ্যোতিঃ এই শব্দদ্বয়ে অর্চিরভিমানিনী দেবতাকে বুঝিতে হইবে।

যাঁহারা দেবযান-পথে গমন করেন, তাঁহারা পূর্ব্বকৃত পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন কখন? দেহ ত্যাগের সময়, কিম্বা দেবযান-পথে যাইতে-যাইতে মধ্য-পথে? কৌষীতকি ব্রাহ্মণে দেবযান-পথের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে উল্লেখ আছে যে দেবযান পথে যাইতে-যাইতে বিরজা নদীর তীরে উপস্থিত হওয়া যায় এবং সেই নদী পার হইতে হয়। এবং সেইখানে পুণ্য-পাপ পরিত্যাগের কথা উল্লেখ আছে। তাহাতে মনে হইতে পারে যে, অর্দ্ধপথে বিরজা নদীতে পাপ-পুণ্য ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মৃত্যুর সময়ই পাপ-পুণ্য ত্যাগ হয়। কারণ যাঁহারা দেবযান-পথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের মৃত্যুর পর পাপ-পুণ্যের ফলভোগের আর অবসর হয় না। এক্ষেত্রে বিরজা নদী পর্য্যন্ত অনর্থক পাপ-পুণ্য বহন করিয়া লইয়া যাইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। শ্রুতিতে যদিও বিরজা নদী পার হইবার সময় পাপ-পুণ্য ত্যাগের কথা আছে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, পাপ-পুণ্য ত্যাগ পূর্ব্বেই অর্থাৎ দেহত্যাগের সময়েই হইয়াছে। (ব্রহ্মসূত্র তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ ২৭ সূত্র)।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে সগুণ ব্রহ্মোপাসক এই দেবযান-পথে গমন করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই ভাবে যে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি পরব্রহ্ম নহেন, * তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মা যতকাল অবস্থান করেন, সাধক ততকাল তাঁহার সহিত ব্রহ্মালোকে বিরাজ করেন। মহাপ্রলয়ের সময় যখন ব্রহ্মার পরমায়ু অবসান হয় এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা পরব্রহ্মে বিলীন হন, সগুণোপাসকও তখন পরব্রহ্মে বিলীন হন। * কারণ ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

এই দুইটি গতি লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এতদ্ব্যতীত যে সকল গতি আছে, তাহাতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে সকল গতিতে পুনর্জন্ম আছে, ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদে সেই সকল গতি নিরূপিত হইয়াছে।

সূত্রকারের উদ্দেশ্য এই যে, পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর কষ্ট আলোচনা করিলে লোকের মনে বৈরাগ্য হইবে, এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ভিন্ন মুক্তি নাই জানিয়া, সেই জ্ঞান লাভ বিষয়ে একান্ত যত্নবান হইবে। তখন তাহার মনের ভাব এইরূপ হইবে,—

গতা গতেন শ্রান্তোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন।

যে সকল গতিতে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহাদের মধ্যে ধূমযান-মার্গই শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা যাগ যজ্ঞ করেন, পরোপকারের জন্য কূপাদি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং দান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর এই মার্গে গমন করেন।

অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে
তে ধূমমভিসং ভবন্তি। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৫।১।৬

এই সকল জীব মৃত্যুর পর যখন অন্য দেহ গ্রহণ করিবার জন্য প্রয়াণ করে, তখন প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ দেহ-গঠনোপযোগী সূক্ষ্মভূত— এই সকলের সহিত পরলোক গমন করে। এই ধূমযান-মার্গে দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় দেহ গ্রহণ করিবার তত্ত্ব পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ। এই পথে পাঁচটি অবস্থা আছে; তাহাকে পাঁচটি অগ্নির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জীব এই পথে প্রথমে আকাশে যায়, সেখান হইতে চন্দ্রে যায়। এই চন্দ্রলোকে পুণ্যফলে সুখভোগ হয়। যখন পুণ্য ফুরাইয়া যায়, তখন জীবের শোক হয়; সেই শোকরূপ অগ্নির উত্তাপে তাহার ভোগক্ষম দেহ গলিয়া যায় এবং জীব চন্দ্র হইতে নামিয়া আসিয়া মেঘের সহিত অবস্থান করে। মেঘ হইতে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে নামিয়া

* কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ। ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।৭

* কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহ অতঃপরম্ অভিধানাৎ। ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।১০

আসে; পৃথিবীতে নামিয়া, পৃথিবী হইতে উৎপন্ন শস্যের মধ্যে অবস্থান করে। তাহার পর যে পুরুষ সেই শস্য ভক্ষণ করে, তাহার দেহমধ্যে উপনীত হয়। ঐ পুরুষের দেহ হইতে তাহার শুক্রের সহিত স্খলিত হইয়া তাহার স্ত্রীর গর্ভে গমন করে। এই ভাবে সে পুনরায় দেহ গ্রহণ করে। আকাশ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ এবং স্ত্রী এই পাঁচটি বস্তুকে অগ্নি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এই পাঁচটি অগ্নিতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও শুক্র এই পাঁচটি আহুতি দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করা হয়, তাহাতে যে জল থাকে, সেই জল ঐ কর্ম্মকারীর দেহ আশ্রয় করে। মৃত্যুর পর যখন তাহার দেহ সৎকার করিবার সময় ঋত্বিকগণ ঐ দেহ অগ্নিতে আহুতি দেন, তখন পূর্ব্বোক্ত জল সেই জীবকে বেষ্টন করিয়া তাহাকে স্বর্গে (চন্দ্রলোকে) লইয়া যায়। ইহাই শ্রদ্ধার আহুতি। স্বর্গভোগ শেষ হইলে স্বর্গে যে দেহ গ্রহণ হইয়াছিল, সেই দেহ মেঘরূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। ইহাই সোমের আহুতি। তাহার পর পৃথিবীরূপ অগ্নিতে বৃষ্টিরূপ আহুতি পড়ে, পুরুষরূপ অগ্নিতে অন্নরূপ আহুতি পড়ে, এবং স্ত্রীরূপ অগ্নিতে শুক্ররূপ আহুতি পড়ে। তখন জীব পুনরায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। দেহ-ত্যাগের পর জীব যে পথ দিয়া চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত গমন করে, তাহাই ধূমযান-মার্গ নামে প্রসিদ্ধ। এই পথটি গীতায় এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নং।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ৮।২৫

মৃত্যুর পর ধূমদেবতা তাঁহাদিগকে কিছুদূর লইয়া যান, তাহার পর রাত্রি-দেবতা, তাহার পর কৃষ্ণপক্ষের দেবতা, তাহার পর দক্ষিণায়নের দেবতা; তিনি চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেন; সেখান হইতে জীব (কর্ম্মযোগী) ফিরিয়া আসেন।

উপনিষদে আছে যে এই সকল জীব চন্দ্রলোকে গমন করিয়া দেবতাদের অন্ন হন। সেখানে অন্ন শব্দটি গৌণ ভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা রূপকমাত্র, বাস্তবিক যে দেবতারা ইহাঁদিগকে ভক্ষণ করেন, তাহা নহে। শ্রুতির উদ্দেশ্য এই যে, দেবগণ এই সকল জীবের সহিত সুখে বিহার করেন, লোকে যেমন স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখে বিহার করে সেইরূপ। তবে তাঁহাদের আত্মজ্ঞান হয় নাই, এজন্য তাঁহারা দেবগণের ভোগের বিষয় হন।

এই চন্দ্রমণ্ডলে স্বর্গসুখ ভোগকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন,

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ৯।২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ৯।২১

বেদ অনুসারে যজ্ঞ করিয়া যাঁহারা স্বর্গ প্রার্থনা করেন, তাঁহারা স্বর্গে গিয়া দেবোচিত সুখভোগ করেন। দীর্ঘকাল স্বর্গসুখ ভোগের পর যখন তাঁহাদের পুণ্যসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহারা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন।

চন্দ্রমণ্ডল হইতে নামিবার সময় জীবের যে যাবতীয় কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এমন নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ সকল জীব তুল্যরূপ অবস্থাতে জন্মগ্রহণ করিত। কিন্তু দেখা যায়, কেহ ধনীর গৃহে, কেহ দরিদ্রের গৃহে, কেহ সুস্থ শরীরে, কেহ জন্মান্ধ বা পঙ্গু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে সকল কর্ম্ম ক্ষয় হয় নাই, সেই সকল কর্ম অনুসারে জন্মকালীন অবস্থা নির্দ্ধারিত হয়। এমন কতকগুলি কর্ম আছে, যাহাদের ফলভোগ চন্দ্রলোকেই হইয়া থাকে। চন্দ্রলোক হইতে অবতরণের সময় সেই জাতীয় কর্ম্ম কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু যে সকল কর্ম্মের ফল চন্দ্রলোকে হইবার কথা নহে, চন্দ্র-লোক হইতে অবতরণের সময় সে সকল কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে; এবং সেই সকল কর্ম্ম অনুসারে জীব পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবার সময় উৎকৃষ্ট বা অধম যোনি প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করিবার পথ এবং চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণ করিবার পথ কতকটা এক, আবার কতকটা ভিন্ন।

শ্রুতিতে আছে চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণের সময় জীব প্রথমে আকাশ হয়, তাহার পর বায়ু হয়, তাহার পর ধূম হয়, তাহার পর মেঘ হয়, তাহার পর বৃষ্টি হয়। শ্রুতিবাক্য হইতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, জীব আকাশ

বায়ু প্রভৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ জীবই আকাশ বায়ু প্রভৃতি হইয়া যায়। শ্রুতির উদ্দেশ্য এই যে, জীব নামিবার সময় যথাক্রমে আকাশ বায়ু প্রভৃতির ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্র হইতে নামিবার সময় আকাশ বায়ু প্রভৃতির রূপ ধরিয়া জীব দীর্ঘকাল অবস্থান করে না। অল্প সময়ের মধ্যেই এক অবস্থা হইতে ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কেবল শস্য হইতে পুরুষদেহে গমন করিতে দীর্ঘকাল লাগে।

হিন্দুশাস্ত্রের মত, শস্যেরও সুখ-দুঃখ-ভোগ করিবার ক্ষমতা আছে। জীবই কর্ম্মফল বশে শস্য হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে। মনু বলিয়াছেন,

অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ ॥

"এই সকল উদ্ভিদের মধ্যে চেতনা আছে। ইহারা সুখ-দুঃখ অনুভব করে"। এক্ষণে মনে হইতে পারে যে, জীব যখন চন্দ্র হইতে অবতরণ করিবার সময় শস্যের মধ্যে অবস্থান করে, তখন ঐ জীব শস্যরূপে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু তাহা নহে। এই অবস্থায় জীব শস্যের মধ্যে অবস্থান করে মাত্র। তখন সুখ-দুঃখ ভোগ করিবার ক্ষমতা তাহার থাকে না। ঐ শস্যরূপে সুখ-দুঃখ-ভোগ করে অন্য জীব—যে জীব তাহার বর্ষফলে শস্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যে জীব চন্দ্র হইতে অবতরণ করিতেছে, সে পুনরায় মনুষ্যদেহ ধারণ করিবে। পথিমধ্যে দীর্ঘকাল শস্যের মধ্যে অবস্থান করে, এই পর্য্যন্ত। শস্য হইতে সে যখন পুরুষের দেহে গমন করে, তখনও ঐ পুরুষের সুখদুঃখ সে অনুভব করে না। পুরুষের দেহ হইতে যখন স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া ভ্রূণের আকার ধারণ করে, তখন হইতে তাহার সুখদুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা হয়।

যাঁহারা ইহজন্মে ঈশ্বরের উপাসনা করেন না, আবার দান প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যও করেন না, তাঁহাদের গতি ভিন্নরূপ। যাঁহারা দেবযান-পথ এবং ধূমযান-পথ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা কীট পতঙ্গ সর্প প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যাহারা পাপী নহে, তাহারা নরকে যায় না,—মৃত্যুর পরই এই সকল দেহ ধারণ করে। যাহারা পাপী, তাহারা মৃত্যুর পর নরকে গমন করে, এবং পাপের গুরুত্ব অনুযায়ী নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তদনন্তর কীটাদিদেহ ধারণ করে।

বহূন্‌বর্ষগণান্ ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্যতৎক্ষয়াৎ।
সংসারান্ত্রতিপদ্যন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিমান্ ॥ মনুসংহিতা ১২।৫৪

মহাপাতকীগণ বহু বর্ষ ঘোর নরক ভোগ করিয়া তাহার পর সংসারে আসিয়া বিবিধ অধমযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

কোন্ পাপে কিরূপ ইতর জন্তুর দেহপ্রাপ্তি হয়, মনু তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। বহুজন্ম ধরিয়া পশুদেহ ধারণ করিয়া যখন জীবের অধম প্রবৃত্তি মন্দীভূত হয় এবং উত্তম প্রবৃত্তি কথঞ্চিৎ উন্মেষিত হয়, তখন সে মনুষ্যদেহ ধারণ করে।

প্রশ্ন হইতে পারে, যে মানব পাপ-পুণ্য উভয়ই করিয়া থাকে এবং কিছু কিছু ঈশ্বর পূজাও করিয়া থাকে তাহার কোন্ গতি হইবে? তাহার উত্তর এই যে, যে কার্য্য সে সমধিক অনুরাগের সহিত অধিকবার আচরণ করে, সেই কার্য্যের ফল প্রবল হয় এবং সেই কর্ম্মফল অপর কর্ম্মফলকে বাধা দিয়া থাকে। যে কর্ম্মের ফল এখন হইল না, পরে সুযোগ পাইলে সেই কর্ম্মফল প্রসব করে। যে ব্যক্তির পাপের অংশ বেশী, পুণ্যের অংশ কম, সে হয়ত পাপের ফলে নরক ভোগ করিয়া পরে পশুদেহ ধারণ করিল। তাহার পর সে যখন মনুষ্যদেহ ধারণ করিবে, তখন বহুপূর্ব্বে অনুষ্ঠিত পুণ্যের ফলে তাহার শুভমতি উৎপন্ন হইতে পারে।

অতএব অদ্বৈতবাদ অনুসারে পরলোকতত্ত্ব সংক্ষেপে এইরূপ। যাঁহারা ইহজন্মে ব্রহ্মলাভ করেন, মৃত্যুর সময় তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান। যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনায় ইহজন্ম যাপন করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেখানে তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, মহাপ্রলয়ের সময় তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান। যাঁহারা যাগযজ্ঞ জলাশয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করেন; পুণ্য ফুরাইলে তাঁহারা পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। যাহারা পৃথিবীতে নানাবিধ পাপানুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পর নরকে যায়; সেখানে কষ্টভোগ করিয়া পৃথিবীতে ক্ষুদ্র জন্তু বা উদ্ভিদ হইয়া বার বার জন্ম ও মৃত্যু লাভ করে। আর যাহারা পাপ-পুণ্য কিছুই করে না, তাহারা মৃত্যুর পর নরকে যায় না, ইতর জন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

নওরোজা

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

আজ বছরের প্রথম মাসের পুণ্য-শুভ প্রথম দিন,
নূতন খাতায় উশুল জমায় শুধ্‌তে হবে সাবেক ঋণ;
আজ বুক ভরে' যায় কোন্ সুরে, সকল গ্লানি যায় দূরে,
হারাণো সেই পুরাণো দিন, এল বুঝি ফের ঘুরে।
মনের কুঞ্জবনের মাঝে আপনি বাজে প্রাণের বীণ্,
দিগ্বিদিকে পড়ল সাড়া আজ বছরের প্রথম দিন।

মুখর হ'ল সকল প্রাণী যুব-জনের জয়-গানে,
অবাক্ হ'য়ে দ্যুলোক আজি চাইছে ধরার মুখপানে,
ভাব্‌ছে মাটীর এই ছেলে, খেলা-ধূলো সব ফেলে,
স্বর্গলোকের সুধার খবর কেমন করে' টের পেলে!
আজ, দেব্‌তা-নরে একতরে বাজায় বীণা একতানে,
নৃত্য করে, মত্ত যেন যৌবনেরি জয়-গানে!

কাল্‌কে যে ফুল কুঁড়ি ছিল পাতার মাঝে মুখ ঢেকে;
আজ্‌কে তারে কে জাগালে ছেলেবেলার ঘুম থেকে!
তারে, মলয় প্রেমের হেম-দোলায় সেধে সেধে মুখ খোলায়,
তার, পার্শ্বে থাকি' হাজার পাখী মিষ্ট গানে মন ভোলায়।
আবার কোন্ পিপাসায় গায় পাপিয়া
প্রাণ-ফাটা গান দূর থেকে,
তার ভাঙা বুকের জমাট্-রোদন উথ্‌লে ওঠে সুর মেখে!

ইন্দ্র-সভায় জম্‌ছে না নাচ, উন্মনা আজ অপ্সরী,—
ধরার মেয়ের পানে চেয়ে' আক্‌শোষে যায় মন ভরি';
ভাবে, কেমন এদের মান করা, কত, ভালবাসায় প্রাণ ভরা,
স্বর্গাদপি গরীয়সী—এদের প্রেমেই হয় ধরা,
এরা, ফেলে ধাঁধায় সাধায়, কাঁদায়, অভিমানের ছল্ করি'
সুদূর থেকে আদর দেখে চঞ্চলা তাই অপ্সরী!

যৌবনের এ প্রাণের গানে, তোমরা বুঝি ভাব্‌ছ, ভাই,
মিল্‌বে বুড়া কিসের টানে; হেথায় তাহার নাইক ঠাঁই;
যারা, বয়সের এই ছল্ ধরে, তারা ভারি ভুল করে,
তারা বোঝে না যে বৃদ্ধ-যুবা বিদ্ধ সবাই ফুল-শরে;
পরশ-মণির স্পর্শে যেমন লোহার মাঝে স্বর্ণ পাই,
প্রেম-পরশে সরস হ'লে নবীন-প্রবীণ প্রভেদ নাই।

ভাবের ঘরে চুরী করে' বল্‌ছি বটে নাই প্রভেদ,
মনে মনে জান্‌ছি ত বেশ শেষ-বয়সের যে সব খেদ,
আজ, জীবন-নদে নাই জোয়ার, দেহের তরী কাজের বার,
এখন, ক্লান্ত হাতে হাল ধরে' কি জম্‌বে পাড়ি শেষ-খেয়ার!
এখনো যে অন্ধ থাকি' অঙ্গে মাখি বিষয়-ক্লেদ,
আমার কর্ম্ম-খাতায় ভোগ-বাসনায়
জের্ চলে তাই অবিচ্ছেদ।

সাবেক খাতায় পাতায় পাতায় খরচা দেখে ভরসা-হীন,
হিসাব-নিকাশ কর্‌তে এখন টুট্‌ল স্বপন সব রঙিন;
চম্‌কে উঠে আজ একি! জমার ঘরে ফাঁক দেখি,
আমি আপ্‌নাকে যে দিচ্ছি ফাঁকি
চালিয়ে কেবল জাল্-মেকী,
পাওনাদারে ছাড়বে নারে শেষের হিসাব খুব সঙীন্,
আমার জনান্তিকে নানান্ দিকে রোজ-তারিখে বাড়ছে ঋণ!

দীন-দয়াময়! দাও গো আমায় সত্যিকারের নূতন দিন,
বিশ্ব-ভুবন করে' আপন শুচি সবার স্নেহের ঋণ;
চাও গো, প্রভু, মুখ-তুলে, প্রাণের কপাট দাও খুলে,
দেশের দশের প্রেমের বশে নিজের দুঃখ যাই ভুলে;
ধন্য হই গো বক্ষে রেখে গরীব-কাঙাল, আতুর-দীন,
এখন হ'তে তোমার হাতেই বাজুক্
আমার প্রাণের বীণ্।

দূর-অতীতের তন্দ্রা-ঘোরে ভবিষ্যতের পথ-খোঁজা
চল্‌বে নারে, সইবে নারে বর্ত্তমানে চোখ-বোজা,
অঙ্গে অপার বল ধরে', সঙ্গে সবার চল্ জোরে,
ফাঁকি দিয়ে থাকিস্‌নে আর কর্ম্ম-ফলের ছল্ করে';
সুখে-দুখে হাস্য-মুখে নিজেই নিজের বও বোঝা,
চল্‌বে সরল-সোজা পথে, হ'ক সফল আজ নওরোজা।

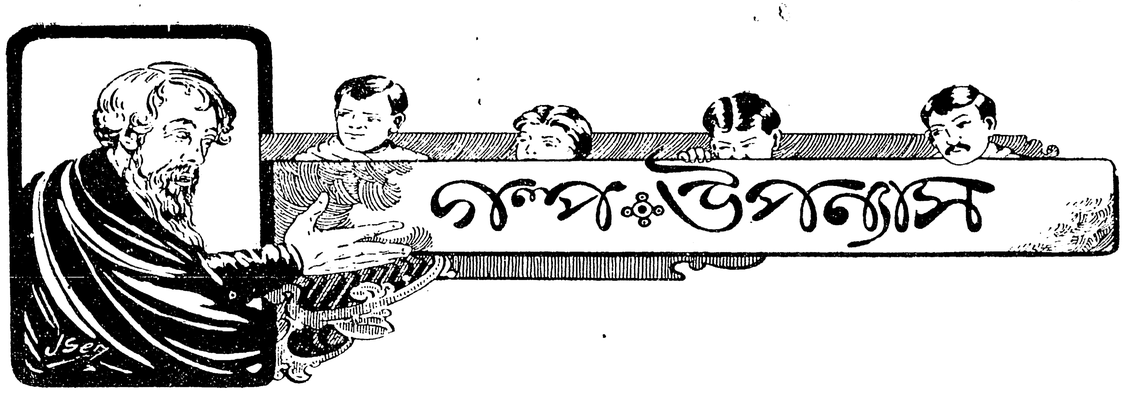

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৩)

সকাল বেলা ঊষার জ্বরটা ছাড়িয়া গিয়াছিল ; সে দ্বিতলের খোলা জানালায় বসিয়া পথের পানে চাহিয়াছিল ; আজ কয় মাস তাহার বিবাহ হইয়াছে ; এখানে আসিয়া তাহার জ্বর হয় নাই। কাল খুব জ্বর আসিয়াছিল, সে চৈতন্যহারা হইয়া পড়িয়াছিল। সেই প্রবল জ্বরের ঝোঁকে মনে পড়িয়াছিল খুব বেশী করিয়া দিদির কথা ; তাহার পর পিতা ও ঠাকুর-মা। তাহার জ্বর হইলে দিদি তাহার বিছানা ছাড়িত না ; যতবার সে চক্ষু মেলিত, মুখের সামনেই দিদিকে দেখিতে পাইত।

আজ জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু শরীর ভারি দুর্ব্বল, মাথার মধ্যে বুকের মধ্যে যেন আর কিছুই ছিল না। দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ঊষা ভাবিতেছিল একটী গ্রামের কথা। সেখানে সকলেই তাহার আপনার ছিল, সেখানে সকলেই তাহাকে বুক দিয়া ভালবাসিত। সে গ্রামের অতি হেয় পদার্থটীও আজ তাহার মনে দেবতার আসন বলিয়া বোধ হইতেছিল ; সে গ্রামের নীচ অশিক্ষিত লোকগুলাও আজ তাহার চোখে দেবতা।

বিবাহের পরই সে বোর্ডিংয়ে প্রেরিত হইয়াছিল, সেখানে বাধ্য হইয়াই তাহাকে লেখাপড়া শিখিতে হইতেছিল। কি রকম একটা ঘৃণায় ও লজ্জায় সে একেবারে মুসড়িয়া পড়িয়াছিল ; তাই সে কথা দিদি বা পিতা কাহাকেও জানাইতে পারে নাই। সে যে বোর্ডিংয়ে আছে সেখান হইতে পত্রও দিত না, শনিবারে বাড়ীর গাড়ী গিয়া তাহাকে বাড়ীতে আনিত। এখান হইতেই সে পিত্রালয়ে পত্র দিত, উত্তরও এখানে পাইত।

আজ ঊষা বসিয়া ভাবিতেছিল, সে কেমন করিয়া পবিত্রা দিদির পাশে দাঁড়াইবে ? সে নিরামিশাষী ছিল, সে অন্য কাহারও বাড়ী আহার করিত না ; এ বাড়ীতে কিম্বা বোর্ডিংয়ে জাতিবিচারও ছিল না, আর মাছ মাংস সবই বিনাপত্তিতে চলিত। মালতী দেবী নিজের জন্য স্বতন্ত্র পাক করিতেন, কয়েকদিন মাত্র ঊষা সেখানে আহার করিতে পাইয়াছিল। তাহার পর একদিন মৃন্ময় স্পষ্ট মাতার মুখের উপর বলিল, ঊষাকে এরূপ করানো একেবারেই অন্যায় হইতেছে। শুধু তাহার জেদে পড়িয়াই একে সে হিন্দু গৃহের কুসংস্কারান্ধা একটী বালিকাকে জীবনের সহচারিণী করিয়া আনিয়াছে, এখন তাহার কুসংস্কারগুলি দূর করানো তো চাই, সে অশিক্ষিতা কুসংস্কারপূর্ণা স্ত্রী লইয়া জীবন কাটাইতে পারিবে না।

পুত্রের কথায় মা পুত্রবধূকে আর আমল দেন নাই। বাধ্য হইয়া ঊষাকে সবই করিতে হইতেছে।

কিন্তু বাহিরে সে শিক্ষিতা হইলেও মনটা যে তাহার কুসংস্কারেই পরিপূর্ণ রহিয়া গেছে, মৃন্ময় তাহা দেখিতে পায় নাই।

সেই পবিত্র ভবন, সেই পবিত্রচিত্ত পিতা, দিদি, ঠাকুর-মা;—ঊষা হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাঁহারা জানেন ; তবে জানিয়া শুনিয়াও ঊষাকে এমন জায়গায় বিবাহ দিয়াছেন, তাহার অপরাধ কি ?

মনে পড়িল দিদির একখানা পত্রের কথা, এখানি সে কাল মাত্র পাইয়াছে। কাল বোর্ডিং হইতে বাড়ী আসিয়াই সে পত্রখানি পাইয়াছিল ; পাছে কেহ দেখে বলিয়া তখনই পত্রখানা ছিঁড়িয়া সে পার্শ্ববর্ত্তী বাগানে ফেলিয়া দিয়াছিল ; উমা নানা কথার পরে লিখিয়াছে—"বোন, তুমি আমাদের কোনও কথা না লিখিলেও আমরা মনীশদার কাছে তোমার সকল খবর পাইয়াছি। আমরা যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহার বেশী ফল পাইয়াছি। তোমায় তাঁহারা বোর্ডিংয়ে রাখিয়াছেন তাহাও শুনিলাম। আমরা অবশ্য আশা করি নাই যে তাঁহারা সত্যই এতদূর শিক্ষিত ; ইংরাজী যে মেয়ে জানে না, সত্যই তাহাকে লইয়া ঘর করিতে পারিবেন না। তোমার শ্বাশুড়ীর মত যে দাঁড়াইতে পারে নাই, তাহাও মনীশ দা বলিলেন। দুঃখ করিয়ো না ভাই, ধরিয়া লও, ইহাও তো সেই ভগবানেরই দান। তোমাকে তাহারা চিনিতে পারে নাই, চিনিয়াছেন তোমার শ্বাশুড়ী ; কিন্তু তিনি রমণী, তাঁহার শক্তি ক্ষীণ, তাই তাঁহার কার্য্য ফল উৎপন্ন করিতে পারিল না। যাহাই হউক, ঈশ্বরের আদেশরূপে—যাহা সম্মুখে আসিতেছে তাহাই গ্রহণ কর। মনকে ঠিক রাখিয়ো, মনে ত্যাগের আদর্শ আঁকিয়া রাখ, বাহিরের এই ভোগ মিথ্যা হইয়া যাইবে। ইহার পরে—বাস্তবিকই এমন দিন আসিতে পারে, যে দিন মনের ত্যাগই একমাত্র পরম সত্যরূপে তোমার চোখে প্রতীয়মান হইবে। যাহা তাঁহারা বলিবেন, যাহা তাঁহারা করাইবেন, অসঙ্কুচিত চিত্তে করিয়া যাও। তোমার জন্য তো তুমি সৃজিত হও নাই, মানবের জন্য হইয়াছ। যাহাদের জন্য তুমি—তাহারা যাহাতে আনন্দ পায় তাহাই করিবে ; সর্ব্বদা মনে করিয়া রাখিবে এ ভগবানের আদেশ মাত্র, তাঁহার আদেশ পালন করিতেই হইবে।"

পত্রখানার কথা আগাগোড়া মনে করিতে ঊষার চোখের জল শুখাইয়া উঠিল ; একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, তাই হোক, দিদির কথা কখনও সে ঠেলে নাই, কখনও ঠেলিবে না।

দরজার ভারি স্ক্রীনটা সরাইয়া গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে মালতী দেবী বলিলেন "কেমন বোধ হচ্ছে শরীরটা মা ?"

ঊষা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ধরা ধরা কণ্ঠে বলিল "জ্বর নেই, কিন্তু তত ভাল লাগছে না।"

মালতী দেবী স্নিগ্ধ হাতখানা তাহার ললাটে দিয়া দেখিলেন ; তাহার ললাটোপরি পতিত অলকগুচ্ছ সরাইয়া দিতে দিতে সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন "আঃ, একটা দিনের জ্বরে মার আমার কি চেহারাই হয়ে গ্যাছে। মৃন্ময়কে খবর পাঠিয়েছি, সে এসে একবার দেখে যাক, ওষুধ দিক। শীগ্‌গির করে জ্বরটা সেরে যাক, আমি বাঁচি।"

তাঁহার এই স্নেহপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া বালিকার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল, আবার দিদির কথাটা তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে চোখ ভাসাইয়া জল টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মালতী দেবী তাহার অন্তরের কথা বুঝিলেন ; তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া অঞ্চলে তাহার মুখখানা মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন "ছি মা, কাঁদতে নেই। বাপের জন্যে মন কেমন করছে ? আমি নিজের হাতে তাঁদের পত্র লিখে দেব আসতে, তাঁরা আমার কাছে থাকবেন, একটা দিন থেকে তোমার সঙ্গে দেখা-শোনা করে চলে যাবেন।"

ঊষা তাহার বুকের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "তাঁরা এখানে কক্ষনো আসবেন না।"

মালতী দেবী বলিলেন "আচ্ছা, এখানে না হয় নাই আসবেন, মনীশের বাড়ীতে আসবেন তো ? আমি তাই লিখে দেব, তোমায় মনীশের বাড়ীতে দুদিনের জন্যে জোর করেও আমি পাঠিয়ে দেব। কেঁদ না মা লক্ষ্মী, ছি, কাঁদলে মাথা ধরে আরও বেশী জ্বর আসবে'খন। কাল তোমার বেহুঁস জ্বর দেখে আমি তখুনি মনীশের কাছে লোক পাঠিয়েছিলুম, সে তখন কলেজে ছিল, তার মা বলেছেন পাঠিয়ে দেবেন। কাল হয় তো কোন ক্রমে

আসতে পারে নি, আজ রবিবার আছে, নিশ্চয়ই আসবে'খন।"

সতী দরজার বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিল "মা কি এ ঘরে?"

তীব্র কণ্ঠে মা বলিয়া উঠিলেন "হ্যাঁ, মেম সাহেবের কিছু দরকার আছে নাকি?"

অপ্রস্তুত হইয়া সতী গৃহে প্রবেশ করিল, তাহার হাতে খান-কত বই ছিল। সে বলিল "দরকার কিছু নেই মা। বউদিকে দেখতে আসার কথা দাদাকে বলতে গেলুম, দাদা বললে আগে কল হতে ফিরে আসি।"

মালতী দেবীর মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল; খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন "ভারি খুসী হয়েছি এ কথা শুনে।"

সতী বই কখানা টেবলে ফেলিয়া ঊষার পাশে বসিয়া পড়িল, "আমি সকাল বেলাই বউদির টেম্পারেচার নিয়ে গেছি, চা পাঠিয়ে দেছলুম, টেবলে পড়ে আছে দেখছি, খাওনি বউদি?"

ঊষা উত্তর দিবার আগেই মালতী দেবী বলিলেন "যে তোমাদের দয়ার দান সতী, ও দান না নেওয়াই ভাল। ছেলে মানুষ—একে তোমাদের নিজের চোখে দেখা-শোনা করাই উচিত। এখন এর কি জ্ঞান হয়েছে, এখন কি মায়া বসেছে? তোমরা নিজেরা কি রকম ব্যবহার করেছ বল দেখি? ছিঃ, লেখাপড়ায় জ্ঞান হয় না, ওতে কেবল অহঙ্কারই বাড়ে।"

অভিমানে সতীর হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, ঊষা তাড়াতাড়ি বলিল "না মা, দিদি আমায় বড় ভালবাসে। বোর্ডিংয়ে থাকতে দিদি রোজ দুবেলা আমার কাছে যায়, এখানে কাল সমস্ত দুপুর দিদি আমার কাছে ছিল। দিদি আমায় খুব ভালবাসে মা।"

সতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "মা মনে করেন, তিনি একলাই বউদিকে ভাল বাসেন, আমরা কেউ ভালবাসি নে। তবে দাদার কথা আলাদা। আমার সঙ্গে দাদার সঙ্গে কথা কি? দাদা আলাদা মতে চলে, আমি কি দাদাকে এ জন্যে ভাল বলি?"

"মা এ ঘরে আছেন নাকি?"

মনীশের কথা শুনিবামাত্র সতী তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল, ঊষার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে দরজার পানে চাহিল। মালতী দেবী বলিলেন "আছি বাবা, এসো।"

মনীশ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মালতী দেবীকে প্রণাম করিল, আশীর্ব্বাদ করিয়া মালতী দেবী বলিলেন, "বস বাবা, সতী, চেয়ারখানা এগিয়ে দে তো মা!"

সতী উঠিতেই ব্যস্ত হইয়া মনীশ বলিল "না, না, চেয়ার দিতে হবে না। তুমিও কি পাগল হয়েছ সতী; বি-এ, পড়ছ, এ জ্ঞানটুকু হল না—মা বসবেন নিচে—আর আমি বসব উপরে। এ কি কখনও হয়? হতে পারে—হয় তো তোমাদের শাস্ত্রে এ কথা বলে, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এ কথা বলে না।"

সতীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল "আপনাদের শাস্ত্র আর আমাদের শাস্ত্র বুঝি পৃথক? মাকে সম্মান দেখানো—সে শিক্ষিতেরও কাজ নিরক্ষরেরও কাজ। আপনারা যত কথা বলেন, সব আমাকেই লক্ষ্য করে, আমি যে লেখাপড়া করি—"

অভিমানে সত্যই তাহার কণ্ঠ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল, চোখ দিয়া জলও বাহির হইয়া পড়িল।

মনীশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল "ভাল পাগলের পাল্লায় পড়েছি তো। মা, সতী হাজার লেখাপড়া শিখলেও অভিমানে তার চোখের জল সামলাতে কখনো পারবে না, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। আচ্ছা সতী, এতে তোমার চোখের জল ফেলার কারণটা কি হল বল তো?"

মালতী দেবী হাসিলেন, বলিলেন "ও মনে ভাবছে—ও লেখাপড়া করছে বলে সবাই ওকে মেমসাহেব ভাবে। ও মেমসাহেব হতে আদতেই চায় না। তুমিও মেমসাহেব বলে মাঝে মাঝে ডাক; তা কোনদিন মুখোমুখি তোমার সামনে ঝগড়া করতে পারে না, যত অভিযোগ হয় আমার কাছে। আজ সেটা মুখ ফুটে তোমার সামনেই বেরিয়ে পড়েছে।"

মনীশ হাসিমুখে বলিল "মেমসাহেব বললে সতী রাগ করে, কিন্তু আমার স্বভাব কি জানেন মা, যে যাতে রাগ করে আমার তাই করতে আরও ভাল লাগে।"

সতী মুখভার করিয়া বলিল "তবে আরও বেশী করে বলবেন। আপনি বসবেন, না দাঁড়িয়েই থাকবেন?"

"এই যে, মার কাছে বসছি—"

মনীশ মালতী দেবীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িল, "ঊষার জ্বর ছেড়েছে? দেখি ভাই, হাতখানা তোর?"

নাড়ীজ্ঞান নাকি তাহার বেশ ছিল। ঊষার হাতখানা পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে সে বলিল "জ্বরটা ছেড়েছে বটে, কিন্তু আবার জ্বর আসবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে! এই সময়টায় ওষুধ পড়লে খুব ভাল হতো।"

মালতী দেবী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর বাবা তুমিও যেমন; বাড়ীতে এত বড় একটা ডাক্তার, একবার চোখে যে দেখবে তার সে সময়টাও নেই। কি হতভাগা কপাল নিয়ে এসেছি মনীশ, যদি শোন তবে সব বুঝতে পারবে।"

মনীশ বলিয়া উঠিল "থাক মা, ও সব কথা বলে কোনও লাভ নেই, ওতে কেবল মনে কষ্টই হয়।"

মালতী দেবী বলিলেন "কষ্ট কি আর বেশী হবে বাবা? বুকের মধ্যে দিনরাত যে আগুন জ্বলছে, তার বেশী আর তো কিছুই নেই। স্বামীকে তো দেখছ, বিলেত হতে যখন ফিরে এলেন, আমায় আনা তো দূরে থাক, একটা খবর পর্য্যন্ত দিলেন না। বাপের বাড়ীর কেউ এখানে আমায় পাঠাতে রাজি হলেন না, কারণ তাঁরা জানেন এখানে এলে আমিও খৃষ্টান হয়ে যাব। অবশেষে মাসীর ছেলের সঙ্গে আমি পালিয়ে আসি, পেছনে রেখে এলুম কলঙ্ক;—সবাই বললে আমি কুলত্যাগ করেছি, কার সঙ্গে গেছি তার ঠিক নেই।"

তাঁহার কণ্ঠ বড় করুণ হইয়া উঠিল; তিনি আবার বলিলেন "জানতুম, আর আমি সেখানে যেতে পাব না; বাপ, মা, ভাই, বোন, কারও সঙ্গেই আমার আর মিলন হবে না। আমি এখানে এলুম, স্বামী আমায় গ্রহণ করতে চাইলেন না, কারণ আমি অশিক্ষিতা, গ্রাম্য কিশোরী মাত্র। কিন্তু সেই কিশোরীর মনেও বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল, সে কিছুতেই আর ফিরে গেল না, সে এখানেই পড়ে রইল। চোখের সম্মুখে স্বামীর অবাধ ব্যাভিচার দেখতুম। আমায় কিছু ভেব না বাবা, সত্যই আমার বুকে বড় আঘাত লেগেছে, নইলে এ সব কথা কখনও আমার মুখ দিয়ে বার হত না।"

তাঁহার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল; তিনি চোখ মুছিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন "ক্রমে সবই সয়ে গেল, ক্রমে তাঁর ধর্ম্ম-স্ত্রীরূপে পরিচিতা হতে আমিই হয়েছি। আমার একটি ছেলে, একটি মেয়ে; সংসারের গৃহিণী আমি, কিন্তু আমার অধিকার আমি বাইরে বিস্তার হতে দেই নি, এই অন্তঃপুরটার মধ্যেই আমি আপনাকে বন্ধ করে ফেলেছি। মৃন্ময় তার পিতার শিক্ষায় শিক্ষিত, তবু কেন যে সে আমার কথা রাখতে এই অশিক্ষিতা বালিকাকে বিয়ে করে আনলে তা জানি নে। কিন্তু আমায় সে কিছুমাত্র সুখী করতে পারে নি। সে ভবিষ্যতে সুখী হবে বলে আমিই জোর করে ঊষাকে আমার কাছ-ছাড়া করেছি, তাকে বোর্ডিংয়ে রেখে ইংরাজি পড়াচ্ছি; বাড়ীর পড়া যদিই তার পছন্দ না হয়—তাই; কিন্তু এত করেও তার মন পাই নি! এই নির্দ্দোষী বালিকাটিকে যে সে দেখতে পারে না, এইটিই আমার বুকে বড় আঘাত দেছে।"

বাহির হইতে তাহার দাসী ডাকিল "মা, আপনার ভাত হয়ে গেছে বোধ হয়।"

চোখ মুছিয়া বিকৃত কণ্ঠে মালতী দেবী বলিলেন "যাচ্ছি।"

সতী মায়ের পানে চাহিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল "আমি যাব মা?"

মালতী দেবী বলিলেন "হ্যাঁ, তুমি যাও, আর দুটো পুড়িয়ে এস, তখন আবার কথা শুনি। তোমাদের কারও কিছু করে দরকার নেই বাছা, রান্নার দিকে তোমাদের গিয়ে দরকার নেই।"

সতী মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল; খানিক পরে মনীশের পানে চাহিয়া বলিল "দেখলেন, শুনলেন, মার কথা? এই জন্যে আমার এত রাগ হয় যে, মনে করি আমার বইগুলো সব নিয়ে গিয়ে উনানে ফেলে দেই। আমি যেন বাবারই মেয়ে—ওঁর কেউ নই।"

তাহার মুখখানা—সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরটাও বিকৃত হইয়া উঠিল।

মনীশ মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল "বাস্তবিক মা, এ যে আপনার অন্যায় কথা! আপনি জানেন মেয়েরা মায়ের কাছেই প্রায় থাকে, মায়ের কাজ তারা প্রাণপণে—জানা না থাকলেও করতে যায়; আপনি এমন করে কেন সতীকে বলেন?"

মালতী দেবী মনীশের কথায় একটু হাসিলেন; বলিলেন "না মনীশ, অবশ্য আমার মনের ভাবটা তা নয়, আর ওঁরও এদিকে নজর নেই। বাড়ীর ভেতরে মেয়েরা কাজ করুক, বাইরে ঠিক মতই তাঁর পাশে থাকা চাই। এখন আমার পরে সব ভার তিনি ছেড়ে দেছেন, এমন কি নিজের ভারটা পর্য্যন্ত। মানুষের বয়েস বেশী হলে তখন বুঝতে পারে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ; কাজেই প্রত্যেক কথায়, কাজে কুসংস্কার বলে আর চেঁচিয়ে উঠতে পারেন না। মেয়েটী যেমন লেখা-পড়া শিখছে তেমনি কাজ-কর্ম্মও করুক, তাই তিনিও এখন চান; কিন্তু আমিই আমার দিকে তত ঘেঁসতে দেই নে। কি জানি, মনীশ, ওরা কত জাত ছোঁয়, পায়ে দিনরাতই জুতো পরে, কত কি খায়—"

সতী বলিল "এখন তো আমি স্নান করে এসেছি মা।"

মালতী কন্যার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "আর—আনাড়ি হাত, পুড়ে গেলে মরবি যে তখন।"

সতী ওষ্ঠ ফুলাইয়া বলিল "তুমিই তো আনাড়ি করে করে রাখ মা, ছুঁতেই চাও না যে, রান্নাঘরে উঠতেই দাও না।"

মনীশ বলিল, "তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেল সতী, আমি আদেশ দিচ্ছি তুমি অনায়াসে ভাত নামিয়ে আসতে পার, আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদও করছি তোমার হাত পুড়বে না, অক্ষত দেহে তুমি ফিরে আসবে।"

সতী গর্ব্বিতভাবে মায়ের পানে চাহিয়া চলিয়া গেল। মনীশ বলিল, "তফাৎ করে নিজের মেয়ে-ছেলেকে রাখবেন না মা, ওতে আপনার শুচিতার একটু হানি হয় হোক। শুচিতা আপনার সঙ্গে আসেও নি, সঙ্গে যাবেও না। ছেলেমেয়েও আপনার সঙ্গে যাবে না, কিন্তু এদের দিয়ে যে কাজটা করিয়ে যাবেন সেটা থেকে যাবে। ওরাই আবার ছেলেমেয়ের বাপ মা হবে, ওদের শিক্ষা সঞ্চালিত হবে। ওদের কাছে ডেকে নেবেন মা, ওদের শুধু বাইরের শিক্ষা দেবেন না, আপনার শিক্ষাও দেবেন; তবেই সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা হবে, নচেৎ আধখানাই বৃথা থেকে গেল। যাক সে সব, ঊষা বুঝি কাল এসেছিল বোর্ডিং হতে?"

ঊষা বলিল, "হাঁ। মনীশ দা, প্রসাদপুর গেছলে, কি রকম দেখলে সেখানে, সব ভাল আছেন তো? দিদি কি বললে, বলুন না?"

সে যে পড়িতেছে, বোর্ডিংয়ে থাকে, সে কথাটা সে গোপন করিতে চায়।

মনীশ বলিল, "হ্যাঁ, সব ভাল।"

ঊষা অভিমানের সুরে বলিল, "সেখান হতে এসেছও তো আজ পনের ষোল দিন মনীশ দা, একদিনও কি এখানে এসে খবর দিতে নেই?"

মালতী দেবী সতীর কাজ দেখিতে উঠিয়া গেলেন। মনীশ বলিল, "কি করে আসি দিদি বল্ তো? তুই তো এখানে থাকিস নে, শনিবারে আসিস, রবিবারে থাকিস, আর রবিবারে গেছলুম শিবপুরে একটা দরকারে; তবে যদি বলিস বোর্ডিংয়ে গিয়ে দেখা করতে,—কিন্তু—"

সবেগে মাথা নাড়িয়া ঊষা বলিয়া উঠিল, "না, তোমার সেখানে যেতে হবে না। ওখানে আবার মানুষে যায়?"

মনীশ হাসিল।

ঊষা বলিল, "দিদি কিছু বললে না, আমি যেতে পাব না শুনে, দিদি কাঁদলে না?"

মনীশ বলিল, "কাঁদবে কেন ঊষা? তোর দিদি এই বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি আসবে লিখেছে।"

উৎসাহিতা ঊষা বলিল, "তোমার বাড়ীতে এসে থাকবে?"

মনীশ বলিল, "নয় তো কি,—তোর শ্বশুর-বাড়ীতে আসবে?"

ঊষা বলিল, "আমি কি তাই বলছি না কি? দিদি এলে আমায় নিয়ে যাবে তো মনীশ দা?"

মনীশ বলিল, "আমি তো এখানে থাকব না ভাই, এই আসছে সোমবারে আমি মামার বাড়ী বেড়াতে যাব, মাস দেড়েক পর—অর্থাৎ কলেজ খুললে পরে আমি ফিরে আসব। তা—তোর যাওয়ার ব্যাঘাত হবে না, আমি মাকে বলে যাব'খন—যদি উমা আসে তবে দাদীশ তোকে নিতে আসবে, এঁরা তোকে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন।"

সতী রুমালে হাত মুছিতে মুছিতে গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, বলিল, "হঠাৎ মামার বাড়ীর পরে এতটা ভক্তি হল যে; আমি তো বোধ হয় কখনও শুনিনি যে আপনার আবার মামার বাড়ী আছে।"

মনীশ হাসিমুখে বলিল, "অর্থাৎ বিশেষ দরকার না পড়লে লোকের, বিশেষ আমাদের মত লোকের মামার বাড়ীর কথা মনে হয় না। স্বাস্থ্যটা বেজায় খারাপ হয়ে গ্যাছে। ডাক্তারকে দেখিয়েছিলুম দেহটা, তিনি ব্যবস্থা করেছেন দিন কত অন্য জায়গায় যেতে। এই গরম কাল, এ সময় কোন্ দেশে আর যাব, কাজেই অসহায়ের সহায় মামার বাড়ীই এখন সম্বল।"

সতী উদ্বেগপূর্ণ চোখে মনীশের পানে চাহিল; তাই তো, মনিশের চেহারা তো খুবই খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহার বড় বড় চোখ দুইটা ভিতরে বসিয়া গিয়াছে, তাহার চোখের নিম্নে কালি পড়িয়াছে! মুখখানাও অত্যন্ত শুখাইয়া গিয়াছে। এতক্ষণ যে মনীশের পানে চাহিয়াও তাহার শরীরটা চোখে পড়ে নাই, ইহা ভাবিয়া সতী কি জানি কেন—ভারি কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল।

সতী তাহার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া মনীশ হাসিয়া বলিল, "চেয়ে দেখছ সতী, কতখানি রোগা হয়ে গেছি, না?"

সতী উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "বাস্তবিক তাই দেখছি। সত্যি আপনার চেহারাটা ভারি খারাপ হয়ে পড়েছে। আপনাকে কিছুদিন অন্য জায়গায় থাকা উচিত। আর আপনি নিজের পানে তাকাতে একেবারেই উদাসীন। ও-রকম করলে কয়দিন শরীর টেঁকতে পারে?"

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার ঝঙ্কার ফুটিয়া উঠিতেছিল।

মনীশ বলিল, "আমি তাকাতে উদাসীন—কারণ একজন তাকাতে আছে যে যতদিন মা থাকবেন ততদিন নিজের পানে কে চায়? যা হয় মা করবেন, আমি তার কি জানি?"

সতী বলিল, "মা যখন না থাকবেন তখন তা হলে কি অবস্থা হবে আপনার? এরপরে কখনও কি নিজের পানে তাকাবেন?"

ঊষা মাঝখান হইতে বলিল, "তখন বউদি থাকবে যে, বউদি সব দেখবে। এখন যেমন আছ মনীশ দা, বউদি এলে আর তেমনটী থাকতে হবে না।"

মনীশ হাসির সহিত রাগ মিশাইয়া বলিল, "তুই দিন দিন ভারি বখাটে হচ্ছিস্ ঊষা, আমি দেখছি বিয়ে হয়ে তুই আরও বয়ে গেছিস। বউ এলেই যদি কান ধরে উঠায় বসায়, তবে মৃন্ময়ের এমন অবস্থা কেন?"

এই একটা কথাতেই ঊষা উঠিয়া পলাইল।

সতী হাসিয়া বলিল, "বউদির মত মেয়ে হলে এমনিই হয় বটে, কিন্তু যদি তেমনি মেয়ে হয়, তবে—"

বাধা দিয়া মনীশ বলিল, "আমার অদৃষ্টে বিধাতা তা লেখেন নি। হাত দেখা জানো সতী, কোষ্ঠি কাকে বলে তাও বোধ হয় জানো। আমার কোষ্ঠিতে আছে আমার বিয়ে হবে না, আর বাস্তবিক আমি বিয়ের' পরে একেবারেই চটে আছি। যাক, সে সব কথা; ভাত নামিয়েছ, হাত পোড়ে নি তো?"

সতী একটা নিঃশ্বাস খুব সতর্কে ফেলিয়া বলিল, "না।"

"দেখলে আমার আশীর্ব্বাদের জোর—"

মনীশ উঠিয়া পড়িল,—"যাচ্ছি আজকের মত, কাল একবার এসে দেখে যাব। আর—সতী, তোমায় একটা কাজ দিয়ে যাই—"

সতী বলিল, "বলুন।"

মনীশ বলিল, "তোমার দাদা আসবামাত্র ধরে এনে তোমার বউদিকে দেখিয়ো, আর ওষুধ নিয়ে তুমি নিজের হাতে খাইয়ো। ঊষাটা এমন দুরন্ত মেয়ে যে, কিছুতেই ওষুধ খেতে চায় না, লুকিয়ে ফেলে দেয়। ওকে উমা একটুও বিশ্বাস করত না! আমি তোমায় এই ভারটা দিয়ে যাচ্ছি, করবে তো?"

সতী অবনত মস্তকে বলিল, "এ আমাদেরই কর্ত্তব্য কাজ, অবশ্য করতেই হবে। আপনি বিকেলে একবার আসবেন অবশ্য করে, দেখে যাবেন।"

মনীশ একটু ভাবিয়া বলিল, "দেখি, পারি তো আসব।"

মনীশ বাহির হইয়া গেল।

(১৪)

রাত্রি তখন অনেক হইয়া গিয়াছে। সতী তখনও ঊষার গৃহে বসিয়া ছিল। ঊষার দুপুরে জ্বর আসিয়াছে, এখনও সে জ্বর সমভাবে রহিয়াছে। মৃন্ময় বৈকাল বেলা বেড়াইতে গিয়াছে, এখনও আসে নাই। প্রায়ই ফিরিতে তাহার রাত্রি হইত।

মালতী দেবী গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে চাপাস্বরে বলিলেন, "তুই এখনও বসে আছিস সতী, শুতে যাস নি যে?"

সতী উত্তর দিল, "কেমন করে যাই? মাথায় আইস-ব্যাগ ধরে বসে আছি। জ্বর যেমন তেমনিই আছে, কেবল বকছে, কাঁদছে, একটা মানুষের এখানে থাকা চাই তো।"

মালতী দেবী বলিলেন, "আমি থাকছি, মনীশ এসেছে, সেও মৃন্ময়কে ধরে নিয়ে আসছে, তুই এবার যা।"

"যাচ্ছি" বলিয়া সতী তথাপি বসিয়া রহিল।

মা বলিলেন, "সামনে তোর একজামিন আসছে, দুটো বছর পড়ে পড়াটা মাটী করবি সতী? আজ কয়দিন তো পড়া মোটে করিস নি, আজ এই ঘরেই কাটালি, এই রকম করলেই একজামিন দিবি খুব ভাল।"

দরজার কাছে মৃন্ময়ের কথা শোনা গেল, "আঃ, টানাটানি কর কেন, আমি যাচ্ছি তো।"

মনীশ তাহার হাতখানা ধরিয়া টানিতেছিল, বলিল "টেনে না আনলে কত যে এস, তা আমিই জানি। আজ সারাদিন বেচারাকে একবার দেখলে না, এক ডোজ ওষুধ পর্য্যন্ত দিলে না, অথচ তুমিই হচ্ছ ডাক্তার। তোমার বাড়ীতে তোমার স্ত্রী বিনা ওষুধে ভুগবে, তুমি বাইরে লোকের নাড়ী টিপে ওষুদ খাইয়ে বেড়াবে? দেখ, যাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছ, তার সম্বন্ধে এতটা উদাসীন হওয়া তোমার কোন মতেই মানায় না।"

মালতী দেবীকে দেখিয়া সে বলিল, "এই যে মা, আপনি এসেছেন। আমি ভাবছিলুম আপনাকে ডাকতে পাঠাই। এই দেখুন, মৃন্ময়কে ধরে আনলুম। তার দায়িত্ব, না আমার দায়িত্ব বলুন দেখি? আমার বোন, তার স্ত্রী। আমাদের এখন কোনও দাবী নেই, দাবী তো ওর, তবে ও দেখবে না কেন?"

মৃন্ময় তাহার মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "থাক, তোমার হাতে ধরছি, আর অনর্থক বোকো না। আমি সময় পাই নি সারাদিন তাই—"

বাধা দিয়া মনীশ বলিল "রাখো তোমার সময় পাই নি কথা। নাও, আগে দেখ, একটা কোন ওষুধ দাও, ওটা আমাদের চেয়ে তুমিই বোঝ ভাল, তোমার ব্যবসাই ওই। আমরা কেবল নাদানে গুরু, অর্থাৎ ছেলে ঠেঙিয়ে মানুষ করি, আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই।"

মৃন্ময় আর কথা না বাড়াইয়া স্ত্রীকে পরীক্ষা করিল, তাহার পর মুখটা একটু গম্ভীর করিয়া বলিল "চল, ওষুধ দিচ্ছি।"

মনীশ বলিল "শুধু ওষুধ দিয়েই কর্ত্তব্য ফুরাবে না বন্ধু, এখানে থাকতে হবে।"

মৃন্ময় চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল "এখানে—আমি?"

মনীশ তাহার স্কন্ধে একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিল "হ্যাঁ, তুমি। তুমি একটা কেষ্ট বিষ্ণু কিছু নও যে থাকতে পারবে না। বিলেত হতেই এস আর যাই কর, তুমিও একটা মানুষ, আর তোমারই স্ত্রী এ। মা সতী এঁদের থাকার চেয়ে আমার মনে হয় তোমার আমার থাকা ভাল।"

বিস্ময়ে মৃন্ময় বলিল "তুমিও থাকবে?"

মনীশ বলিল "নিশ্চয়ই থাকব। ভয় নেই, তোমায় কিছু করতে হবে না, তুমি এই কৌচটায় পড়ে অনায়াসে এক ঘুমে সকাল করতে পারবে, যা করতে হয় তা আমিই করব।"

মৃন্ময় বলিল "ঘুমাবই যদি—তবে থেকে লাভ?"

মনীশ বলিল "লাভ যথেষ্ট আছে বন্ধু, লাভ না থাকলে মনীশ এ কাজ করতে আসে না। কাল আমি তোমার যত বন্ধু আছে, সকলকে ডেকে বলব: মৃন্ময়ের স্ত্রীর জ্বর হয়েছিল, মৃন্ময় সারারাত ধরে তার সেবা করেছে।"

মৃন্ময় একটু হাসিল, তাহার পর ঔষধ আনিতে গেল।

সতীকে ও মালতীদেবীকে উঠাইয়া দিয়া তাহারা উভয়ে সেই গৃহে রহিল।

সামনে খোলা ছাদ, তাহার ওদিকে পাশাপাশি করেকটা কক্ষ, ইহারই একটাতে সতী থাকিত।

সতী ঘরে গেল না, চুপ করিয়া খানিকটা খোলা ছাদে দাঁড়াইয়া রহিল।

কি জানি কি একটা বেদনা তাহার বুকের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া ধাক্কিয়া উঠিতেছিল, কি জানি কেন, আজ তাহার মনে হইতেছিল সে একবার কাঁদে, কাঁদিয়া বুকের ব্যথাটাকে কতকটা কম করিয়া ফেলে। কোনও

একটা অছিলা সে খুঁজিয়া পায় নাই, যাহাতে সে কাঁদিতে পারে।

ঊষাই মনীশের চোখে বড় অভাগিনী;—কিন্তু কেন সে অভাগিনী? ঊষা সুখিনী, সে জগতের সব জিনিসই পাইয়াছে, স্বামীর ভালবাসা—তাহাও পাইবে। মনীশ তাকে বড় ভালবাসে—কিন্তু কেন এ ভালবাসা? কাহার খাতিরে এ ভালবাসা? ঊষার জন্য ঊষাকে ভালবাসা! কিন্তু এ সে রকম নয়, বন্ধুর জন্য বন্ধুকে ভালবাসা, এ সে ভালবাসাও নয়; এ ভালবাসা আর একজনের খাতিরে, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী সতী তাহা বুঝিয়াছে।

উমার কষ্ট হইবে ভাবিয়াই মনীশ ঊষাকে এত টানিতেছে। সতী দুই করতলে মাথা রাখিয়া উমার কথাই ভাবিতে লাগিল।

কে সে উমা, কি রকম সুন্দরী সে, কি রকম লেখাপড়া সে জানে, যাহাতে মনীশ একেবারে মুগ্ধ? উমার নাম করিতে মনীশের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহার চোখ দুইটা অসম্ভব দীপ্ত হইয়া উঠে। সতী বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, মনীশ কতদূর ভক্তি, কতদূর শ্রদ্ধার সহিত উমার নামটা উচ্চারণ করে। উমার বর্ণনা করিতে মনীশ একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ে।

উমা মনীশের কে?

মনীশ উমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, এই কথাটা মন যেমন সহজে মানিয়া লইতে চায়, আবার কোথা হইতে কে আপত্তি করে—না তাহা হইতে পারে না। এ যেন একেবারেই অসম্ভব, মনীশ কাহাকেও ভাল বাসিতে পারে না।

সতী সামনের গৃহটার পানে চাহিল, সে গৃহ হইতে মনীশের হাসি ভাসিয়া আসিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল—"আঃ, কি পাগলামী কর মনীশ, তোমার ছেলেমানুষি এখনও গেল না দেখছি। রোসো, এবার বিয়ে দিয়ে একটা বউ এনে দিচ্ছি, তখনই থাকবে জব্দ, কারও কাছে আর টুঁ শব্দটী করতে পারবে না।"

মনীশ কি বলিল শোনা গেল না।

সতী কান পাতিয়া ছিল সেই উত্তরটা শুনিবার জন্য, কিন্তু না, তাহার কানে মনীশের একটা কথাও আসিয়া পৌঁছিল না।

কি কথা সে শুনিবে? মনীশের যা কথা তাহা তো শুনিয়াছেই সে; মৃন্ময়কেও সেই কথা বলিল, আর কি বলিবে!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

পরদিন হইতে মা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন সে লেখাপড়ার মধ্যে একেবারেই ডুবিয়া গেল। সামনে একজামিন, আর কয়দিন পরেই আরম্ভ হইবে; দিনকত সে মোটেই যে বইতে হাত দেয় নাই, তাহারই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল। কদাচিৎ দুই একবার ঊষার কাছে সে যায়, যে সময় মনীশ না থাকে সেই সময়ে।

সে দিন সন্ধ্যাবেলা চায়ের টেবলে মৃন্ময় তাহার মুখের পানে লক্ষ্য করিয়া বলিল "তোর চেহারাটা হঠাৎ এমন খারাপ হয়ে গেল যে সতী?"

পিতা প্রসন্ননাথ রায় চায়ের কাপে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে বলিলেন "সামনে একজামিন কিনা—"

মৃন্ময় হাসিয়া বলিল "আমার ব্যারামটা সতীরও আছে। সারা বছর হেসেখেলে বেড়িয়ে একজামিনের সময় কি পড়া—চেহারা অস্থিচর্ম্ম-সার হয়, আর কপালের পরে একটা ভারী পাথর ঝুলানো থাকে, কি হয়, কি হয়? যদি কেলের কথা মনে হয়—তখন—"

বলিয়া সে মুখভঙ্গি করিয়া হাসিল।

সতী উঠিয়া বলিল "আমি যাই।"

পিতা বলিলেন "যাও মা, যাতে পাস হতে পার, ভাল হয়ে, তার চেষ্টা কর। আমার মুখটা তা হলে থাকে, লোকের কাছে গর্ব্ব করতে পারি।"

সতী চলিয়া গেল।

আজ চার পাঁচ দিন হইতে মনীশ আর তাহাদের বাড়ী আসে নাই, সতী ইহাতে একটা জ্বালামিশ্রিত শান্তি অনুভব করিতেছে। মনীশ আসিলেই তাহার মনটা ছুটিয়া যাইত সেখানে—যেখানে মনীশ থাকিত; কান দুইটা মনীশের কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বাহিরে যাইত, কিছুতেই অবাধ্য মনকে সে পাঠে সন্নিবিষ্ট করিতে পারে না; যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিত, সে নিজেকে তিরস্কার করিয়া জোর করিয়া মনকে ফিরাইত, কিন্তু অবাধ্য মন আবার ছুটিত।

এ রকম তো ভাল নয়। মনীশ তাহার কে, কেন সে মনীশের কথা শুনিতে, মনীশকে দেখিতে এত ব্যগ্র?

শুধু আজ বলিয়া নয়, ছোটবেলা হইতে মনীশকে সে দেখিয়া আসিতেছে। মনীশের কাছ হইতে কতদিন সে পড়া জানিয়া লইয়াছে। সেদিন তাহার গৃহ-শিক্ষক উপস্থিত না হইত, সেদিন মনীশ তাহাকে পড়াইয়াছে। তখন সে ছিল ছোট একটী বালিকা, আর সেই ছোট বালিকাটীর মনের অতি নিভৃত কোণে প্রণয়রাশি জমিয়া স্তূপীকৃত হইতেছিল।

এতদিন সে মনীশের সঙ্গ এড়াইয়া চলিতে চায় নাই, কিন্তু এখন সে বুঝিয়াছে তাহার এ প্রেম নিষ্ফল, মনীশ তাহাকে বোনের চোখে দেখে, প্রণয়পাত্রীরূপে তাহাকে কখনও দেখিতে পারিবে না।

হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তন করিবার জন্য সে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছে, প্রাণপণে মনীশের কাছ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্ট করিতেছে।

একজামিন আসিল—এবং তাহা শেষও হইয়া গেল। সতী একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মায়ের কাছে গেল "এখন বাইরের সব কাজ তো শেষ হয়ে গেল মা, ভেতরের কাজগুলো শেখাও, নইলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।"

মৃন্ময় বলিল "ভেতরের কাজ আবার তুই কি শিখবি রে? তুই বুঝি বি-এ পাস করে ঢুকবি গিয়ে রান্নাঘরে?"

সতী বলিল "বি-এ পাস করলেই আমাদের সব শিক্ষা শেষ হল নাকি দাদা? পড়াটা হচ্ছে বাইরের জিনিস, ভেতরের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি? আমরা লেখাপড়া শিখলে আমাদের অন্তঃপুরের ভার বইতে হবে না, এমন কি কথা আছে? এটা যে আমাদেরই জিনিস, এটাকে দেখতে হবে আমাদেরই। আমাদেব লেখাপড়া শেখার মানে জীবন-যাত্রাকে সরল সুগম করা। যদি রান্নাঘরে না গেলুম, তবে আধখানাই যে বাকি থেকে গেল দাদা? আর আজ কি সে কাল আছে, মেয়েরা একটু ইংরাজি শিখে রান্নাঘরের দিকে গেলে হিষ্টিরিয়া হয়ে পড়বে? ও সব ব্যারাম আমাদের এখন ডেকে আনলে চলবে না, অভাব আমাদের দুয়ারে, ব্যারাম নিয়ে থাকলে যুদ্ধ করব কি করে?"

কথাগুলো সম্পূর্ণ মনীশের, তাহাতে একটুও সন্দেহ ছিল না। মৃন্ময় চোখে চসমা দিতে দিতে বলিল "দেখছি প্রফেসরের সঙ্গে তোর মতের ঠিক মিল হয়। এক কাজ কর না সতী, প্রফেসরকে বিয়ে করে ফেল, নইলে তোর মতে চলবে এমন পাত্র আর কোথায় খুজতে যাব। প্রফেসর আর তুই, তোরা দুজনে বেশ একটা সুখের সংসার গড়িয়ে ফেলতে পারবি।"

সতীর মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইয়া বলিল "যাঃও, দাদা কি যে বলে, তার ঠিক নেই।"

মৃন্ময় বলিল "মন্দটা কি বলেছি? প্রফেসর মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে বলে, কিন্তু বেচাল দেখলেই তার সর্ব্বনাশ। সে বলে, মেয়েরা লিখুক, পড়ুক, কিন্তু যে জায়গাটা তাদের সেইখানেই তারা থাক। তারা রান্না শিখুক, সন্তান লালনপালন করা শিখুক, ঘরের অন্য কাজ-কর্ম্ম দেখুক।"

সতী বলিল "বাস্তবিকই তো, সে কথা ঠিক। মনীশ বাবু যা বলেন, তার কোন্‌টা সত্যি নয়? তিনি বলেন সেকালেও তো আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষা পেত, অবশ্য ইংরাজী না হলেও সে শিক্ষা পুরুষদের মতই তাঁরা লাভ করতেন। আমিও পড়েছি, অনেক কাল আগে এই দেশের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে একত্রে যজ্ঞ, হোম পর্য্যন্ত করেছেন। এই দেশের মেয়ে—খনা, লীলাবতী, গার্গি, তাঁদের নাম আজও পর্য্যন্ত ভারতের বুকে সোণার অক্ষরে আঁকা রয়েছে। তাঁরা অবধি বিদ্যাচর্চ্চা করেছেন। আবার তাঁরাই কি সংসারের কাজ করেন নি? দেশের মেয়েরা সব সময়েই পুরুষের সাহায্য করতেন, সব বিষয়ে তাঁরা দৃষ্টি রাখতেন। খাওয়া-পরার ভার তাঁদের হাতে, সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার ভার তাঁদের হাতে। এতে তাঁদের সংসার সুখশান্তিময় ছিল, ছেলে-মেয়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকত, উন্নত মন হত। কি মন্দটা ছিল তখন, আর কি হয়েছে এখন? তুমি দাদা—তুমি চাও, মেয়েরা সেজে পুতুলটীর মত সাজানো থাকবে, তাকে তুমি শুধু নিজের আনন্দদায়িকা বলেই মনে করবে। সে সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকবে, ছেলে মেয়ে কি করে মানুষ করে তুলতে হয় তা জানবে না—"

"ওঃ; তাই সতী কাজ শিখতে আসছে। বিয়ে হবে, ছেলে মেয়ে হবে—বড্ড আশা যে—"

হাসিতে হাসিতে সতীর বেণীটা ধরিয়া টানিয়া একটা পাক দিয়া মৃন্ময় চলিয়া গেল।

মালতী দেবী ভাই বোনের কথা শুনিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছিলেন; সতী রাগ করিয়া বেণীটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "উচিত কথা বলেছি কিনা, তাই দাদার বড্ড বা লেগেছে। মা, আমি এখনি স্নান করে আসছি, তুমি আজ আমায় সব দেখিয়ে দাও, আমি রাঁধব।"

"মা কেন দিদি, তুমি আর আমি, আমরা দুজনে করি, মার আজ ছুটি দেওয়া গেল।"

ঊষা এতক্ষণ বাহির হইতে পারে নাই, মৃন্ময় চলিয়া গেলে সে বাহির হইয়া কথা কহিয়া বাঁচিল।

সতী আনন্দিত হইয়া বলিল, "তবে আর কি, বউদি তো আছে, আমরা দুজনে বেশ কাজ ক'রব্‌খন। তুমি যাও মা, শুয়ে থাক গিয়ে খানিকক্ষণ।"

মালতী দেবী বলিলেন "আমি এখানে বসে থাকি না কেন?"

ঊষা বলিল "না, তা হবে না। আমি সব রাঁধতে জানি, দিদি আমায় সব শিখিয়েছিল—"

দূর ছাই, দিদির কথা বলিতে বলিতে চোখে জল আসিয়া পড়ে। ঊষা মুখ ফিরাইয়া গোপনে চোখ মুছিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল "একদিন দেখুন না মা, আমি তো রাঁধব না, দেখিয়ে দেব, দিদি রাঁধবে। আপনি যান, দিদিও ততক্ষণ চান করে আসুন।"

তাহাদের উভয়ের নির্ব্বন্ধানুযায়ী মালতী দেবীকে উঠিতেই হইল। সতী তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া মায়ের রন্ধন চাপাইল। আজ তাহারা দুইজনেই মায়ের এখানে খাইবে—ভারি আনন্দ।

মৃন্ময় ও প্রসন্ন বাবু আহারে বসিলে মালতী দেবী সতীর রান্না তরকারী পরিবেশন করিয়া বলিলেন "বি-এ মেয়ের হাতের রান্না খেয়ে দেখ; অন্নপূর্ণা দেখিয়ে দেছে, লক্ষ্মী রেঁধেছে।"

প্রসন্ন বাবু হাসিলেন।

মৃন্ময় তরকারী চাকিয়া গম্ভীর মুখে বলিল "রাঁধুনীকে একখানা খুব ভাল রকম সার্টিফিকেট দিতে হবে বাবা।"

মালতী দেবী হাসিমুখে বলিলেন "আর যে দেখিয়েছে?"

মৃন্ময় মাথা নত করিয়া খাইতে লাগিল। পুত্রের পানে একবার তাকাইয়া পিতা বলিলেন "সে সার্টিফিকেটটা আমার মাকে আমিই দেব না হয়।"

(ক্রমশঃ)

সভ্যতা-বিকাশের আর্থিক ব্যাখ্যা

(জার্ম্মান সমাজতত্ত্ববিৎ এঙ্গেল্‌স্ প্রণীত গ্রন্থের এক অধ্যায়)

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ

গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া-চুরিয়া মানব-জাতি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীর কোনো কোনো অঙ্গ একদম তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অঙ্গগুলার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন মাত্র সাধন করা দরকার হইয়াছিল।

গোষ্ঠী হইতে খাঁটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটাইতে অনেককাল লাগিয়াছে। সাবেককালে জনগণ গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী এবং জাতি, এই তিনকেন্দ্রে অনেকটা স্ব স্ব প্রধান ভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত ছিল। এই সকল কেন্দ্র তুলিয়া দিয়া তাহাদের ঠাঁইয়ে রাষ্ট্রকে বসাইয়া মানব-সমাজ এক নতুন অভ্যাসের জন্ম দিয়াছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্বে "স্বদেশ" রক্ষা করিবার ক্ষমতা আসা জগতে এক বিপুল বিপ্লব বিশেষ। এই ক্ষমতা এক্ষণে "বিদেশী" শত্রুদের বিরুদ্ধে কায়েম হইতে পারে এমন নয়।

স্বদেশের জনসাধারণকে দাবিয়া রাখিবার জন্যও এই রাষ্ট্রগত সামরিক শক্তি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলার জন্ম ও শৈশব প্রাচীন আথেন্সের ঘটনাবলীতে অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। আথেনিয় সমাজের প্রত্নতত্ত্ব এই কারণে নৃতত্ত্ববিদ্যায় বিশেষ কাজে লাগে। মর্গ্যান গোষ্ঠী হইতে রাষ্ট্রের জন্ম বুঝাইবার জন্য আথেনিয় ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই স্তর-পরম্পরা এবং রূপান্তর বা ক্রমবিকাশের বৃত্তান্তে আর্থিক অর্থাৎ ধনদৌলত বিষয়ক তথ্যগুলা বিশেষরূপে লক্ষ্য করা আবশ্যক। সেই দিকে মর্গ্যানের দৃষ্টি বেশী ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান আলোচনায় সেই অভাব পূরণ করা হইতেছে।

(১)

প্রাচীনতম অর্থাৎ "বীর"-যুগের কথা ধরা যাউক। তখনকার দিনে আথেনিয়গণ চার জাতিতে বিভক্ত ছিল। আর্টিকা প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এই চার জাতি বসবাস করিত। জাতিগুলা বিভক্ত ছিল বার ফ্রাত্রীতে। ফ্রাত্রীগুলাও সেক্রোপ্স জনপদের ভিন্ন ভিন্ন বার নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বীর-যুগের অন্যত্র যেমন,—আর্টিকায়ও "আগোরা" নামক সার্ব্বজনিক সভা এবং "বুলে" নামক পরিষৎ এই দুই প্রতিষ্ঠান জনগণের শাসন চালাইয়া "বাসিলিউস" নামক লড়াই-নায়ক ছিল শাসন-পদ্ধতির তৃতীয় অঙ্গ।

যতদূর পর্য্যন্ত লিখিত ইতিহাসের নজির ঠেকানো যায়, ততদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই যে, জমিজমা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব রূপে ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। "বার্ব্বার" সভ্যতার ঊর্দ্ধতম স্তরে ধনদৌলত এবং শিল্পবাণিজ্য যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছিল। শস্য, মদ এবং তেল ছিল প্রধান দ্রব্য। ঈজিয়ান সাগরের বাণিজ্য ফিনিসিয় জাতির তাঁবে হইতে আথেনিয়দের হাতে আসিয়া পড়িতেছিল।

ভূমি-সম্পত্তির কেনাবেচা চলিত বেশ স্বাধীনভাবে। কৃষি এবং শিল্প এই দুই ভিন্ন ভিন্ন পথে ধনসৃষ্টি হইত প্রচুর পরিমাণে! তাহার উপর ব্যবসায় এবং নৌচালন এই দুই পন্থও আর্থিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নরনারীরা সুখস্বচ্ছন্দতা এবং সম্পদ বাড়াইবার নানা কৌশল কাজে লাগাইতে লাগাইতে শ্রমবিভাগ-নীতির নিয়মে অনেকটা বিশেষত্ব বা ওস্তাদের দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল। লোকজনের মধ্যে লেনদেন, দ্রব্য-বিনিময়, কর্ম্মের আদান-প্রদান বাড়িয়া গিয়াছিল। ফলতঃ সাবেক কালের গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী এবং জাতি নামক তিনটা স্ব স্ব প্রধান কেন্দ্রের সীমানাগুলা ভাঙিয়া যাইতেছিল।

এই সীমানা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর মেশামেশি অনিবার্য্য। এমন কি এই তিন কেন্দ্রের বহির্ভূত (অতএব সেকালের বিচারে "বিদেশী") বহু লোক কেন্দ্রগুলার অন্তর্গত এবং স্বগ্রামের বাসিন্দারূপে "সনাতন" আথেনিয় সমাজের সামিল হইতেছিল।

কিন্তু এই নবাগত নরনারীদিগকে তখনও পূরাপূরি "স্বদেশী" বা স্বসমাজের লোক বলিয়া স্বীকার করা হইত না। গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী এবং জাতি নিজ নিজ শাসন-কার্য্যে এই সকল "অতিথি-নাগরিক"দিগকে কোনো এক্তিয়ার দিত না; ইহারা তখনও সনাতন কেন্দ্রের পূরা অধিকারী বিবেচিত হইত না।

কাজেই একটা হ-য-ব-র-ল এবং সামাজিক গোঁজামিল চলিতেছিল। গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানে ষোল আনা শৃঙ্খলা বজায় রাখা আর সম্ভবপর হয় নাই। বীরযুগেই গোষ্ঠী প্রথায় ভাঙন দেখা দিয়াছিল। "ধর্ম্মস্য গ্লানি" এবং "অভ্যুত্থান-মধর্ম্মস্য" প্রকট হইতেছিল। এই অবস্থায়ই যুগপ্রবর্ত্তক থিসিউস দেখা দেন। তাঁহার নামে একটা শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচীন আথেন্সের স্বধর্ম্মে এই এক বড় কথা।

(২)

থিসিউসের বিধানে একটা কেন্দ্রীকৃত শাসন-ব্যবস্থা রুজু হয়। এতদিন জাতিগুলা স্ব স্ব প্রধান ভাবে যে সকল কাজকর্ম্ম করিতেছিল, তাহার অনেকগুলা এই কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠানের তাঁবে আসিল। আথেন্স একটা সমষ্টিতে—বৃহত্তম সমষ্টিতে পরিণত হইল।

আমেরিকার ইরোকোয়া বা অন্যান্য "ইণ্ডিয়ান" সমাজে এই ধরণের শাসন-ক্ষমতাযুক্ত কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। এইখানেই আথেনিয় এবং ইণ্ডিয়ান সমাজে ক্রমবিকাশের প্রভেদ। ইণ্ডিয়ান সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলা মিলিয়া একটা ফেডার‍্যাল বা সংযুক্ত-জাতি

গড়িয়া তুলিয়াছিল সত্য। কিন্তু থিসিউসের বিধানে একটা সংযুক্ত-জাতি মাত্র গড়িয়া উঠে নাই। ইহার ফলে একটা ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীকৃত উচ্চনীচ-স্তরশীল শাসন-সমষ্টি উৎপন্ন হইতে পারিয়াছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আইন বা "ধর্ম্ম" সম্বন্ধেও যুগান্তর দেখা দেয়। সাবেককালে ছিল গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী ইত্যাদির নিজ নিজ স্মৃতি ও নীতি-শাস্ত্র। অর্থাৎ আটিকায় চলিতেছিল এক সঙ্গে বহুবিধ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বধর্ম্ম। থিসিউসের ব্যবস্থায় সমগ্র আথেনিয় সমাজের জন্য একটা সমষ্টিগত কানুন জারি হইল। এই কানুন পুরাণা গোষ্ঠীগত কানুনগুলা ছাপাইয়া উঠিয়াছিল।

থিসিউস-সংহিতার জোরে আথেন্সে এক বিপুল "ধর্ম্ম"-বিপ্লব স্থায়ী ঘর করিয়া বসিল। আথেন্সের নরনারীরা স্বগোষ্ঠী, স্ব-ফ্রাত্রী এবং স্ব-জাতির এলাকার বাহিরেও কতকগুলা দাবী-দাওয়া এবং বিধি-নিষেধের সামিল হইতে পারিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সনাতন আথেনিয় সমাজের বহির্ভূত বিদেশী, অজ্ঞাতকুলশীল, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি ধরণের লোকও আথেন্সে খাঁটি স্বদেশী বা গোঁড়া আথেনিয়দের ইজ্জত এবং অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ হইল। এক কথায়, গোষ্ঠী-প্রথার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটিল।

এই গেল থিসিউসের প্রথম কীর্ত্তি। আর এক কীর্ত্তি দেখিতে পাই আথেনিয় সমাজের শ্রেণীবিভাগ করণে। সাবেক কালের গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী এবং জাতি এই তিন কেন্দ্রের পরিবর্ত্তে নতুন ধরণের তিন কেন্দ্র থিসিউস-সংহিতার বিশেষত্ব। একটার নাম "ইউপানিদে"। ইহারা অভিজাত শ্রেণীর লোক। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম "গেওমোরোয়"; ইহারা চাষী। তৃতীয় শ্রেণীকে বলে "দেমিউর্গয়ে" বা ব্যবসায়ী। পুরাণা তিন জীবন-কেন্দ্রের সঙ্গে এই নয়া তিন শ্রেণীর কোনো যোগাযোগ ছিল না।

থিসিউসের বিধানে ইউপানিদে বা কুলীনেরাই সরকারী পদের একমাত্র অধিকারী। এই একতিয়ার ছাড়া অভিজাতদের আর কোনো বিশেষ অধিকার ছিল না। আইনের চোখে তিন শ্রেণীর লোকই অন্যান্য সকল হিসাবে স্বাধীন এবং সমান বিবেচিত হইত।

তবে এই সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের কাণ্ডে কতকগুলা নতুন শক্তি-সমাবেশের প্রভাব বেশ স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইতেছি। সাবেককালে গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী ইত্যাদি কেন্দ্রের সার্ব্বজনিক পদগুলা বংশানুক্রমিকরূপে অধিকৃত হইত। কতকগুলা পরিবার এই অধিকার প্রায় একচেটিয়ারূপে ভোগ করিতেছিল। এই প্রথায় বাধা দিবার অথবা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার কোন আন্দোলন বা প্রচেষ্টা দেখা যায় নাই।

গোষ্ঠী ভাঙিয়া যাইবার সমসমকালে এই সকল অধিকার-বিশিষ্ট পরিবারগুলা প্রভূত ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়া পড়িয়াছিল। এই সব ধনদৌলতওয়ালা বংশ গোষ্ঠীর বাহিরে একটা ধনিক বা অভিজাত বা কুলীন শ্রেণী গড়িয়া তুলিতেছিল। থিসিউস-সংহিতায় এইরূপ অভিজাত-শ্রেণীকে ধর্ম্মসঙ্গত বা ন্যায্যরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ আথেনিয় "রাষ্ট্রে"র জন্মকালে ধনপতি শ্রেণীর প্রভুত্ব বা বিশিষ্ট অধিকারভোগ জনগণের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ ছিল।

আর এক কথা। ধনোৎপাদনের প্রণালী যথেষ্ট বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছিল। কিষাণ নরনারীদের কার্য্যকলাপ আর বণিক ব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রা দুই ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত বিবেচিত হইত। অধিকন্তু, এই দুই ধরণের ধনস্রষ্টাদের প্রভাব সমাজে বিশিষ্টরূপেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ফলতঃ সাবেক কালের গোষ্ঠী ইত্যাদি কেন্দ্রমণ্ডলীকে মানব-জীবনের সুখবিধানের তরফ হইতে আর বেশী সম্মান করা হইত না। আর্থিক হিসাবে এক নবীন শ্রেণী-বিভাগ থিসিউস-সংহিতায় অবশ্য কর্ত্তব্যই বিবেচিত হইয়াছিল।

থিসিউসের বিধানে সনাতন গোষ্ঠীপ্রথা ভাঙ্গিয়া গেল। একটা নূতন কিছু দেখা দিল। সাবেক কালের স্বধর্ম্মের ঠাঁইয়ে মাথা তুলিল এক নয়া স্বধর্ম্ম। এই নূতন-কিছুর নাম রাষ্ট্র।

এইখানে বুঝিতে হইবে যে গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র একসঙ্গে থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইবামাত্র গোষ্ঠীর অস্তিত্বলোপ, এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করিতেছে। যতদিন গোষ্ঠী সজীব ছিল, ততদিন রাষ্ট্র দেখা যায় নাই। যেই রাষ্ট্রের জন্ম হইল, অমনি গোষ্ঠী গুঁড়া হইয়া গেল। রাষ্ট্রে গোষ্ঠীতে আদায় কাঁচ-কলায় সম্বন্ধ।

গোষ্ঠীর ভাঙনটা আর একটুকু তলাইয়া বুঝা আবশ্যক। এই ভাঙনের প্রথম কথা রক্তের ঐক্য বা সমতা সম্বন্ধে

ঔদাসীন্য বা অবজ্ঞা। লোকেরা রক্তের টানকে একটা বড় কিছু বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইত না। তাহার পরিবর্ত্তে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অথবা দলে দলে রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আড়াআড়িই নবীন ধর্ম্মের লক্ষণ হইল।

দ্বিতীয় কথা, শ্রেণী-ভেদ এবং শ্রেণী-বিবাদ। একদল হইল ক্ষমতাশালী "অধিকারী"। অপরদল হইল ক্ষমতা-হীন "অনধিকারী"। অধিকারীদের শ্রেণীর সঙ্গে অনধিকারীদের শ্রেণীর দ্বন্দ্ব গোষ্ঠী-ভাঙনের এক বিশিষ্ট লক্ষণ। অনধিকারীরা চাষী এবং ব্যবসায়ী এই দুই আর্থিক শ্রেণীতে বিভক্ত।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঙ্গে-সঙ্গে রক্তের টানের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং আর্থিক দলাদলি আথেনিয় সমাজের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। থিসিউস-সংহিতা আলোচনা করিবার সময় এই তথ্যটা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

(৩)

থিসিউসের পরের যুগে বাসিলিউসের পদ ক্রমে ক্রমে উঠিয়া গিয়াছিল। অভিজাত শ্রেণী হইতে আর্কন বা রাষ্ট্রনায়ক বাছাই করা হইত। সমাজে তাহাদের প্রতিপত্তিও ছিল অনেক। কুলীনদের বাড়াবাড়ি চরমে গিয়া ঠেকিতেছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ সালে ইহা একপ্রকার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

আথেন্স নগরের ভিতর এবং আশেপাশে সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদের আড্ডা ছিল। সমুদ্র-বাণিজ্য এবং সমুদ্র-ডাকাইতির সাহায্যে ইহারা ধন সঞ্চয় করিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। নগদ কাঁচা টাকা তাহাদের হাতে থাকিত অনেক। কিষাণ সমাজে এই টাকা ধার দিয়া তাহারা একসঙ্গে নিজেদের ধনবৃদ্ধিও করিত, আবার জনগণের উপর অত্যাচার চালাইতেও সমর্থ হইত। একে মুদ্রার দৌরাত্ম্য, তাহার উপর সুদখোর মহাজনদের প্রভুত্ব; এই দুই দফায় কৃষিজীবী সাবেক কালের সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

টাকার প্রচলনের সঙ্গে গোষ্ঠীপ্রতিষ্ঠান খাপ খায় না। কৃষিপ্রধান গোষ্ঠী-সমাজ ধনপতি সুদজীবীদের পাল্লায় পড়িয়া উচ্ছন্ন গেল। সুদজীবীরা কর্জ্জ দিবার সময় জমিজমা বন্ধক লইতে সুরু করিয়াছিল। লগ্নি আর বন্ধকির কারবারে মহাজনেরা জ্ঞাতি-কুটুম্ব, রক্তের টান, এক কথায় গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী ইত্যাদি সম্পর্কের কথা মুখেও তুলিত না, বলাই বাহুল্য।

টাকা ধার পাওয়া, সম্পত্তি বন্ধক রাখা, ইত্যাদি কারবার মান্ধাতার আমলে জানা ছিল না। গোষ্ঠীর শাসনে অভ্যস্ত নরনারী এই ধরণের আর্থিক ব্যবস্থা বুঝিতেই পারিত না। কাজেই উত্তমর্ণ অধমর্ণের সম্বন্ধ আথেনিয় সমাজে এক নবযুগ আনয়ন করিল। এই নয়া সামাজিক সম্বন্ধের অনুরূপ নয়া আইন জারিও দরকার হইয়াছিল।

যে ব্যক্তি টাকা ধার লইতেছে, সে ঋণদাতার টাকা যথাসময়ে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য,—এইরূপ কানুনের সাহায্যে সমাজকে বাঁধিয়া রাখা হইতেছিল। এই আইনে কিষাণরাই মোটের উপর ধনপতি কুলীনদের তাঁবে আসিয়া পড়িতেছিল। আটিকা প্রদেশের প্রত্যেক পল্লীতেই জমির উপর বন্ধকির "দাসখত" স্বরূপ খুঁটা গাড়া থাকিত। তাহার দ্বারা বুঝা যাইত, কোন্ জমিনের জন্য কোন্ কিষাণ কোন্ মহাজনের নিকট ঋণী। অনেক জমির উপর এই ধরণের বন্ধকি খুঁটা দেখা যাইত না বটে; কিন্তু তাহার কারণ এই যে, সেগুলা দেউলিয়া কিষাণেরা মহাজনদের নিকট বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সে যুগের ঋণ-কানুন আথেনিয়দের পক্ষে যারপরনাই কষ্টকরই ছিল। বন্ধক ফিরাইয়া পাওয়া কিষাণদের কপালে এক প্রকার ঘটিয়াই উঠিত না; উৎপন্ন দ্রব্যের ছয় ভাগের একভাগ মাত্র দেউলিয়া কিষাণদের ভোগে আসিত। তাহাও মহাজনদের দয়া-সাপেক্ষ। অবশিষ্ট সবই মহাজনদের প্রাপ্য বিবেচিত হইত।

বন্ধকি জমি বেচিয়া ধার শোধ করা অসম্ভব হইলে কিষাণেরা নিজ পুত্রকন্যাগণকে বিদেশীদের নিকট বেচিতে বাধ্য হইত। মহাজনের দেনা কোনো মতেই রেহাই হইত না। পুরুষ-বিধি এবং একপতি-পত্নীত্বের ব্যবস্থায়ই সন্তান-বেচা মানব-সমাজে সুরু হইয়াছে। কিন্তু ছেলে-পুলে বেচিয়াও ধার শোধ করা অসম্ভব হইলে স্বয়ং কিষাণদিগকে বেচিয়া টাকা উসুল করা উত্তমর্ণদের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত বিবেচিত হইত। রাষ্ট্রের ঊষাকাল আথেনিয়-সমাজে এইরূপ সুমধুর দৃশ্যের সাক্ষী।

গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থায় এইরূপ লোমহর্ষণ কাণ্ড অসম্ভব হইত। "ইণ্ডিয়ান" সমাজে আথেনিয়দের এই স্তর প্রকটিত হয় নাই। সেই সমাজের আর্থিক প্রচেষ্টায় ধনী নির্দ্ধন, দেনাদার পাওনাদার, ইত্যাদি সম্বন্ধ বিকশিত হইতে পারে নাই। প্রকৃতির শক্তিগুলাকে খুব বেশী নিজের তাঁবে আনা ইরোকোআদের ক্ষমতায় কুলায় নাই। তাহারা নিজ কৃতিত্বের এবং অধ্যবসায়ের সীমা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইত। ছোট ছোট ক্ষেতের ফসল এবং হ্রদ নদীর মাছ ও বনের জানোয়ার ইত্যাদি দ্রব্যের পরিমাণ তাহাদের অজানা ছিল না। এই গুলার বাড়তি-কমতিতে তাহাদের সমাজে একটা ভয়ানক রকমের সমাজবিপ্লব ঘটিত না; কারণ তাহারা কখনই ধনোৎপাদনের নেশায় আত্মহারা হইয়া অতিবৃদ্ধির পূজা করিত না। আর্থিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত ছিল। এই সীমানা ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য তাহাদের ঝোঁক দেখা যাইত না।

"বার্ব্বার" যুগের সভ্যতার এই এক মস্ত সুলক্ষণ। "উৎকর্ষের" যুগের সভ্যতায় মানুষ আর সুখস্বচ্ছন্দতার সীমা বা ধনোৎপাদনের গণ্ডী স্বীকার করিয়া চলে না। এই খানেই যত অনর্থের গোড়া। বর্ত্তমান যুগে মানবশক্তি প্রকৃতিকে দাসীতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার ফলে সুখের উপায় অনেক বাড়িয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা স্বাধীনভাবে দলবদ্ধ হইতে সমর্থ হইয়াছে। এই ধনবৃদ্ধি ও দল-গঠনের যুগে বার্ব্বার যুগের "সংযম" বা সুখের সীমা স্বীকার করা অসম্ভব কি? সে যুগে শ্রমিকেরা নিজেই ধনোৎপাদনের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিত। আজ যদি শ্রমিকদের আবার সেই ক্ষমতা ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে উৎকর্ষের যুগ তাহার প্রধান দোষ হইতে অব্যাহতি পায়।

কিন্তু গ্রীক-সমাজে এই সীমা বা গণ্ডীর তোয়াক্কা রাখা হইত না। জানোয়ারের মালিকেরা এবং বিলাস-দ্রব্যের অধিকারীরা নিজ নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজারে লইয়া যাইয়া কেনাবেচা সুরু করিয়াছিল। এতদিন যে সকল জিনিষ বাস্তবিক পক্ষে মালিকের নিজ পরিশ্রমের ফলরূপে পরিচিত ছিল, সেইগুলা এখন "বাজারের মাল" বা "পণ্যদ্রব্য" মাত্রে পরিণত হইল। বলা বাহুল্য, এই ধরণের "মালের" সঙ্গে আসল শ্রমিক বা উৎপাদকের সংযোগ কোনো ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। মেহনতের ফলে আর মালে যে প্রভেদের কথা বলা হইতেছে, এই প্রভেদেই ইণ্ডিয়ান আর আথেনিয় অর্থাৎ গোষ্ঠী আর রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাতে প্রভেদ। এইখানে একটা বড় বিপ্লবের গোড়া চুঁড়িয়া পাইতেছি।

উৎপাদনকারীরা যখন নিজ মেহনতের ফল নিজে ভোগ না করিয়া এইগুলা অন্যান্য লোকের মেহনতের ফলের সঙ্গে অদল-বদল করিতে লাগিয়া গেল, তখন আর তাহারা নিজের কাজের উপর পুরাপুরি প্রভুত্ব রক্ষা করিতে পারিল না। নিজ পরিশ্রমের ফল কোথায় কিরূপে ব্যবহৃত হইবে, সে সম্বন্ধে তাহাদের আর কোনো জানা-শুনাই সম্ভবপর হইল না। বরং এই জিনিষগুলা তাহাদের হাতছাড়া হইবামাত্র এইগুলা ব্যবহার করিয়া সমাজের কোনো কোনো লোক তাহাদিগকে নানা অসুবিধায়ই ফেলিতে পারে, এইরূপ অবস্থা ঘটিতেছিল। সমাজে আর্থিক বিনিময়-প্রথার কুফল এই প্রথম দেখা দিল।

উৎপাদনকারীর বিরুদ্ধে তাহার নিজ মেহনতের উৎপন্নদ্রব্য অতি অল্পকালের ভিতরেই আথেনিয় সমাজে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকে। মেহনতের ফল যখন বাজারের মালে পরিণত হইল, তখনই দেখা দিল টাকা বা মুদ্রা। বাজারের বিনিময় সহজসাধ্য করিবার জন্যই মুদ্রার জন্ম। এ এক অতি সহজ, সরল আবিষ্কার সন্দেহ নাই। কিন্তু যে যন্ত্র প্রত্যেক কেনা-বেচার কাজে লাগে, সে যন্ত্রের নিকট সমাজের আপামর সকলেই মাথা নোয়াইতে বাধ্য, সে যন্ত্র মোটেই সহজ সরল নয়। ইহার দৌরাত্ম্যে এবং অত্যাচারে আথেনিয় নরনারী উত্তম-পুরুষ হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

সনাতন গোষ্ঠী-সমাজ টাকার আবিষ্কারে বাধা দিতে পারে নাই। অথচ কেনাবেচা, ধার দেওয়া, ধার লওয়া, বন্ধকি, ইত্যাদি সমাজিক সম্বন্ধের নয়া নয়া অনুষ্ঠান গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে হজম করা অসাধ্য। এই অবস্থায় এক মাত্র অতীতের দোহাই দিয়া কি আর "সেকাল"কে ফিরাইয়া আনা যাইতে পারে? মুদ্রা এবং ঋণতত্ত্ব দুনিয়া হইতে ভাবুকতার জোরে তুলিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইল

না। এই আবিষ্কারগুলা আথেন্সে খাঁটি বাস্তব শক্তির আকারেই জুড়িয়া বসিয়াছিল।

অতএব কঃ পন্থাঃ? গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান এইবার "খাটে উঠিলেন।" এতদিন ধরিয়া গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত সমাজের আজ আঙুল মটকাইতেছিল, কাল ঠ্যাং ভাঙিতেছিল, পরশু চোক কানা হইতেছিল। থিসিউসের আগে-পরে সর্ব্বদাই নানা দিক হইতে গোষ্ঠীর ভাঙন চলিতেছিল। সেই ভাঙনই এক্ষণে চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

গোষ্ঠী ভাঙিয়া যাইবার সঙ্গে-সঙ্গে লোকের অজ্ঞাতসারেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলা সমাজে শিকড় গাড়িতেছিল। শ্রম-বিভাগের নিয়মে নগর ও পল্লীর পার্থক্য সৃষ্ট হইয়াছিল। নগরের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীরাও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল। এই সকল বিভিন্ন দলের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য আটিকায় নানা কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছিল।

দেশের ভিতর নানা প্রকার সার্ব্বজনিক সরকারী পদ বা চাকুরির উৎপত্তি হইতেছিল। সামরিক বিভাগ এক স্বতন্ত্র পুষ্টির পথে অগ্রসর হইতেছিল। দেশরক্ষার জন্য আথেনিয় সমাজে সর্ব্বপ্রথমে নৌসেনা কায়েম হয়। প্রত্যেক "জাতি"কে বারটা "নৌক্রারিয়া"য় বিভক্ত করা হইয়াছিল। নৌক্রারিয়া নামক সামরিক জেলাগুলা প্রত্যেকে একটা করিয়া রণতরীর সম্পূর্ণ ভার লইতে বাধ্য থাকিত। অধিকন্তু, প্রত্যেকেই দুই জন করিয়া ঘোড়-সওয়ার জোগাইবার জন্য মোতায়েন ছিল।

নৌক্রারিয়া প্রথায়ও গোষ্ঠীর গোড়ায় কুড়াল চালানো হইতেছিল। এতদিন ছিল সমাজের সকল লোকই দেশ-রক্ষার এবং দণ্ড দিবার কাজে অধিকারী। এই নয়া ব্যবস্থায় সরকারের হাতে একটা বিশিষ্ট দল এবং বিশিষ্ট দণ্ড-ক্ষমতা আসিল। এই দল এবং এই ক্ষমতা যে-কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করা সম্ভব। অধিকন্তু, পূর্ব্বে চলিত জ্ঞাতি-কুটুম্ব অনুসারে জনগণের সরকারী ভাগা-ভাগি। এই ব্যবস্থায় রক্তের টান আর বজায় থাকিল না। তাহার ঠাঁইয়ে আসিল স্থানহিসাবে বা বাস্তুভিটার তরফে কেন্দ্র-গঠন।

গোষ্ঠীর আমলে ধনীনির্দ্ধন ভেদ ছিল না। এক শ্রেণী আর্থিক হিসাবে নির্য্যাতিত হইতেছে, অথবা পরের লাভের জন্য নিজে মেহনৎ করিয়া মরিতেছে, এবং আর এক শ্রেণীর লোক পরের রক্ত শুষিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, এই ধরণের দৃশ্য গোষ্ঠী সমাজে অসম্ভব ছিল। কিন্তু থিসিউসের যুগে এবং পরে নির্য্যাতিত প্রপীড়িত দুঃখী বলিয়া এক প্রকার শ্রেণী দিন দিন বাড়িতে থাকে। তাহাদের রক্ষা করিবার ক্ষমতা গোষ্ঠীর নাই। এই রক্ষাকার্য্যে আগুয়ান হইল রাষ্ট্র। সোলোনের শাসন-পদ্ধতি নবযুগের নবীন সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে। সোলোন আথেনিয়-সমাজের আর এক যুগাবতার। সে প্রায় ৫৯৪-৬০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের কথা।

(৪)

টাকার চলন এবং ঋণের আইন এই দুই কারণে তখনকার লোকেরা কষ্ট পাইতেছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভাব সমাজে যারপরনাই উৎপীড়নের কারণ হইয়াছিল। এই কারণে সোলোন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষমতা কমাইতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। ধনী মহাজনদের সম্পত্তি বাড়াইবার পথ আটক করিয়া দরিদ্র জনগণের সম্পত্তি কোনোমতে বাঁচাইয়া রাখা সোলোন-নীতির আসল কথা। সোলোন আইনজারি করিয়া উত্তমর্ণদের ঋণগুলা তামাদি ঘোষণা করিয়া দিলেন। ঋণগ্রস্থেরা রেহাই পাইল।

সোলোন সমাজসংস্কারক মাত্র নন। তিনি কবিতা রচনায়ও হাত দেখাইয়াছেন। সোলোন-সংহিতার যে সকল কথা স্পষ্টরূপে জানা যায় না, তাহার কিছু কিছু আন্দাজ করা যায় সোলোনের গাথাসমূহ হইতে। তাঁহার আইনের ফলে জমির উপরকার বন্ধকির দাসখত-স্বরূপ স্তম্ভগুলা উঠিয়া গিয়াছিল। যে সকল কিষাণ জমিজমা ও বাস্তুভিটা ছাড়িয়া বিদেশে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল, অথবা ঋণের জন্য গোলামরূপে বিক্রী হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে সোলোনের আইন স্বভূমিতে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছিল।

যে কোনো রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে এইরূপ বিপ্লবসাধন এক মহাকীর্ত্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখিতেছি যে সোলোন খোলাখুলি স্বত্ব বা নিজস্ব ধনদৌলতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। গরীবদিগকে বাঁচাইতে যাইয়া তিনি ধনবানদের প্রতি বেআইনি বা অবিচার করিয়াছেন।

মজার কথা,—রামার ধন শ্যামাকে অথবা পদার ধন

হরাকে দেওয়াই সোলোনের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ভিতরকার কথা। কোনো যুগ-প্রবর্ত্তক বা সমাজ-সংস্কারকই একজনকে না মারিয়া আর একজনকে বাঁচাইতে পারেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী-বিপ্লবেও এই কাণ্ডই আবার দেখা গিয়াছে। জমিদারদের মধ্যযুগ-মাফিক ধনদৌলতকে দাবিয়া রাখিয়া বিপ্লবীরা নবরূপের "বুর্জোঅ" মহাজনী সম্পত্তিকে মাথা তুলিতে সুযোগ দিয়াছে। এক হাতে লুটিয়া লওয়া, ডাকাইতি বা বাজেয়াপ্ত করা, অপর হাতে ধনদান, জলদান, বিদ্যাদান ইত্যাদি ধরণের খৈরাতি বা পরোপকার যুগে-যুগে নানা আকারে দেখা যাইতেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিধানে মানুষ জনগণকে সুখী করিবার আর কোনো কৌশল আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া নরনারী এই এক পথেই চলিতেছে।

কর্জ্জগুলা তামাদি হইবার ফলে কিষাণেরা গোলামী হইতে অব্যাহতি পাইল। সোলোন-নীতি একমাত্র এই-খানেই থামে নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে আবার কোনো লোক এইরূপ গোলামে পরিণত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করাও সোলোনের এক কীর্ত্তি। প্রথম কথা হইল এই যে, কোনো ব্যক্তি টাকা ধার লইবার সময় নিজেকে বন্ধক রাখিতে পারিবে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, কোনো ব্যক্তিই একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমির বেশী নিজ দখলে আনিতে পারিবে না। এই উপায়ে এক দিকে রক্ষা পাইল আথেনিয়া কিষাণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, অপর দিকে বাঁচা পাইল ঋণপতিদের ভূমি-লিপ্সা।

শাসনকার্য্য সম্বন্ধে সোলোনের সংস্কারগুলাও উল্লেখ-যোগ্য। পরিষদের সভ্য-সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যেক জাতি হইতে এক-শ করিয়া সভ্য আসিবে, এইরূপ নিয়ম হইল। আথেন্সের পরিষদে এই উপায়ে চার-শ ব্যক্তির ঠাঁই হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে, সোলোন সাবেক কালের জাতি-কেন্দ্রটা বজায় রাখিয়াই চলিয়াছিলেন।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সোলোন-নীতিতে পুরাণা "স্মৃতিশাস্ত্রের" কোনো দফাই স্বীকৃত হয় নাই। দেশের নরনারীকে সোলোন চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। জমির পরিমাণ এবং আমদানি অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ সাধিত হইয়াছিল। পঁচিশ "মেদিম্নয়" ফসলের মালিকেরা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। তিনশ মেদিম্নয়ের মালিকদিগকে দ্বিতীয় এবং দেড়শওয়ালাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীর আথেনিয় বিবেচনা করা হইয়াছিল। এক এক মেদিম্নয় ১১৬ বুশেলের সমান। চতুর্থ শ্রেণীর লোক ছিল তাহারা, যাহাদের জমির আয় ১৫০ মেদিম্নয় অপেক্ষা কম, অথবা যাহারা একদম ভূমিহীন।

প্রথম তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া কেহই সোলোনের বিধানে সরকারী চাকুরী পাইত না। সর্ব্বোচ্চ পদে এক-মাত্র প্রথম শ্রেণীর লোকই অধিকারী। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা সার্ব্বজনিক সভায় বসিয়া বাদানুবাদ করিতে পারিত; ভোট দিবার অধিকারও ছিল। কিন্তু এই সভায়ই কর্ম্মচারী বাহাল হইত, আইন জারি হইত, খরচ-পত্রের হিসাব-নিকাশ হইত। এইখানে চতুর্থ শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে গুণতিতে বেশী হওয়ায় দেশের ভাগ্যগঠনে তাহাদের হাত অনেকটা দেখা যাইত।

সোলোন-নীতি মোটের উপর গণতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল বলিতে হইবে। পয়সাওয়ালাদের প্রতিপত্তি, আভিজাত্যের ইজ্জত, এসবও যথারীতি রক্ষা পাইয়াছিল সন্দেহ নাই।

সামরিক কাণ্ডেও এই চারি শ্রেণীকেই কেন্দ্র বিবেচনা করা হইত। ঘোড়-সওয়ার আসিত প্রথম দুই শ্রেণী হইতে। তৃতীয় শ্রেণী জোগাইত "ভারী" পদাতিকের দল। "হাল্কা" পদাতিক হইত চতুর্থ শ্রেণীর লোক। ইহারাই আবার রণতরীর খালাসীরূপে দেশ রক্ষা করিত। বোধ হয় নাবিকের কাজ করার জন্য ইহারা বেতন পাইত।

ব্যক্তিগত ধনদৌলত বা নিজস্ব সোলোন-নীতির এক নতুন কথা। ভূমির পরিমাণ ও আয় দেখিয়া জনগণের অধিকার ও কর্ত্তব্য নিয়ন্ত্রিত হইত। বলা বাহুল্য, যেখানেই সম্পত্তির প্রভাব সেইখানেই রক্তের টান কম। গোষ্ঠী-প্রথায় আর এক ঘা লাগিল।

কিন্তু রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হইলে মানুষকে সর্ব্বত্রই যে সম্পত্তি অনুসারে নরনারীকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। ধনদৌলতের কম-বেশী বিবেচনা না করিয়াও মানবসমাজ রাষ্ট্র কায়েম করিতে

পারে। আথেন্সেই সম্পত্তির প্রভাব সর্ব্বদা অটুট ছিল না। আরিষ্টাইদেসের সময় হইতে সরকারী পদগুলা যে কোনো লোকের অধিকারে আসিয়াছিল।

(৫)

সোলোনের পরবর্ত্তী যুগে জমি লইয়া কেনা-বেচা একদম উঠিয়া গিয়াছিল। জমির পরিমাণ বাড়াইবার দিকে ধনবানদের খেয়াল আর বড় একটা দেখা যাইত না। বাণিজ্য এবং শিল্পকর্ম্ম ইত্যাদির দ্বারা আথেন্সে ধন বৃদ্ধি হইতে থাকিল। স্বদেশী গোলামদের উপর জুলুম অনেকটা কমিয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তে দেখা দিয়াছিল বিদেশী গোলাম ও ক্রেতাবিক্রেতাদের উপর আথেনিয়দের অত্যাচার।

স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। টাকাকড়ি, গোলাম, নৌকা ইত্যাদিই ধন-দৌলতের মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে থাকিল। সোলোনের আগেকার লোকেরা এই সকল ধন জমি কিনিবার জন্য খাটাইত। এক্ষণে ধনবানেরা আর সেরূপ না করিয়া জমিওয়ালাদের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের টক্কর স্থুরু করিয়াছিল। শিল্পবাণিজ্যের ধনী-সমাজ আর সাবেককালের ভূমি-সম্পত্তির ধনী-সমাজ, এই দুইয়ে বিরোধ উপস্থিত হইল। ফলতঃ ভূমিপ্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী-প্রথাও আর এক ধাক্কা খাইতে লাগিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীর বহির্ভূত অনেক লোক এখন আথেন্সের বাসিন্দা। নাগরিক-হিসাবে ইহারা বসবাস করিত। কিন্তু আসল সমাজে ইহাদিগের কোনো ঠাঁই ছিল না। অধিকন্তু, খাঁটি বিদেশীদের সংখ্যাও দিন-দিন বাড়িয়া চলিতেছিল। ইহাদিগকে রক্ষা করিবার কোনো কানুন ছিল না। একমাত্র মানবীয় সদ্ভাবের জোরেই ইহাদের সঙ্গে স্বদেশীদের লেনদেন চলিতেছিল।

জমিওয়ালা কুলীনদের সঙ্গে "নয়া ধনী"দের বিরোধ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত নবীন ধনদৌলতেরই বিজয়লাভ ঘটে। ক্লাইসথেনিসের শাসন-পদ্ধতি (৫০৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ) এই ধনবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের সাক্ষী।

ক্লাইসথেনিসের সংহিতায় সাবেক কালের চার "জাতি" স্বীকার করা হইল। গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী ইত্যাদি কেন্দ্র এইবার একদম লুপ্ত হইল। রক্তের টানে কোন ব্যক্তিকে কোনো দল, সমাজ বা কেন্দ্রের সামিল বিবেচনা করা হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা করা ক্লাইসথেনিসের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। আথেন্সে একটা খাঁটি যুগান্তর সাধিত হইল।

সোলোনের পূর্ব্বে "নৌক্রারিয়াই" নামক বাস্তুভিটা প্রতিষ্ঠিত জনকেন্দ্র আথেনিয় সমাজে দেখা দিয়াছিল। সেই কেন্দ্রই হইল ক্লাইসথেনিস-নীতির সামাজিক খুঁটা। রক্তের পরিবর্ত্তে মাথা তুলিল দেশ।

গোটা আটিকাকে এক-শ জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। এই গুলার নাম "দেময়"। প্রত্যেক দেময় স্বরাট্। দেময়ের লোকেরা নিজ নিজ জেলার জন্য দেমার্খোস বা গণ-মুখ্য, খাজাঞ্চি এবং ত্রিশজন বিচারক বাছাই করিত। প্রত্যেক দেময়েরই মন্দির এবং "দৈবরক্ষক" ছিল। দেময়ের রক্ষাকর্ত্তা দেবতাকে গ্রীক ভাষায় বলে "হেরোস্"। মন্দিরের পুরোহিত জনগণ হইতে নির্ব্বাচিত করা হইত। গোটা দেময়ই অধিবাসী-দের পরিষৎ কর্ত্তৃক সকল বিষয়ে শাসিত হইত।

মর্গ্যান বলেন, প্রাচীন আথেন্সের দেময় বর্ত্তমান মার্কিণ রাষ্ট্রের নগর-প্রতিষ্ঠানেরই আদিম মূর্ত্তি। রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার সময় আথেনিয় নরনারী যে জীবনকেন্দ্রের জন্ম দিয়াছিল, জগতের নবীনতম শাসন-প্রণালীতে সেই কেন্দ্রই চলিতেছে।

ক্লাইসথেনিসের দশ দেময় একত্রে "ট্রাইব" নামে পরিচিত হইত। এই কেন্দ্র সাবেক কালের রক্ত-প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব বা জাতি হইতে স্বতন্ত্র। এই ট্রাইব রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক দুই হিসাবেই স্বরাট। ট্রাইবের মুখ্যকে বলা হইত ফিলার্খোস। এই পদের অধিকারী নির্ব্বাচিত হইত। ঘোড়সওয়ারের দল ফিলার্খোসের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হইত। পদাতিক দলের নায়ক তাক্সিয়ার্খোসও নির্ব্বাচিত হইত। অধিকন্তু সমগ্র ট্রাইব-কেন্দ্রের পল্টনের সম্বন্ধে যে রণ-নায়কের হাতে সকল দায়িত্ব, তাহাকেও ট্রাইবের লোকেরা বাছাই করিতে অধিকারী ছিল। পল্টনে যোগ দিতে বাধ্য ছিল প্রত্যেক লোক। পাঁচটা করিয়া রণতরীর সকল দায়িত্ব প্রত্যেক ট্রাইবের হাতে থাকিত। ট্রাইবের নামকরণ হইত "দৈব রক্ষকের" নাম অনুসারে। প্রত্যেক ট্রাইব আথেন্সের পরিষদে পঞ্চাশ জন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত।

: ৫১১/৩৮, ২৩/২/১৩৭২

আটিকা ছিল দশ ট্রাইবের দেশ। কাজেই আথেন্সের কেন্দ্র-পরিষদে পাঁচ-শ সভ্য সমগ্র দেশের শাসন চালাইত। পরিষৎ ছাড়া সার্ব্বজনিক সভা বা আগোরাও আর একটা প্রতিষ্ঠান। এই সভায় আপামর সকলেই ভোট দিতে অধিকারী। পাঁচ-শ পরিষদের সকল কাজই এইরূপে "রাস্তার লোকের" সমালোচনার অধীন হইয়া পড়িত। আর্কন ইত্যাদি কর্ম্মচারীরা শাসনের নানা বিভাগে মোতায়েন থাকিত।

ক্লাইসথেনিস আথেন্সে যে যুগ প্রবর্ত্তন করিলেন, সে যুগে পুরানো গোলামেরা পুনরায় স্বাধীন নাগরিকরূপে চলাফেরা করার অধিকার পাইল। বিদেশীদিগকেও আইনতঃ স্বদেশীদের সামিল বিবেচনা করা হইত। মান্ধাতার আমলের গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলা এই যুগে শাসনক্ষমতাহীন, অ-রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র মাত্রে পরিণত হইল। ধর্ম্ম ও সামাজিক লেনদেন ছাড়া অন্য কোনো উপলক্ষে এই গুলার আর ডাক পড়িত না। অবশ্য অনেক দিনকার প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনগণের উপর এইগুলার "নৈতিক" প্রভাব বড় শীঘ্র কমিতে পারে নাই। বহুকাল ধরিয়াই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আমলেও সনাতন গোষ্ঠিপ্রথার "স্বধর্ম্ম" নরনারীর জীবন-আদর্শ পরিচালিত করিতে থাকিল।

(৬)

দণ্ড দিবার ক্ষমতা থাকা রাষ্ট্রের আসল লক্ষণ। অধিকন্তু এই ক্ষমতার সরকারী অধিকারী জনগণ হইতে স্বতন্ত্র। ক্লাইসথেনিসের আমলে আথেন্স-রাষ্ট্রের সেনা এবং রণতরী দুই-ই জনগণ কর্ত্তৃক গঠিত হইত। এই দুইয়ের সাহায্যেই দেশকে বিদেশী শত্রু হইতে রক্ষা করা হইত। অধিকন্তু, দেশের ভিতরকার গোলাম শ্রেণীর গণ্ডগোল হইতেও দেশকে বাঁচাইবার ভার এই দুই প্রতিষ্ঠানের অধীনে ছিল। তখনকার দিনে আথেনিয় সমাজে গোলামরাই অধিক সংখ্যক লোক।

কিন্তু নাগরিক অর্থাৎ স্বাধীন আথেনিয় যাহারা, তাহাদিগকে রাষ্ট্র স্ববশে আনিত কি করিয়া? সরকারী দণ্ডের ক্ষমতা ছিল পুলিশের হাতে। পুলিশ-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের সঙ্গে-সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীরা সভ্য বা উৎকর্ষশীল সমাজ বুঝাইবার জন্য "পুলিশ-শাসিত সমাজ" বলিতে অভ্যস্ত ছিল।

আথেনিয় রাষ্ট্রের পুলিশ ছিল তীরন্দাজ। পদাতিক এবং ঘোড়সওয়ার এই দুই দলে পুলিশ বিভক্ত থাকিত। গোলাম জাতীয় লোক ছাড়া আর কেহ পুলিশের চাকরী গ্রহণ করিত না। স্বাধীন আথেনিয়দের চিন্তায় পুলিশ বিভাগে কাজ করা অতি গর্হিত বিবেচিত হইত। একজন সশস্ত্র গোলাম তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করুক, তাও সই, তথাপি তাহারা এইরূপ জঘন্য কাজে নকরি লইত না।

পুলিশ সম্বন্ধে বিদ্বেষ আথেনিয় সমাজে আসিল কোথা হইতে? ইহা তাহাদের সাবেক কালের সনাতন গোষ্ঠি-ধর্ম্মের ফল। পুলিশ ছাড়া রাষ্ট্র চলে না। কিন্তু রাষ্ট্র আথেন্সে একটা নূতন কিছু। এই নবীন প্রতিষ্ঠানের ইজ্জত সমাজে বদ্ধমূল হওয়া মুখের কথা নয়। নয়ায়-পুরানায় দ্বন্দ্বই আথেন্সের সেকালে পুলিশ-বিদ্বেষের গোড়ার কথা। যত দিন পুলিশের কাজকে জঘন্য বিবেচনা করা হইতেছিল, তত দিন আথেনিয় সমাজে গোষ্ঠি-প্রতিষ্ঠানের "নৈতিক" প্রভাব অটুট ছিল বুঝিতে হইবে। বড় সহজে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান মানব-সমাজে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই।

যাহা হউক ক্লাইসথেনিসের আমলে রাষ্ট্র এক প্রকার সকল অঙ্গেই দেখা দিয়াছিল। আথেনিয়দের সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থাও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলার অনুরূপই বিকাশ লাভ করিতেছিল। শিল্প, বাণিজ্যের দ্বারা ধন-সম্পদ বাড়িয়া চলিতেছিল। মান্ধাতার আমলের "কুলীন" আর "ইতর" এই ধরণের শ্রেণীভেদ যেন আর বড় একটা দেখা যাইত না। শ্রেণীভেদ এক নব রূপে মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছিল। প্রথম তফাৎ করা হইত "গোলামে" আর "স্বাধীনে"। দ্বিতীয় শ্রেণীভেদ ঘটিত "স্বদেশী"তে আর "বিদেশী"তে।

আথেন্সের চরম গৌরবযুগে "স্বাধীন" আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সংখ্যা ছিল মাত্র ৯০,০০০। ইহারা ৩৬৫,০০০ "গোলাম" নরনারীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। তখন "বিদেশী" এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্ত গোলামরা ছিল গুণ্‌তিতে ৪৫,০০০। অর্থাৎ সাবালক স্বাধীন আথেনিয় যেখানে একজন, সেখানে গোলাম ছিল আঠার এবং বিদেশী ছিল দুই।

এত সব গোলাম জুটিবার কারণ ছিল। বড় বড় কারখানায় ইহাদিগকে মজুররূপে বাহাল করা হইত। ইহাদের মাথায় থাকিত স্বাধীন লোক, কাজ তদ্‌বির করিবার জন্য। সামাজিক ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুই চার জন ধনী লোকের ইহাতে সম্পত্তি পুঞ্জীকৃত হইতেছিল। কাজেই নির্ধন স্বাধীন আথেনিয়রা গোলামদের সঙ্গে মজুরির বাজারে টক্কর দিতে বাধ্য হইত। যাহারা গোলামদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া অপেক্ষা মরণই শ্রেয় বিবেচনা করিত, তাহারা ক্রমশঃ সমাজ হইতে উপিয়াই যাইতেছিল।

এইখানে একটা গভীর এবং গুরুতর কথা মনে রা আবশ্যক। স্বাধীন আথেনিয়দের ভিতর নির্ধন লোকে ধনবানদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। কিন্তু যখন এই নি রা ক্রমে ক্রমে নির্ব্বংশ হইতে থাকিল, তখন আথেনিয় সমাজের কোমর ভাঙ্গিয়া যাইতে আরম্ভ করে। আথেন্স এই কারণেই জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে।

ইয়োরোপের পণ্ডিত মহাশয়েরা রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। ইহাঁরা রাজরাজড়া আমীর ওমরাওদের প্রশস্তি তৈয়ারি করিতে অভ্যস্ত। ইস্কুল-কলেজের মাষ্টার মহাশয়েরাও কেতাবি গৎ আওড়াইয়া নবাব বাদশাদের গুণগান করিয়া থাকেন। ইহারা কাজেই প্রচার করিয়াছেন যে, গণতন্ত্রের স্বরাজই আথেনিয় রাষ্ট্রের ধ্বংসের কারণ।

এই ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক। প্রজাতন্ত্র শাসনের ফলে আথেন্সের কোনো অনিষ্ট হয় নাই; অনিষ্ট হইয়াছে গোলামী প্রথার ফলে। এই গোলামী প্রথাই "স্বাধীন" জনগণকে ইজ্জতের সহিত খাটিয়া খাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। স্বাধীনভাবে খাটিয়া মজুরি করিতে সমর্থ হইলে আথেন্সের দরিদ্র সমাজ বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু এই সামাজিক স্বাধীনতা "স্বাধীন" আথেনিয়দের কপালে জুটে নাই।

আথেনিয় সমাজে রাষ্ট্রের জন্মকথা আলোচনা করিলে একটা পুরাপুরি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ধাচ হাতে-হাতে ধরিতে পারি। বাহিরের কোনো আক্রমণ অথবা ভিতরকার কোনো বিদ্রোহ আথেনিয়দিগকে সহিতে হয় নাই। এই কারণেই রাষ্ট্রীয় কাঠামটা অনেকটা ষোলআনায় পূর্ণ হইতে পারিয়াছিল। মাঝে একবার পিসিষ্ট্রাটুসের দৌরাত্ম্য বা একচ্ছত্র শাসনভোগ আথেন্সে দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা বেশী দিন টিকে নাই। কাজেই রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহার প্রভাবও স্থায়ী হয় নাই।

গোষ্ঠি ভাঙিয়া মানব-সমাজ একটা সর্ব্বাঙ্গপরিপূর্ণ রাষ্ট্র কিরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার বিবরণ আথেনিয় ইতিহাসে পুরাপুরি পাই। অধিকন্তু এই রাষ্ট্র আবার জনগণের স্বরাজমূলক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান। তাহা ছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় অঙ্গের জন্মই এই প্রত্নতত্ত্বে পরিষাররূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

দয়াল

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী, বিদ্যারত্ন

না চাহিতে কত দিয়েছ দয়াল, দয়ার নাহিক ওর;
লভি তব কৃপা আমি যে কাঙ্গাল, জীবন হয়েছে ভোর।
শাখী শাখে শাখে, সাজায়ে রেখেছ কত যে সুস্বাদু ফল;
তরঙ্গিনী-বুকে দিয়েছ ঢালিয়ে, অঢেল সুপেয় জল।
পিতা-মাতা-প্রাণে দিয়েছ বাৎসল্য, পত্নীতে পবিত্র প্রেম;
সন্তান-অন্তর শ্রদ্ধা-ভক্তি দিয়ে গড়িয়ে তুলেছ হেম।
শত সুহৃদের প্রণয় বন্ধনে, রাখিয়াছ সদা ঘিরে
তোমারই পবন, বহি অনুক্ষণ, জীবন সঞ্চারে ধীরে।
এত যে দিয়েছ, দাও নাই প্রভু তব পানে সুধু চাহিতে;
কি জানি কি মোহে, রয়েছি তাড়িত, পারি না তোমারে ডাকিতে।
দয়াল নামেতে, রেখো না কলঙ্ক, (আজ) যাহা চাই তাই দাও গো;
(তোমায়) দেখিতে শুনিতে ডাকিতে বুঝিতে, (দিয়ে) কোলেতে তুলিয়ে লও গো।

রাজগী।

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম্‌-এ, ডি-এল

(১)

নবাবগঞ্জের রাজবাড়ী পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে একটা ডাক-সাইটে প্রাচীন ঘর। এই বংশের একজন কোনও কালে রাজার সনদ পাইয়াছিলেন, সেই হইতে এ বাড়ী রাজ-বাড়ী এবং আমরা সবাই রাজা।

যখন আমার আট বৎসর বয়স, তখন আমি এক দরিদ্রের কুটীর হইতে এই রাজবাড়ীর রাজাবাবু হইয়া আসিলাম। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাবাবুর কোনও পুত্র সন্তান ছিল না, তাই রাণী-মা চারিদিকে একটী শিশু কার্ত্তিকের খোঁজ করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। আমার বেশ মনে আছে যে আমি তখন মাঠ হইতে ছোট এক বোঝা কাঠ কুড়াইয়া আনিতেছিলাম, মায়ের রান্নার জন্য। এই অবস্থায় আমি রাণীর চরের চক্ষে পড়িয়া গেলাম। তার পর কি হইল ভাল মনে নাই। তবে মনে আছে যে আমার মা খুব খানিকটা কাঁদিলেন। তার পর তারা আমাকে গাড়ী করিয়া লইয়া গেল দরজীর দোকানে। সেখান হইতে ভাল কাপড় জামা পরাইয়া আমাকে হাজির করিয়া দিল রাণীমার কাছে।

আমার মা সঙ্গে আসিয়াছিলেন; একটা কি বাগবজ্ঞ হইল, তার পর মা চলিয়া গেলেন। আমি শুনিলাম আমি রাজাবাবু, আর রাণীমা আমার মা। ভাল মনে নাই তখন আমার কি ভাব হইল, কিন্তু কিছু দিন পরে এই কথাটাই আমার একান্ত অভ্যস্ত হইয়া গেল।

সে সময়ে আমার জীবনের প্রণালী সম্বন্ধে আমার খুব স্পষ্ট ধারণা আছে। কেন না তখন সবটা এত সম্পূর্ণ নূতন ছিল যে তাহাতে আমার মনের উপর একটা স্থায়ী ছাপ মারিয়া দিয়াছিল।

আমি একটি ছোকরা খানসামার হাওলা হইয়াছিলাম। সে আমাকে কাপড় চোপড় পরাইত, বেড়াইতে লইয়া যাইত এবং সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, সমস্ত বিষয়ে আমার সেবা করিত। বাড়ীর ভিতর কিন্তু দাইমা ছিল আমার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। রাত্রে আমি দাইমার কাছে শুইতাম; আমার নাওয়া খাওয়া দেখা শোনা দাইমাই করিত। রাণীমা মাঝে মাঝে আমাকে সখ করিয়া কাছে লইতেন, চুমাটা আসটা দিতেন, কখনও বা সাজ-গোজ করিয়া দিতেন। তাঁর কাছে আমার আদরের অবধি ছিল না।

একটা জিনিস আমি খুব শীঘ্রই লক্ষ্য করিলাম। আমার আদর যত্ন লইয়া দাইমার সঙ্গে রাণীমার একটা আড়াআড়ির ভাব ছিল, পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু হিংসা ছিল। দাইমা একটা বেশী কিছু করিলে রাণীমা সহ্য করিতে পারিতেন না, আর রাণীমা বেশীর ভাগ আমাকে টানিলে দাইমার অসহ্য হইয়া উঠিত। ইহা লইয়া দুজনে মাঝে মাঝে বেশ ঝগড়াঝাটি হইত।

অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, দাইমা দাসী হইয়া রাণীমার সঙ্গে এমন করিয়া টক্কর দেয় কি করিয়া? দাইমা যে দাসী, তাহাতে তো আর কোনও সন্দেহ নাই। দাসী হইয়াই কৈশোরে এ বাড়ীতে ঢুকিয়া-ছিল; তার পর অবশ্য বাড়ীর ভিতর তার প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজবাড়ীতে তার ঘর প্রায় রাণীমারই তুল্য। তা ছাড়া তার অর্থ-সম্পত্তিও নেহাৎ তুচ্ছ নয়। চাকর-বাকরদের উপর তার অসামান্য প্রভুত্ব। কিন্তু তবু তো মূলে সে দাসী। এ বাড়ীর উপর তার কোনও আইনসঙ্গত অধিকারই নাই। রাণীমা যদি এক দিন হঠাৎ হুকুম দিয়া বসেন, তবেই তো তাহার বাহির হইয়া যাইতে হইবে। তবু তার এত তেজ কিসে?

পরে জানিয়াছিলাম। যে কুলের নামে আমি পরিচিত, যাহার অন্নে আমার উদর পুষ্ট, পিতামাতা বলিয়া ইহ-পরলোকে আমি যাহাকে মানিতে বাধ্য, তাহার কলঙ্কের কথা বিশদ করিয়া বলিব না। শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রাণীমা রাণী হইয়াও এক দিন দাইমার প্রসাদ-

প্রার্থিনী ছিলেন, আজও সে অভ্যাস তাঁর একেবারে যায় নাই।

যে ছোকরা খানসামা আমার জিম্মাদার ছিল, তার নাম বিপিন। বিপিনের বয়স তখন তের কি চৌদ্দ বছর হইবে। সে আমাকে খেলা দিত, তার সঙ্গে আমি বেশ সমবয়সীর মতই খেলিতাম। কিন্তু বাড়ীর চতুঃসীমার বাহির হইতে গেলেই বিপিনের উপর পাহারা বসিত। দেউড়ী হইতে পা বাড়াইলেই জোব্বাজাব্বা-পরা এক দ্বারোয়ান আমার সঙ্গ লইত এবং সে বিপিনের উপর কড়া শাসন চালাইত। আমার কোনও দোষ হইলে সে বিপিনের কাণ মলিয়া দিতেও কসুর করিত না। যে দ্বারোয়ান প্রায় আমার সঙ্গে যাইত, তার নাম ছিল কিঙ্কর সিং।

বিপিনের সঙ্গে আমার খুব রীতিমত সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। আমাকে সে রাজাবাবু বলিয়া বিষম খাতির করিয়া চলিত, আর যদি সে সৌহার্দ্দ্যের আতিশয্যে আমার সম্মানের হানিকরভাবে কোনও ব্যবহার করিত, তবে কিঙ্কর সিং চটাং করিয়া তাহাকে এক চড় মারিয়া বসিত। এক দিন আমরা দুজনে কিঙ্কর সিংকে এড়াইয়া একটু নিভৃত স্থানে ছুটিয়া আসিয়া পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। সেই দিন কিঙ্কর পিছন হইতে আসিয়া বিপিনকে কাণ ধরিয়া টানিতে টানিতে স্বয়ং রাণীমার সম্মুখে লইয়া হাজির হইল।

রাণীমা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "আ পোড়াকপাল! আভাগের বেটার আক্কেল দেখ। তুই কোথাকার নীচস্য নীচ, নাপিতের ছেলে, তুই না কি নবাবগঞ্জের রাজপুত্তুরের কাঁধে হাত দিস্!"

অমনি দাইমা অপর দিক হইতে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "হ'বে না, দিন দিন ছোটলোকের স্পর্দ্ধা এমনি তো হ'বে। কে আর শাসন ক'রছে বল। থাকতেন কর্ত্তা তো আজকে দেখা যেত!"

ছোটলোকের স্পর্দ্ধা যে কি পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল, তার একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত দাই-মা স্বয়ং! তাই তিনিই খুব বড় গলায় এ বিষয়ে চেঁচামেচি করিবেন বই কি!

দাইমা যদিচ ইদানীন্তন কালে শাস্তির অভাব স্মরণ করিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, তবু বিপিনের শাস্তির পরিমাণ দেখিয়া আমার সে রাত্রি কাঁদিয়া কাটিল। মালখানায় কাণ ধরিয়া লইয়া তাহাকে দশ জুতা মারিবার হুকুম হইল এবং আমার চাকরী হইতে তাহাকে বরখাস্ত করা হইল।

আমি ইহাতে এতটা কান্নাকাটি সুরু করিলাম যে, দুই দিনের মধ্যে বিপিন পূর্ব্বপদে বহাল হইল; কিন্তু জুতার ছাপ তাহার অঙ্গ হইতে অনেক কাল যায় নাই।

(২)

বিপিন ও আমি ক্রমে বড় হইয়া উঠিতে লাগিলাম। বিপিন ক্রমেই আমাকে বেশী সমীহ করিতে লাগিল; আমারও প্রভুত্বটা ক্রমেই বেশী রপ্ত হইয়া আসিল। আমি তাহাকে অসম্ভব অসম্ভব হুকুম করিতাম, তাহা তামিল করিতে বেচারা প্রায়ই গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিত। আর সে কাজে সামান্য ত্রুটি হইলে তাকে মারিয়া মারিয়া আমি হাড় গুঁড়াইয়া দিতাম। তবু এই প্রভেদ ও এই প্রভুভৃত্য সম্পর্কের মধ্যে আমাদের পরস্পরের প্রতি এতটা সদ্ভাব ছিল যে, অন্য কেহ বিপিনকে কিছু বলিলে আমি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিতাম, আর আমাকে মা বা দাইমা তিরস্কার করিলে বিপিন কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইত।

আমার যখন বারো বৎসর বয়স, তখন বিপিনের বয়স আঠার। তখন আমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ; আমি চির দিনই একটু ডাঙপিটা গোছের ছিলাম। রাজবাড়ীতে আসিয়া অবধি আদরে আদরে আমি একেবারে মাথায় চড়িয়া বসিয়াছিলাম। আমাকে কটু কথা বলিবার বা তিরস্কার করিবার কেহ ছিল না। রাণীমা এক দিন একটু তিরস্কার করিয়াছিলেন বলিয়া আমি এক দিন অনাহারে ছিলাম, দাইমা সাধিতে আসিলে তার চুল ছিঁড়িয়াছিলাম। বিপিনের মাথায় লাঠি মারিয়া রক্ত ছুটাইয়াছিলাম এবং আমার হাতের গোড়ায় কাঁচ বা চিনামাটির যত জিনিষ পাইয়াছিলাম সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ভাঙ্গিয়াছিলাম। সেই সময় কেউ আমাকে কষিয়া দু 'ঘা' চাবুক লাগাইয়া দিলে হয় তো আমি জন্মের মত শোধরাইয়া যাইতাম, কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার হইল না। দাই-মা অস্থির হইয়া গেলেন যে আমি পাছে রাগের চোটে মাথায় রক্ত উঠিয়া মারা যাই। রাণীমার ভয় হইল পাছে

আমি আত্মহত্যা করিয়া বসি। তাঁহারা বহু সাধ্য সাধনা করিয়া আমার তুষ্টি সাধন করিলেন।

এই অভিজ্ঞতায় আমি আর একটা শিক্ষা লাভ করিলাম। আমি বুঝিলাম যে, আমি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিব, এরূপ ভয় দেখাইলে, আমি ইহাদিগকে খুব জব্দ রাখিতে পারিব। এ শিক্ষা আমি ইহার পর কাজে লাগাইয়াছি। কোনও কিছু লইয়া মায়ের সঙ্গে মতান্তর হইলেই আমি এমন একটা কিছু বলিতাম বা করিতাম, যাহাতে মায়ের মনে হঠাৎ ভয় হইত যে, আমি বুঝি আত্মহত্যা করিব। এ অবস্থায় আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে বেশী বিলম্ব হইত না। এই রকম করিয়া আমি সর্ব্বশক্তিমান হইয়া উঠিলাম। বুড়া দেওয়ানজী হইতে মাষ্টার মহাশয় পর্য্যন্ত কেহই আমার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে পারিতেন না। পরে শুনিয়াছি যে ইঁহারা সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতেন, কখন আমার খেয়ালে বাধা দিয়া তাঁহাদের বা চাকরী যায়।

কিন্তু একটি লোকের আমার উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল, সে বিপিন। সে এখন বেশ বড়সড় হইয়াছে, দুষ্ট বুদ্ধি তার বেশ খেলে। তার কাছে আমি তামাক খাইতে শিখিলামই, সে আরও অনেক অপকর্ম্মে আমাকে সাধ্যমত শিক্ষা ও দীক্ষা দিতে লাগিল। ক্রমে এমন অবস্থা হইয়া উঠিল যে, সে যাহা বলিত, তাহাই হইল আমার বেদ; তার কথায় আমি দেওয়ানজী বা রাণীমাকে পর্য্যন্ত অপদস্থ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতাম না।

বিপিনের বাড়ী হইল আমার প্রধান আড্ডা। কিঙ্কর সিংকে ফাঁকি দিয়া, কিম্বা তাহাকে ঘুস দিয়া ভুলাইয়া আমি বিপিনের সঙ্গে সময়ে অসময়ে তার বাড়ীতে যাইতাম। সেখানে তামাক খাইতাম। তাস দশ পঁচিশ প্রভৃতি খেলিতাম, কিম্বা ছিপ লইয়া তার পাশের পুকুরে মাছ মারিতাম, আর যত রকম নষ্টামি করিতে হয় তাহা করিতাম।

বিপিনরা ছিল জাতিতে নাপিত। তিন পুরুষ যাবৎ তারা আমাদের বাড়ীতে খানসামাগিরী করে। তার মার এক সময়ে রাজবাড়ীতে অল্পবিস্তর প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। তার মার বয়স এখন বছর পঞ্চাশ। বিপিন ও তার ছোট বোন বিধু তাঁর শেষ বয়সের ছেলে-পিলে।

বিপিনের বোন বিধু প্রায় আমারই বয়সী, আর সে ভারি সুন্দরী। সে ছিল আমার খেলার চিরসঙ্গিনী। যতক্ষণ তাদের বাড়ীতে থাকিতাম, সে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, আমাদের সঙ্গে খেলা করিত আর আমার সেবা করিত। তার সঙ্গে আমার ক্রমে খুব ভাব জমিয়া গেল। বিপিন ও তার মা আমাদের দুজনের এই সদ্ভাবটা খুব প্রীতির চক্ষে দেখিত। ক্রমে আমার উপর বিধুর আধিপত্য বিপিনের চেয়েও বুঝি বেশী হইয়া পড়িল।

বিপিনের মা পার্ব্বতী পিসি আমাদের মজলিসের সহায়ক ও সহজ নেত্রী ছিল। সে আমাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া রাজবাড়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত। কি জন্য যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত, তাহা আমি বুঝিতে পারিতাম না; আমি সরল মনে তাহাকে সকল কথা বলিয়া যাইতাম। আর সে আমাকে সব কথার ভিতরকার কথা বুঝাইয়া বলিত, আমাকে সুবুদ্ধি দিত—বলা বাহুল্য, সে সুবুদ্ধি দুষ্টবুদ্ধি।

অল্প দিনের মধ্যেই পার্ব্বতী পিসির কাছে শুনিলাম যে রাণীমার স্বভাব চরিত্র অতি মন্দ এবং সদর নায়েব গোবিন্দ তাঁহার প্রণয়-পাত্র। রাণীমা রাজবাড়ীর সব সম্পদ উজাড় করিয়া গোবিন্দের হাতে তুলিয়া দিতেছেন তা' ছাড়া, রাণীমার বাপের বাড়ীর আত্মীয় কুটুম্বের অবধি নাই—তাহারা রাজবাড়ীর তহবিল লুটিয়া খাইতেছে। এমনি ভারে চলিলে আমার সাবালক হওয়ার পূর্ব্বেই আমার নিজস্ব সকল রাজসম্পদ একেবারে উড়িয়া যাইবে। আরও শুনিলাম যে দাইমা একটি আস্ত ডাকাত। তারও প্রণয়ী আছে, তা' ছাড়া তার ছেলে পিলেও আছে। সে আমাকে উপলক্ষ করিয়া দেদার টাকাকড়ি আদায় করিয়া নিজের প্রণয়াস্পদ ও পুত্রাদিকে দান করিতেছে। এমনি ভাবে লুটতরাজ হইতে থাকিলে সাবালক হইয়া আমি কিছুই পাইব না, সকল সম্পদ সাত ভূতে লুটিয়া খাইবে।

পার্ব্বতীপিসি প্রসঙ্গক্রমে এক দিন জিজ্ঞাসা করিল, রাণীমার শুইবার ঘরে একটা প্রকাণ্ড রূপার গড়গড়া ছিল সেটা এখন আছে না কি? আমি বলিলাম রূপার গড়গড়া আমি দেখি নাই। সে বলিল, "দেখবে কোথা থেকে বাবা? সে যে এখন গোবিন্দের সিন্দুকে বন্ধ হ'য়েছে।"

এমনি করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে আমাকে হিসাব দিয়া দিল যে, প্রাসাদে রাণীমা ও দাইমা মিলিয়া আমাকে পথে বসাইবার জন্য দুই হাতে লুট তরাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

শুধু এই নয়। বুড়া দেওয়ানজী মহাশয় প্রজার রক্ত শুষিয়া টাকা আদায় করেন ; কিন্তু তার বারো আনা যায় তাঁর নিজের সিন্দুকে। কর্ত্তা মারা যাওয়ার পর হইতে দেওয়ানজী যে পরিমাণ সম্পত্তি করিয়াছেন, তাহা প্রায় রাজবাড়ীর সম্পত্তির অর্দ্ধেক। এ সব যে রাজবাড়ীর চোরাই সম্পদে কেনা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তা' ছাড়া গোপালদহের প্রকাণ্ড জলকরটা, যাহা হইতে সরকারের বৎসরে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা আয় হইতে পারিত—তাহা রায় জমীদারদের কাছে লক্ষ টাকা ঘুস খাইয়া দেওয়ান ছাড়িয়া দিয়াছে। তার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার লইয়াছে দেওয়ান আর পঞ্চাশ হাজার লইয়াছে সদর নায়েব গোবিন্দ।

এমনি করিয়া রাজবাড়ীর সকলের লুট তরাজ সম্বন্ধে অসংখ্য সংবাদ পার্ব্বতীপিসি আমাকে দিত। এ সব কথা সম্পূর্ণ তাহার স্ব-কপোল-কল্পিত নহে। পরে জানিয়াছিলাম যে ইহার বেশীর ভাগ কথাই সামান্য সত্যের উপর অতিমাত্র রঙ্গ ফলাইয়া বলা। মায়ের ঘরে স্বর্গীয় রাজার গুড়গড়া ছিল বটে। রাজা বাহাদুরের মৃত্যুর পর তাহা তোষাখানায় লইয়া যাওয়া হয়। একবার সদর নায়েব গোবিন্দ একজন মহামান্য অতিথির সম্বর্দ্ধনার জন্য সেই গড়গড়া তোষাখানা হইতে বাহির করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে গড়গড়া গোবিন্দ ফিরাইয়া দিয়াছিল। গোপালদহের জলকরে আমাদের কস্মিন কালেও কোনও স্বত্ব ছিল না। তার প্রকৃত স্বত্বাধিকারীরা দুর্ব্বল বলিয়া দেওয়ানজী তাহা জবর দখল করিতে চেষ্টা করেন। তাই লইয়া কতকগুলি মোকদ্দমা হয়। মোকদ্দমায় পরাজয় নিশ্চয় জানিয়া, দেওয়ানজী মোকদ্দমার তদ্বির করিবেন না বলিয়া, অপর পক্ষের নিকট পাঁচ হাজার টাকা ঘুস লইয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি মোকদ্দমার রীতিমত তদ্বির করেন, কিন্তু সে মোকদ্দমায় আমাদের পরাজয় হয়। রাণীমার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে পার্ব্বতী যে কথা বলিয়াছিল, তাহার সত্যাসত্য জানিবার সুবিধা আমার হয় নাই।

আমার তখন এত সত্যাসত্য বিচারের ক্ষমতাও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। পার্ব্বতীপিসি যাহা বলিত, আমি বেদ বাক্যের মত মানিয়া লইতাম, আর মনে মনে গস্‌গস্‌ করিতাম। মনে মনে এই সব দুষ্কর্ম্মকারীদের শাস্তির জন্য নানা রকম অসম্ভব উপায় কল্পনা করিতাম, আর মানসচক্ষে দেখিতে পাইতাম যে, সকল পাপিষ্ঠ আমার সম্মুখে ধরা পড়িয়া অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। রক্ত আমার টগ্‌ বগ করিয়া ফুটিত। পার্ব্বতীপিসি এবং বিপিন আমার আক্রোশে ক্রমাগত ইন্ধন জোগাইত।

অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি কেবল কল্পনাই করিলাম, কাজে কিছু করিতে সাহসে কুলাইল না। পার্ব্বতী, বিপিন ও বিধু ছাড়া সকলকেই নিদারুণ সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। তাহাদের ব্যবহারে, কথায়-বার্ত্তায় পদে পদে পার্ব্বতী পিসির কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। চারিদিকে চক্ষুকর্ণ সজাগ করিয়া রাখিলাম। কিন্তু বেশী ভয়ানক কিছু ঘটিল না। (ক্রমশঃ)

সোলতান সেখ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

(এক গরিব মুসলমান, তার একমাত্র পুত্র বাঙ্গালী পল্টনে মারা যায়। সে এখন সংসারে একাকী। সর্ব্বদা মসজিদে থাকে এবং কোরাণ পাঠ করিয়া প্রাণে শান্তি পায়।)

বিষয় তাহার বিকিয়ে গেছে শুকিয়ে গেছে আশা,
আপন জনে পালিয়ে গেছে ভগ্ন করি বাসা।
রাজার লাগি সমর মাঝে পুত্র দেছে দান,
ধরার মাঝে একলা আছে সঙ্গীহারা প্রাণ।
দুঃখ তাহার উষ্ট্র সম দাঁড়িয়ে আছে দ্বারে,
ক্লান্ত তার ও পৃষ্ঠ যেন নয়ন জল ভারে।
ফুরিয়ে গেছে ফুলের মেলা সমীর ফুরু ফুরু,
আজকে হতে মরুর পথে যাত্রা হ'ল সুরু।
মূর্ত্তি তাহার দারুণ কৃশ চক্ষে শত রেখা,
দিবস নিশি রয় সে বসি মসজিদেতে একা।
কোরাণ ছিল মুখস্থ তার কি এক ছিল বাদ,
আজকে তাহে হঠাৎ পেলে নূতন সুধার স্বাদ।
জীবন তাহার আরব মরু আজ সে মুসলমান,
জাগলো প্রাণে 'জুম্মা' আদিম প্রথম 'আজান্' গান।

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু বি-এ

(কোন নদী)

...লী-আচ্ছন্না রজনীর তরল তিমির চিরিয়া প্রভাতের অস্ফুট সুহৃদ্ মিঃ নরসিং রাও অপেক্ষা করিতেছিলেন।
...কে "মেট্রোপলিয়ম মেল" আসিয়া মাদ্রাজের দ্বারে তাঁহার সাহায্যে তিনখানি একাশ্ব-সংযোজিত ঝট্‌কায়

আদেয়ার নদী ও বোট ক্লাব

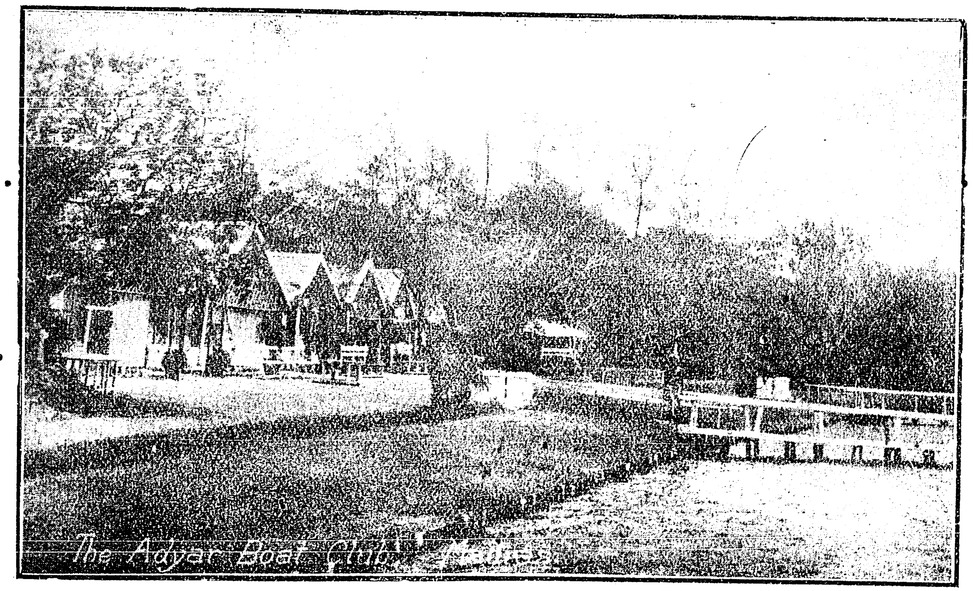

দাঁড়াইল। আমরা পাঁচজন সহযাত্রী সুদূর নীলগিরি স্থাবর-অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া সহরের মধ্যে
হইতে মাদ্রাজে আসিলাম। ষ্টেশনে অন্ধ্রদেশবাসী প্রবেশ করিলাম। তখনো নগরীবক্ষে কর্ম্মচাঞ্চল্য অনুভূত

হয় নাই। সুষুপ্তির সুখাবেশ ছাড়িয়া সহরবাসী তখন সবে-মাত্র আপন আপন কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতেছে।

সহরের 'ট্রিপলীকেন' নামক অঞ্চলে স্থানীয় বন্ধুগণ কর্ত্তৃক আমাদের জন্য পূর্ব্ব হইতেই একটি বাসা ভাড়া করিয়া রাখা হইয়াছিল। মিঃ রাও পথিপ্রদর্শকরূপে চলিলেন। মাদ্রাজ সহরের প্রসিদ্ধ রাজপথ 'মাউণ্ট-রোডের' (Mount Road) উপর দিয়া আমাদের ঝট্‌কা তিনখানি মৃদুমন্দ গতিতে চলিল। পথিমধ্যে লাট সাহেবের মর্ম্মর-ধবল প্রাসাদ দেখিলাম। মাউণ্টরোড রাস্তার ঠিক উপরেই ইহার প্রধান তোরণ-দ্বার অবস্থিত। তোরণমধ্যে প্রবেশ করিলেই দক্ষিণ পার্শ্বে একটি শ্বেতবর্ণ

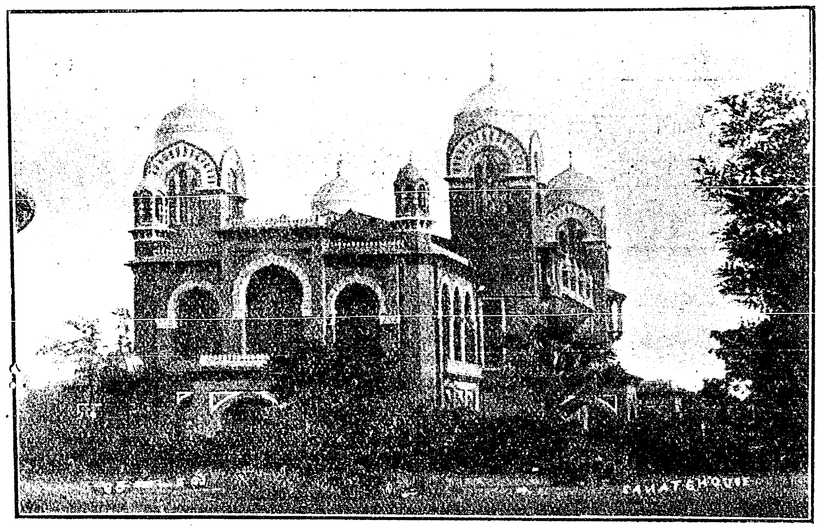

সেনেট গৃহ—মাদ্রাজ

বাড়ী দৃষ্ট হয়। ইহা শ্রীরঙ্গপত্তন বিজয় উপলক্ষে ১৮০২ অব্দে প্রমোদভবন রূপে নির্ম্মিত হয়। শুনিলাম এথেন্স নগরীর সুপ্রসিদ্ধ 'পার্থেননে'র আদর্শে এই প্রমোদগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

The birth-place of British India নামক পুস্তকে দেখিলাম যে, লাট সাহেবের এই সুবিস্তৃত প্রাসাদটি ১৭৫৩ অব্দে জনৈক ধনী বণিকের বিধবার নিকট হইতে গভর্ণমেণ্ট ৩৫০০ পেগোডার কিনিয়া লন। তদবধি ইহা 'গভর্ণমেণ্ট হাউস'রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

গভর্ণমেণ্ট হাউস ছাড়াইয়া বাসা অভিমুখে চলিলাম। পথে একটি হিন্দুস্থল দৃষ্ট হইল। শুনিলাম ভারত-প্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় এই স্থলে বহুদিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আহারের উপকরণ আদি ক্রয় করিয়া ভোজন শেষ করিতেই তিনটা বাজিয়া গেল।

পরদিন ভোরে অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই সহর পরিদর্শনে বাহির হওয়া গেল। বয়োবৃদ্ধ আশুবাবু সেই শীতের ভোরে শয্যা ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। তাঁহার স্নেহাস্পদ ভ্রাতা নারায়ণচন্দ্রও দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। আমি, হরিহর বাবু ও বনবিহারী বাবু ভ্রমণে বাহির হইলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই দেখিলাম সম্মুখে ক্ষুদ্রকায়া কোম-নদী মাদ্রাজ সহরের মধ্য দিয়া এই নদীটি প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিশিয়াছে। নদীর ধরিয়া সাগর ও তটিনীর সম্মিলন-স্থলে উপস্থিত হইলাম। তখন ঊষা-প্রকাশের গোলাপী আলো সবেমাত্র গগনপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারই আভায় সাগরের প্রান্তদেশ ঈষৎ রক্ত-রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির নয়নাভিরাম শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। এইখান হইতেই মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ রাজপথ "মেরিণা'র আরম্ভ। কোমনদীর সঙ্গম-স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী ময়লাপুর পর্য্যন্ত এই রাজপথ বিস্তৃত। এরূপ সুন্দর রাস্তা ভারতবর্ষে কুত্রাপি নাই। জনৈক ইয়োরোপীয়ান পর্য্যটক (Lt. Col. H. A. Newell F. R. G. S.) এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—This thoroughfare only lacks an avenue of trees to make it one of the finest of its kind in the world." রাস্তার পার্শ্বে নবরোপিত ঝাউএর সারি দেখিলাম। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা

বৃদ্ধি পাইয়া সুন্দর কুঞ্জরূপে পরিণত হইবে। বস্তুতঃ, এই রাজপথ মাদ্রাজ সহরের ইডেন উদ্যান। সন্ধ্যার সময়ে সহরের ধনী দরিদ্র আবাল বৃদ্ধ বনিতার ভ্রমণ ও বিশ্রাম-

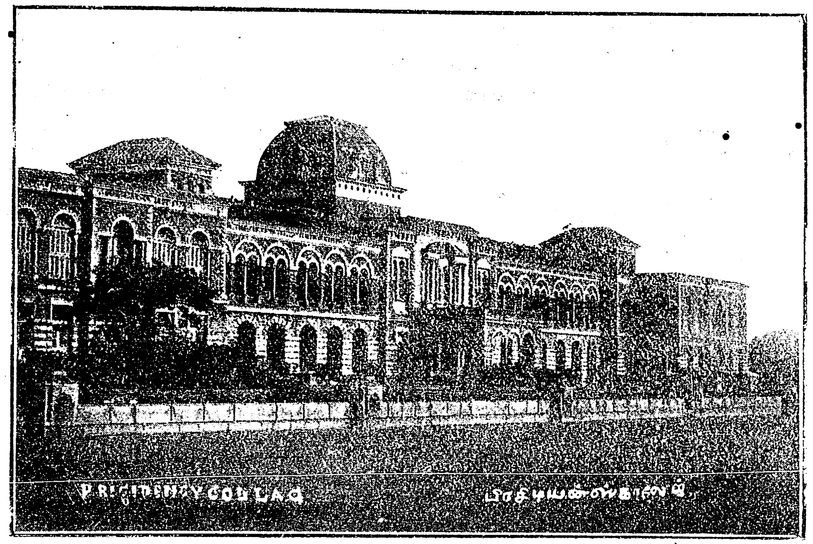

প্রেসিডেন্সি কলেজ—মাদ্রাজ

স্থান। রাস্তার উপরে একটি ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডও আছে। ১৮৮১ সালে তদানীন্তন গভর্ণর সার গ্রাণ্ট ডাফের চেষ্টায় এই সুন্দর পথটি নির্ম্মিত হয়।

'মেরিণা' রাজপথ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। পশ্চিমে অশ্বারোহণের রাস্তা; তাহার পার্শ্বে মোটর ও অন্যান্য যানের পথ। তার পর বাঁধানো ফুটপাথ। তাহার উপর স্থানে স্থানে উপবেশন-মঞ্চ। তাহার পার্শ্বেই মরশুমী ফুলের সুন্দর বাগান। সেই বাগানের ঠিক পরেই পান্থচারীগণের যাতায়াতের জন্য ঝাউএর কুঞ্জবেষ্টিত বালুকাময় পথ। আর সেই বালুকা-বেলার ঠিক নিম্নেই নীলিম-সুন্দর সাগর। মেরিণার পশ্চিম পার্শ্বে মাদ্রাজ সহরের অনেকগুলি সুবিখ্যাত প্রাসাদ বিরাজমান। ইহাদের কয়েকটির বিবরণ এখানে দিলাম।

(১) সেনেট হাউস। প্রায় তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ১৮৭৯ অব্দে এই সুদৃশ্য সৌধটি নির্ম্মিত হয়। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি শ্বেত-প্রস্তরে নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখিলাম। জুবিলি উৎসব উপলক্ষে ভিজিগাপাটামের মহারাজা গোদাই নারায়ণ গজপতি রাওএর অর্থ-সাহায্যে ইহা নির্ম্মিত হয়। সেনেটের পূর্ব্ব পার্শ্বে আর একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিলাম। ইনি মাদ্রাজ শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। সাধারণের অর্থ-সাহায্যে প্রস্তর-মূর্ত্তিটি প্রস্তুত হইয়াছে।

(২) চেপক প্রাসাদ। এই সুবৃহৎ ও সুন্দর

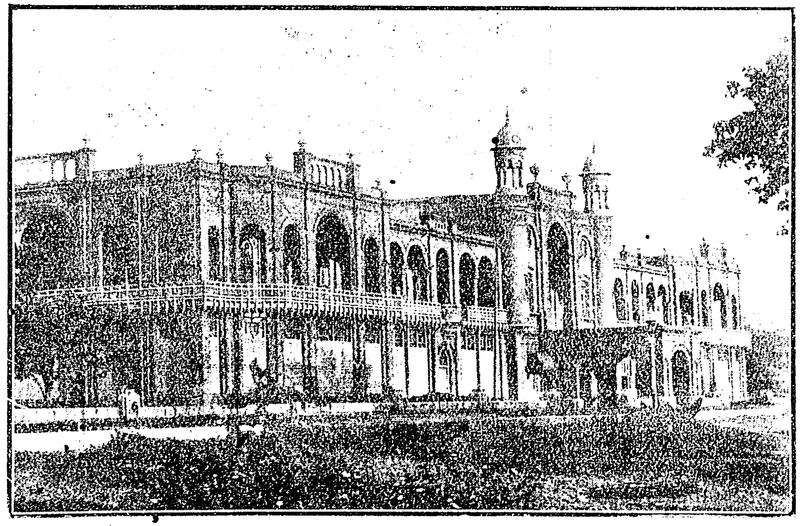

চেপক প্রাসাদের এক অংশ

অট্টালিকা কর্ণাটের অষ্টম নবাব মহম্মদ আলী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। বাটিটির গঠন ঠিক ইংরাজী "L" (এল) অক্ষরের ন্যায়। সম্ভবতঃ কোন ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারের পরিকল্পনায় এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। খাসমহল, হুমায়ুন মহল, দেওয়ানখানা প্রভৃতি বিবিধ অংশে এই সুবৃহৎ সৌধটি বিভক্ত। ১৮৫৫ অব্দে কর্ণাটের ত্রয়োদশ নবাব গোলাম মহম্মদ গাউস খাঁন নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকে প্রস্থান করিলে এই প্রাসাদটি ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। তদবধি ইহা মাদ্রাজের সরকারী আফিস-গৃহরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। Board of Industries, Public works Secretariat, Forest department, Sanitary Engineers department প্রভৃতি বিবিধ আফিসের কার্য্য এই প্রাসাদেই নির্ব্বাহিত হয়। কয়েক বৎসর আগে এই প্রাসাদেরই এক অংশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন সেই অংশটি পাবলিক ওয়ার্কস সেক্রেটেরিয়েটে পরিণত হইয়াছে।

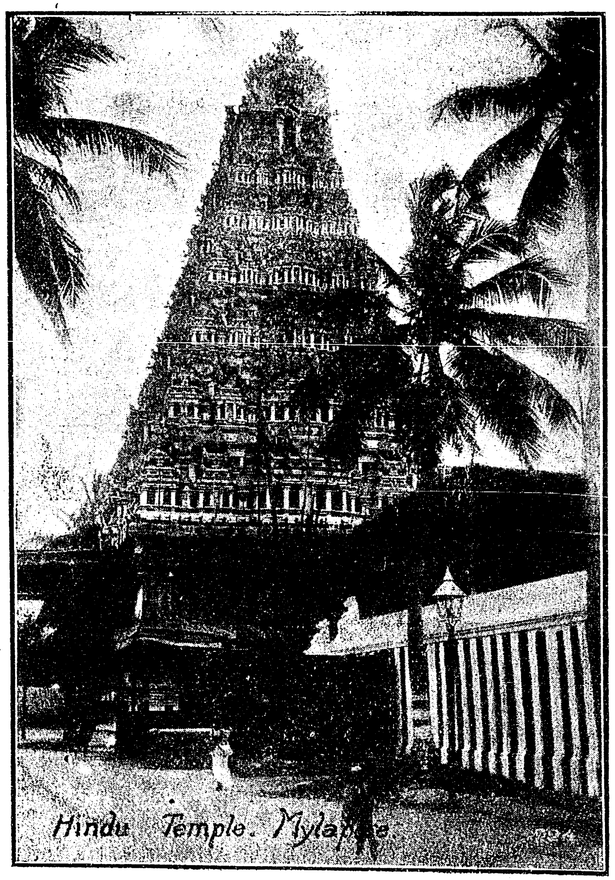

ময়লাপুরের হিন্দু-মন্দির

(৩) একোয়ারিয়ম। ইহা মাদ্রাজের—মাদ্রাজের কেন সমগ্র ভারতের একটী দর্শনীয় বস্তু। ভারতমহাসাগর হইতে নানাবিধ জীবিত মৎস্য ও জলজন্তু ধরিয়া আনিয়া এই একোয়ারিয়মের অভ্যন্তরস্থ স্ফটিকের আধারসমূহে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা করা হইয়াছে। ইলেক্‌ট্রিক পাম্পের সাহায্যে সমুদ্র হইতে ক্রমাগত লবণাক্ত জল আনাইয়া এবং আধারস্থিত দূষিত জল বাহির করিয়া দিয়া জীবগুলিকে সজীব রাখা হয়। মহাসাগরের বক্ষ-বিহারী জীবনিচয়ের দুর্লভদর্শন ক্রীড়া বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ। দর্শনীর মূল্য নামমাত্র; অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত চারি আনা; দিবসের অন্য সময়ে এক আনা মাত্র।

(৪) প্রেসিডেন্সি কলেজ। এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটি একোয়ারিয়মের ঠিক সম্মুখেই অবস্থিত। ছাত্রদিগের ক্রীড়া ও ব্যায়াম প্রভৃতির জন্য কলেজ-সংলগ্ন একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ রহিয়াছে। পরে শুনিয়াছিলাম এই কলেজের এক বাঙ্গালী অধ্যাপক নাকি কয়েক মাস আগে এইখানেই আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

(৫) শাহ আউলিয়ার সমাধি-স্তম্ভ। মেরিণা হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে একটি নয়নাভিরাম নারিকেল-কুঞ্জের অভ্যন্তরে এই মনোরম সমাধি-মন্দির বিরাজমান। ফকীর সাহেবের তিরোধান উপলক্ষে প্রতি বৎসর ৪ঠা এপ্রিলে এখানে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসে। দূর-দূরান্তর হইতে নরনারী আসিয়া মৃত মহাত্মার উদ্দেশে আপনাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পচন্দন নিবেদন করিয়া যায়। শাহ আউলিয়া বিজাপুরবাসী সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান ছিলেন। ১৭৭২ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর কর্ণাটের তদানীন্তন নবাব ওয়ালাজাহা কর্ত্তৃক তাঁহার সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক

সার ওয়াল্‌টার স্কট তাঁহার Surgeon's Daughter নামক উপন্যাসে এই সমাধিস্তম্ভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৬) আইস হাউস। এই অমল-ধবল ত্রিতল সৌধটি ১৮৪২ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক জাহাজ হইতে আনীত বরফের গুদামঘর রূপে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে ইহা আশ্রয়হীনা ব্রাহ্মণ বিধবাদের আশ্রয়-স্থান হইয়াছে। ইহার সংলগ্ন প্রাঙ্গণে নবনির্ম্মিত লেডি উইলিংডন ট্রেণিং কলেজ বিরাজমান। এই কলেজেই প্রাগুক্ত রমণীরা নানাবিধ শিক্ষা পাইয়া থাকেন।

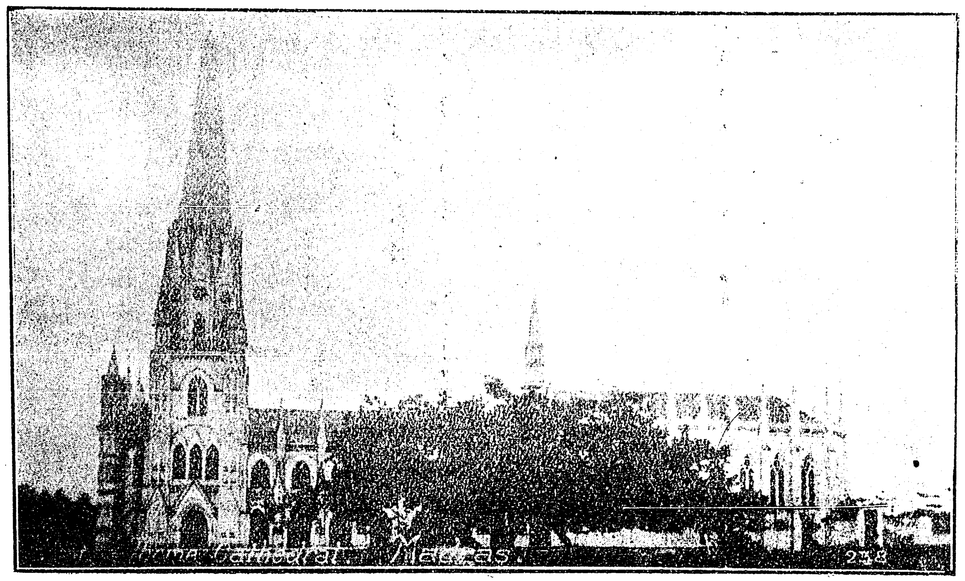

সেণ্টথোম গির্জ্জা

(৭) কুইন মেরী কলেজ। ইহাও মাদ্রাজবাসী মহিলাদের আর একটি শিক্ষাগার। দ্বিতল ও ত্রিতলে ছাত্রীদিগের থাকিবার স্থান; নিম্নে কলেজের অধ্যাপনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। কর্ণেল এফ কেপার নামক জনৈক ভদ্রলোকের বাসগৃহ ছিল বলিয়া এই গৃহটি 'কেপার হাউস' নামে পরিচিত। ইহার কক্ষ-বাতায়ন হইতে সাগর-শোভা সন্দর্শন ব্যস্তবিকই উপভোগ্য।

একটু একটু করিয়া বেলা বাড়িতেছিল। একটু একটু করিয়া নিসর্গ রাণীর সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত হইতেছিল। অদূরস্থিত সাগর-বক্ষে তপন-দীপ্ত গগনের কনক-কান্তি আভা প্রতিফলিত হইয়া সহস্র গুণ শোভায় বিচ্ছুরিত হইতেছিল। আমরা উপকূলস্থ পথ ধরিয়া তন্ময়ভাবে চলিতেছিলাম। পথে ভারত-প্রসিদ্ধ সার সুব্রহ্মণ্য আয়ারের গৃহ দৃষ্ট হইল। ক্রমে আমরা ময়লাপুরে প্রবেশ করিলাম।

ময়লাপুর মাদ্রাজ সহরের একটি সুপ্রাচীন পল্লী। ইহা পূর্ব্বে জনৈক হিন্দু-নরপতির রাজধানী ছিল। টলেমির বিবরণে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এতদঞ্চলের পর্ত্তুগীজগণের মধ্যে এই নগরীর সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে। তাহা এস্থলে লিখিত হইল।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নরপতি মহাদেবানের রাজত্বকালে ময়লাপুরের সমুদ্রতীরে একটি বৃহদাকার গাছের গুঁড়ি ভাসিয়া আসে। হস্তীযুন্দের সাহায্যে ঐ গাছটিকে রাজপ্রাসাদে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করা হয়। তাহাতে সফলকাম না হইয়া রাজা মহাদেবান পুরোহিতগণকে আহ্বান করেন। কিন্তু তাঁহারাও মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে কোনরূপ সুবিধা করিতে অসমর্থ হন। এই সময়ে জনৈক বিদেশী ব্যক্তি আসিয়া রাজাকে বলেন যে তিনি যদি গাছটি রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহাকে উহা উপহার প্রদান করিতে স্বীকৃত আছেন

কি না। রাজা সম্মত হন। আগন্তুক একটা রশির সাহায্যে বৃক্ষটিকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া একজন কুলিকে আদেশ করিলেন "এই গাছটি টানিয়া লইয়া চল।" সপারিষদ নরপতি সবিস্ময়ে দেখিলেন যে কুলিটি অল্প আয়াসেই সেই বৃক্ষটিকে টানিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইল। তদ্দর্শনে রাজা পরম সন্তুষ্ট হইয়া সেই আগন্তুককে সেই বৃক্ষটি এবং তাঁহার বাসস্থান নির্ম্মাণের জন্য কিঞ্চিৎ ভূমি দান করেন। এই আগন্তুক আর কেহই নহেন, ইনিই সেণ্ট টমাস্। সেই কাষ্ঠখণ্ড-সাহায্যে রাজদত্ত ভূমির উপর সেণ্ট টমাস একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। ইহাই পরে তাঁহার নামানুসারে "স্যানথোম ক্যাথিড্রেল" নামে প্রখ্যাত হয়।

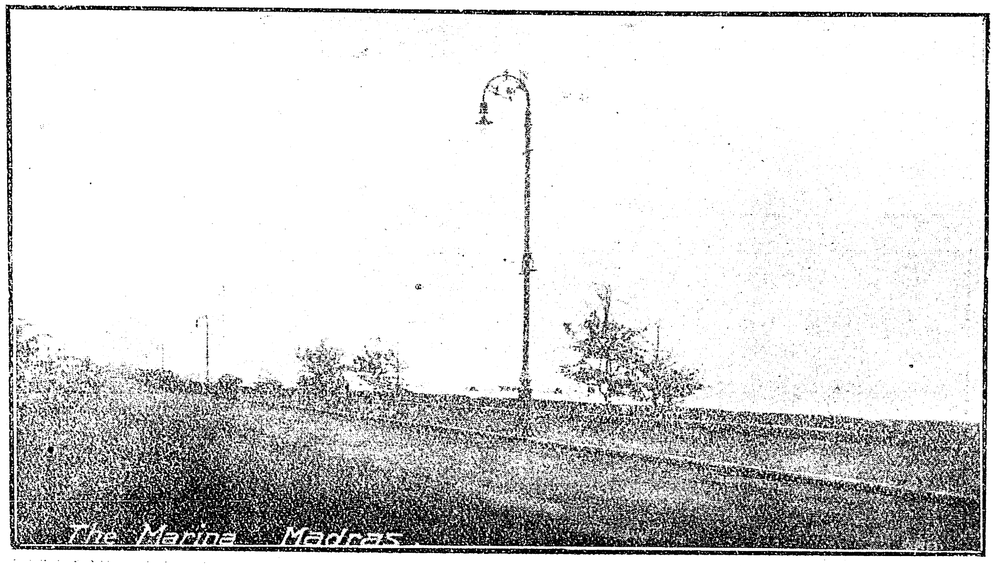

মেরিণা—মাদ্রাজ

এইরূপ কথিত আছে যে, সেণ্ট টমাস ক্রমে রাজার এতদূর বিশ্বাসী ও ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন যে, তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে রাজকার্য্য পরিচালিত হইত। ইহাতে তদানীন্তন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশ করেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার দেহাবশেষ আনিয়া তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত গির্জ্জার পার্শ্বে প্রোথিত করেন। এই গির্জ্জা মাদ্রাজ সহরের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ দর্শনযোগ্য স্থান।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ময়লাপুরে পর্ত্তুগীজদের আগমন হয়। তাঁহারা আসিয়াই উক্ত গীর্জ্জার 'স্যান থোম ক্যথিড্রেল' নামকরণ করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় স্যানথোম বর্ত্তমান আকৃতি ধারণ করিয়াছে।

গির্জ্জার উত্তর পার্শ্বস্থ দেওয়ালে সীবাষ্টিনো দি সান পিড্রো হইতে আরম্ভ করিয়া যে কয়েকজন বিশপ এখানে ধর্ম্মযাজন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম খোদিত রহিয়াছে দেখিলাম। গির্জ্জার প্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত কবর দর্শন করিলাম। শুনিলাম এইখানেই সেণ্ট টমাসের পুণ্যদেহ চারি শতাব্দী ধরিয়া সমাহিত ছিল; পরে কতিপয় তীর্থযাত্রীর চেষ্টায় তাহা চতুর্থ শতাব্দীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

স্যানথোম ছাড়াইয়া আমরা বরাবর দক্ষিণে চলিলাম। দক্ষিণ পার্শ্বে বৃক্ষকুঞ্জের অন্তরালে সেণ্ট ল্যাজারাস গির্জ্জার রজত-ধবল চূড়া দৃষ্ট হইল। ইহাও পর্ত্তুগীজদিগের নির্ম্মিত। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই জয়পুর মহারাজের প্রকাণ্ড প্রাসাদ নেত্রপথে পতিত হইল। সেই প্রাসাদ অতিক্রম করিয়াই সম্মুখে আদেয়ার নদী দেখিতে পাইলাম। মৃদু কল্লোলে প্রবাহিত হইয়া এই ক্ষুদ্র নদী অদূরবর্ত্তী সাগরে

মিশিয়াছে। ইহাই মাদ্রাজ সহরের শেষ সীমা। এখান হইতে আমরা পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বামে কল্লোলিনী আদেয়ার, দক্ষিণে তৃণগুল্ম-বিবর্জ্জিত উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রকৃতির এই বিচিত্র শোভার মধ্য দিয়া আমরা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। ঝলকে ঝলকে শীকর-শীতল সমীর আসিয়া পথশ্রমজনিত ক্লান্তি অপনোদন করিতেছিল। নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ লোহিতবর্ণ প্রাসাদ দৃষ্ট হইল। শুনিলাম উহাই সুপ্রসিদ্ধ থিওসফিক্যাল সোসাইটির আফিস-গৃহ। নদীর অপর পারে প্রায় দুইশত ষাট একার ভূমি লইয়া বিদুষী মহিলা এনি বেশান্ত তাঁহার চির সাধনার ধন থিওসফি-র প্রচারকল্পে এই সোসাইটি স্থাপন করিয়া-ছেন। এতদ্‌সংলগ্ন লাই-ব্রেরী, বসন্ত প্রেস, আগন্তুকগণের বিশ্রাম-স্থান, কনভেনশন হল, সোসাইটির কার্য্য-পরি-চালন-গৃহ, ব্ল্যাভাটস্কি গার্ডেন প্রভৃতি দেখিবার জিনিস। নদীর পরপারে যাইবার জন্য ৫২০ গজ লম্বা একটি প্রকাণ্ড ব্রিজ রহিয়াছে। এই ব্রিজ মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড এলফিনষ্টোনের শাসনকালে ১৮৪২ অব্দে নির্ম্মিত হয়; তাই ইহার নাম এলফিনষ্টোন ব্রিজ।

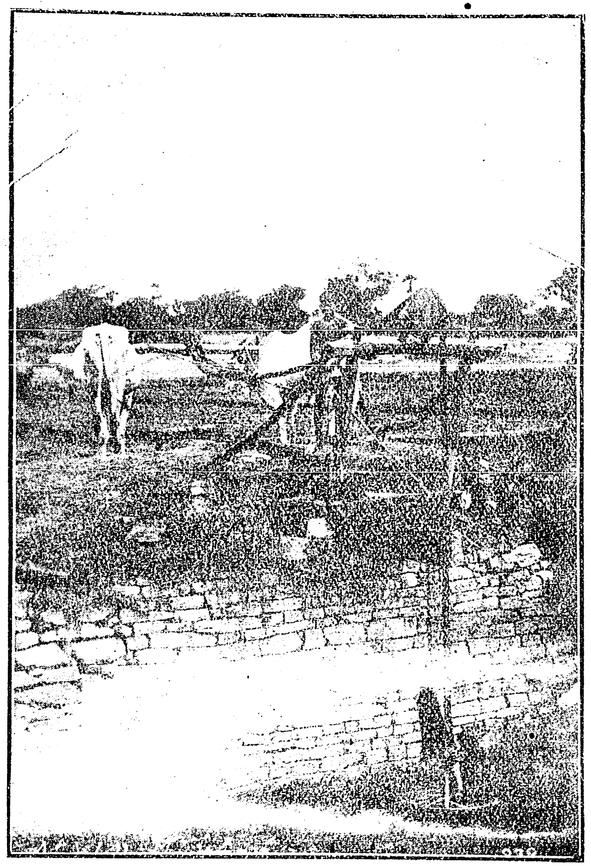

একটী কূপ

সোসাইটির মধ্যস্থিত ব্ল্যাভাটস্কি গার্ডেনের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড উচ্চ বৃক্ষ দর্শন করিলাম। শুনিলাম সমগ্র ভারতের মধ্যে ইহা একটি প্রকাণ্ড মহীরুহ। ঘনবিন্যস্ত তালীবনের মধ্যে কর্ণেল অলকটের একটি প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। তাহাতে খোদিত আছে—

Henry Steele Olcott, Colonel V. S. A. Army, President-Founder of the Theosophical Society. On this spot was given back to the elements, February 197th. 107, May he soon return.

থিওসফিক্যাল সোসাইটি ত দেখা হইল। এবার বাড়ী ফিরিবার পালা। এখান হইতে বাসা প্রায় সাত মাইল দূর। বেলাও প্রায় বারোটা। তপন-তপ্ত পথের উপর দিয়া ধীর-মন্থরগতিতে আমরা তিনটি প্রাণী অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দুই-ধারে বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর—বৃক্ষ-লতা-তৃণ-গুল্ম-বিবর্জ্জিত; আলে চক্রবাল-নিম্নে, প্রকৃতির প্রশান্ততম প্রকাশ ধূসর পর্ব্বতমালা। শ্যামলতার চিহ্নমাত্রও নাই!

ক্রমে সহর-সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মাদ্রাজ সহরের সীমান্তে নিম্নশ্রেণীর পারিয়াদের বাস। তাড়ী বিক্রয় ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, দেখিলাম চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী নারিকেল বৃক্ষসমূহে এক একটি মৃত্তিকাপাত্র বাঁধা রহিয়াছে। এতদঞ্চলে নারিকেলের তাড়ী যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত।

ক্রমে ময়লাপুরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। বামেই ময়লাপুরের সুপ্রসিদ্ধ শিবমন্দির। সমগ্র মাদ্রাজ সহরের

মধ্যে এক ট্রিপলীকেন অঞ্চলস্থিত পার্থসারথি মন্দির ব্যতীত এতবড় মন্দির আর নাই। মন্দিরের সম্মুখস্থিত সরোবরের তীরে উপবেশন করিয়া ক্লান্তি অপনোদন করিতে লাগিলাম। বায়সনেত্র-গঞ্জিত নির্ম্মল-নীর পরিপূর্ণ বিশালকায় পুষ্করিণী;—তাহার চারিধার বেষ্টন করিয়া প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী। সরোবরের মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দির দেখিলাম্। শুনিলাম দেবতা স্নানের পর এই ক্ষুদ্রকার মন্দিরে বিশ্রাম করেন। সরোবর-তীরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ক্লান্ত শরীরটাকে কোনও রূপে টানিয়া তুলিয়া আবার অগ্রসর হইলাম। বাসায় আসিয়া দেখি বন্ধুবর নারায়ণচন্দ্র পোয়া তিনেক "সুরু সুরু কলেরাপটানি" (গরম ছোলা ভাজা) ক্রয় করিয়া সেই বেলা তিনটার সময় তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ব্যস্ত। আমাদের ভ্রমণের চিরসঙ্গী পাচক-প্রবর গঙ্গাধর প্রচণ্ড নাসিকাগর্জ্জনে নিরত। আর বৃদ্ধ আশুবাবু অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া আমাদের পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। কারণ জিজ্ঞাসায় যাহা জানিলাম, তাহাতে সমস্ত শরীর জুড়াইয়া গেল। সমস্ত-দিনব্যাপী অনাহার ও পরিশ্রমের পর কোথায় পেট ভরিয়া খাইব, তা নয় শুনিলাম স্বভাব-সুলভ অন্যমনস্কতা-বশতঃ পূর্ব্বরাত্রে আমার চাবির রিংএ রক্ষিত ভাঁড়ার ও রান্নাঘরের চাবী লইয়া আমি সহর দর্শনে বাহির হইয়াছিলাম। অনেক চেষ্টাতেও সেই ঘর দুইটি খোলা যায় নাই। অথচ এখানকার তিল তেলে ভাজা বাজারের খাবারও বাঙ্গালী-রসনার, ততোধিক বাঙ্গালী উদরের (আশুবাবু আবার পেটরোগা মানুষ) একান্ত অনুপযোগী। তাই তাঁহারা আমাদের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সংবাদটা শুনিয়া প্রাণে কেমন বিপুল আনন্দ অনুভব করিলাম, "ভারতবর্ষের" পাঠক-পাঠিকা তাহা অনুমানেই বুঝিতে পারিতেছেন; বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন।

কালুদাদা

শ্রীরমলা বসু

আজ হরিপুরের চাটুর্য্যেদের বাড়ী বড় ধুম! সুসজ্জিত রোয়াকের চারি পাশে গেঁদাফুলের মালা গেঁথে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে; মাঝে মাঝে বিচিত্র বর্ণের কাগজের ফুঁকো লণ্ঠন, বড় বড় থামে দেবদারু পাতা দিয়ে মোড়া, এধার-ওধার টিপয়ের ওপর রুপোর ফুলদানীতে বড় বড় ফুলের তোড়া; গোলাপ, পাশ, মেজেয় গালিচা পাতা, সিঁড়ীর দুপাশে সার দেওয়া "পাম" গাছ, গাড়ী-বারাণ্ডা থেকে ফটক অবধি দুধারে দেবদারু পাতার সার, তার মাঝে মাঝে জাপানী লণ্ঠন টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে, গেটের দুপাশে দুটী কলাগাছ ও সিন্দুর-লেপিত মঙ্গল-কলস। তারি এক পাশে বাজনাদার কতকগুলি বসে আছে, কেহ একটু বাজাতে হুকুম করলেই বাজাতে সুরু করে। কেউ বা অধীর হয়ে বসে বসে থেকে এক-একবার ফুঁ করে আওয়াজ করে উঠছে, কেউ পান তামাক চিবাতে চিবাতে অনবরত থুথু ফেলছে, কেউ গল্প করছে, কেউ ফটকে ঠেস দিয়ে আধঘুমন্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

বাড়ীখানির অল্পদিন হোল আগাগোড়া রং ফেরানো হয়েছে, তার সুসজ্জিত আকার ও ধরণ-ধারণ দেখে বিয়ে-বাড়ী বলে যেন ভুল হচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়। আজ সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পরে শিক্ষা শেষ করে চাটুর্য্যে-বংশের জ্যৈষ্ঠ পুত্র ও উত্তরাধিকারী শ্রীমান প্রতুলের শুভ-গৃহাগমন। তাও আবার যেমন তেমন পাশ নয়; এবার সে সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে, চাকরী পেয়ে দেশে ফিরছে।

মা-বাপ আত্মীয়-স্বজনের আর আনন্দের সীমা নেই। আজ, সুদীর্ঘ কালের পর পুত্রকে ফের তাঁদের স্নেহময় বক্ষে তো ফিরে পাবেনই, তাছাড়া তার সঙ্গে সঙ্গে এই কৃতী পুত্রটী যে বংশের ও দেশের মুখোজ্জ্বল করেছে, সেজন্যে যথেষ্ট গরিমাও মিশ্রিত রয়েছে। আজ সন্ধ্যের ট্রেনে সে কলকাতা হতে এসে পৌঁছবে। সকাল থেকে সমস্ত বাড়ীখানাকে ধুয়ে-মেজে ঝকমক করা হয়েছে। বাহির দিকের একখানি ঘরকে হালফ্যাসানে সজ্জিত করা

হয়েছে; তা না হলে যদি সে সাহেব পুত্রের মনে না ধরে! এমন কি এই চির-আচারনিষ্ঠ হিন্দু পরিবারের মধ্যে একটী স-দাড়ী খানসামারও আমদানী হয়েছে; তা না হলে যদি ছেলের বাঙ্গালীর খাদ্য, মাছের ঝোল, সুক্তনী, ডালনা চচ্চড়ী ইত্যাদি মুখে না রোচে। তাই এই মুসলমান-পুত্রটীকে নিযুক্ত করা হয়েছে; সে ছেলের খানসামা ও বেহারা দুই কাজই করবে।

এতে বাড়ীর আশৈশব বিধবা পিসিমা ঘোর আপত্তি করেছিলেন। বাড়ীর বাইরে ছেলেরা যাই করুক না কেন, কিন্তু তাঁর বাপ-পিতামহের ভিটেয় এ সব ম্লেচ্ছো কাণ্ড তাঁর কিছুতেই সহ্য হবে না। ভাইয়ের বাড়ী অনেক দিন তিনি বাঁধা আছেন; কিন্তু এবার তিনি কাশীবাসিনী হবেনই, শুধু প্রতুলকে আর একবার দেখে যাবার মায়ায় এ কয়দিন থেকে যেতে রাজী হয়েছেন। আর ঘোর আপত্তি করল কালুরাম। সে চাটুর্য্যে-বাড়ীর বহু পুরাতন ভৃত্য; তাদের সুখে দুঃখে, তাদের সঙ্গে সব রকমে জড়িত; আর প্রতুলকে সে এতোটুকু থেকে মানুষ করে এসেছে; প্রতুল তার কাছে এখনো সেই "খোকাবাবু"ই। এমন কি বিলাত যাবার আগে যখন প্রতুলের প্রায় উনিশ বছর বয়স, তখন পর্য্যন্ত কালু তার সব কাজ না করে দিলে তার মনের মত হত না। তাই কালুরাম ধারণা করতেই পারল না, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে, হলোই বা সে একটু বুড়ো, আর একটা দাঁত একটু নড়লই বা, এখন পর্য্যন্ত তো সে অনায়াসে মুড়ী মুড়কি নারকেলটা চিবিয়ে খেতে পারে, এমন কি সে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে যে, সে প্রতুলের কাজকর্ম্ম করে দিতে পারবে না!

তবে কেন এই হতভাগা ম্লেচ্ছো চাকরটার দরকার? তার দাড়ীর মধ্যে হয় ত বিশ্বসংসারের ময়লা ভরা আছে। একটা সাফ চাপকান আর মস্ত একটা পাগড়ী পড়লে, আর দুএকটা কেতাব-দুরস্ত মেড়ো কথা বল্‌লেই বুঝি তার সব ম্লেচ্ছোমী ঢাকা পড়ে যাবে? সে তার খোকাবাবুর কাজ কি-ইবা জান্‌বে, আর কি-ইবা করবে? সে কি জানে, খোকাবাবু কি রকম ধুতী কোঁচান পরতে ভালবাসে; কি রকমে কতক্ষণ স্নানের আগে তৈল মর্দ্দন করতে ভালবাসে; বাগানের কোন্ পেয়ারা গাছের দাঁতন তার সবচেয়ে পছন্দ; কত বলক দুধ কি রকম শর্করাযোগে তার প্রিয়? সে সংসারের আজন্মের ভৃত্য; সে ছাড়া সংসারের এ সব নিগূঢ় অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব আর কে জানতে পারে, যে তার স্থান একটা ম্লেচ্ছো এসে অধিকার করবে? সেবার মনে নেই,—একবার সে কতদিন ধরে বাতজ্বরে ভুগছিল; বাড়ীতে রামাচাকর তখন খোকাবাবুর কাজ করে দিত। খোকাবাবুর তা কিছুতেই পছন্দ হোত্ না। দুধের বাটী ছুড়ে ফেলে দিত, তেল মাখবার সময় রেগে অনর্থ করত, জুতো দেখে বল্‌ত 'রামটা একটা গাধা, এই কি জুতো রুসের ছিরি?' তাই একটু সারতে না সারতেই দুর্ব্বল শরীরে তাকে খোকাবাবুর কাজের জন্যে ফিরে আসতে হোল। একটু কাজ করতে গেলেই সে তখন মাথা ঘুরে অন্ধকার দেখত; তবু তার মাঝে, তার কাজ ছাড়া যে খোকাবাবুর চলে না, এই একটা বিপুল আনন্দে ও গর্ব্বে মনটা তার ভরে থাকত; সে পরম উৎসাহে খোকাবাবুর সব কাজ করে দিত।

একবার খোকাবাবুর খুব অসুখ করেছিল। সে সময় এক মা-ঠাকরুণ আর কালু ছাড়া আর কাউকেও সে নিকটে আসতে দিত না। কত বিনিদ্র রজনী সে খোকা-বাবুর জ্বরতপ্ত, আচ্ছন্ন মুখখানির দিকে তাকিয়ে কত দেবতার মানত করেছে যাতে খোকাবাবু তার শীঘ্র সেরে ওঠে। এ হেন খোকাবাবুর পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন কি কাজের সংখ্যা বেড়েছে যে, তার আজন্মের ভৃত্য কালুরাম তা করে দিতে পারবে না? কর্ত্তাবাবুর যেমন খেয়াল, কি একটা অনর্থক আপদকে এনে বাড়ীতে জুটিয়েছেন। ব্যর্থ ক্ষোভে যেন তার ভেতরটা এক একবার গুমরে গুমরে কেঁদে উঠবার মত হতে লাগল।

কিন্তু আজ তার মুখও, এই মুসলমান পুঙ্গবটী তার স্থান অধিকার করবার দুঃখ হ'লেও, বাড়ীর আর সকলের ন্যায় আনন্দ ও গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠেছে। সে তো বরাবরই জানত, তার সাধের খোকাবাবু একটা "কেউ কেটা" হয়ে উঠবেই। এখন মেজেষ্টর সাহেব হয়েছে, আর কদিন পরে তো একেবারে লাট সাহেব হয়ে যাবে, তখন তার চাকর কালুরামকে পায় কে? তখন সে খোকাবাবুর গাড়ীর পেছন পেছন একেবারে লাট সাহেবের বাড়ীতে যাবে। একবার সে-বছর যখন সে মা-ঠাকরুণের সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিল, তখন লাট সাহেবের বাড়ী

দেখেছিল। সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর পানে সে হাঁ ক'রে তাকাতে তাকাতে প্রায় ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তখন এক সেপায়ের যে বিষম তাড়া খেয়েছিল, এখনও তার তা বেশ ভাল করে মনে আছে। এবার খোকাবাবু লাট সাহেব হলে তো ঐ বাড়ীতে তার অবাধ গতিবিধি হবে, তখন দেখবে কোন্ বেটা সেপাই ফের তাকে তাড়া করে!

আহারান্তে শীতের মধ্যাহ্নে বাগানের ফুলতলায় বসে পান চিবাতে-চিবাতে সে এই রকম নানা সুখ-স্বপ্ন দেখছিল, আর তার সেই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল, সেদিন এত বড়, লোকজন-ভরা মনিব-পুরী একটী কিশোর বালকের অভাবে তার কাছে জন-শূন্য শ্মশানক্ষেত্রের মত মনে হয়েছিল। এই দীর্ঘকাল ধরে সকাল-সন্ধ্যা কেউ তো তাকে সেই সুমিষ্ট শাসনে ও অযথা উপদ্রবে অস্থির করে তুলবার ছিল না; সেই স্নেহের ডাক "কেলো, কেন্নো, কালো-পেঁচা—" কতদিন যেন সে শোনেনি। আর সেই বিদায়ের পূর্ব্বে দুষ্টুমি-ভরা চোখ দুটীর পরিবর্ত্তে দুটী অশ্রুভরা চোখের সেই বিদায়ের বেদনা-অশ্রু লুকোবার বৃথা চেষ্টা, আর সেই জড়িত কণ্ঠের শেষ কথা "কালুদাদা চল্লাম, ফিরে এলে ফের তোকে আমার সব কাজ করে দিতে হবে কিন্তু।"

এখন তো খোকাবাবুর সব লেখাপড়া হয়ে গেল, এবার বোধ হয় সে এলেই কর্ত্তাবাবু তাকে বিয়ে দিয়ে তবে কর্ম্ম-স্থানে পাঠাবেন। এতদিন দেশে থাকলে খোকাবাবুর কোল তিন চারটী খোকাখুকীতে পূর্ণ হয়ে যেত; তাহলে এ বৃদ্ধবয়সে তার আর কাজের অভাব কি থাকত! খোকাবাবুর পার্শ্বে একখানি নোলক-পরা সুন্দর রুচি টলটলে মুখ কল্পনা করে বৃদ্ধ সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল। তারপর হৈ হৈ রৈ রৈ, গাড়ীর ঘোড়ার শব্দে তার চমক ভেঙ্গে গেল; চেয়ে দেখল শীতের বেলা অনেকখানি গড়িয়ে গিয়েছে; খোকাবাবুকে ষ্টেশন থেকে আনবার জন্যে গাড়ী প্রস্তুত হচ্ছে। সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ততার সহিত ঘোরাঘুরি করছে। সেও আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে উঠে গেল।

(২)

আজ প্রায় দুবৎসর হল প্রতুল দেশে এসেছে। এখন সে নদীয়া জেলার এক সবডিভিশনাল অফিসার। সব-ডিভিশনাল অফিসর হলেও সে তার চেয়ে ঢের বেশী চালে থাকে; কারণ, তার শ্বশুর খুব বড়মানুষ, এমন কি, তিনি মস্ত একজন জমিদার। তাঁর সবে মাত্র দুটী মেয়ে—ছেলে এখন পর্য্যন্ত হয়নি। আর ছেলে-পিলে না হলে, এই মেয়ে দুটীই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। তিনি বড়ই সাহেবী চাল-চলনের পক্ষপাতী। নিজের গ্রামে, কলকাতায়, সিমলায় ও উটীতে যেখানে যেখানে তাঁর বাড়ী আছে, সবই আগাগোড়া ইংরাজী আদব-কায়দায় সাজান। নিজেও তিনি সর্ব্বদা ইংরেজী কায়দায় চলে থাকেন, দেশী জিনিসে তাঁর বড় অবহেলা ও বিতৃষ্ণা। ইংরেজী বোলচাল, আদবকায়দা সবি নকল করে চলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিধাতা তাঁর চামড়াখানা অতিরিক্ত কালো করে দিয়েছিলেন, অত্যন্ত বেশী রকম স্বদেশীর ছাপ মেরে—বা তিনি হাজার ঘষা-মাজা করেও এক পরতাও ফিকে করতে সমর্থ হননি।

ইংরেজী-মাহাত্ম্য তিনি এমন করেআ স্ত্রীরাদের মনেও বিস্তার করে দিয়েছিলেন যে, গল্প আছে তাঁর এক বিধবা বড়-দিদি সকলের কাছে খুব গৌরবের সঙ্গেই বলে বেড়াতেন "আমাদের নীলু জল ছোঁয় না"। জলটা নিতান্ত দেশের মাটী থেকে নিঃসৃত কি না, বিলাতী বোতলের জলীয়ের সঙ্গে তার তুলনা হবে কি করে?

তাঁর দুই কন্যা মিস অলকা ও মিস কুন্তলা, ছেলেবেলা থেকেই ইংরেজ গভর্ণেস দ্বারা শিক্ষিতা ও প্রতিপালিতা,—বাংলা বলবার তাদের হুকুমই ছিল না; মার কাছে যা লুকিয়ে লুকিয়ে একটু আধটু বাংলা বলতে শিখেছিল। জমিদার-গিন্নী অতি ভালমানুষ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ছিলেন, কিন্তু স্বামীর তাড়ায় প্রাণপণে সবই বিদেশী-নকল করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু অধিক বয়সে ইংরেজী ভাষা কিছুতেই তাঁর আয়ত্ত হোত না। তাই পারত-পক্ষে কারুর সামনে সে ভাষায় কথা বলতে চাইতেন না। অথচ স্বামীর পাল্লায় পড়ে প্রায়শঃ ইংরাজ পুরুষ-মহিলাদিগকে নিয়ে তাঁকে পার্টী ইত্যাদি দিতে হ'ত। আঁট সাঁট অনভ্যস্ত পোষাক ও জুতা মোজা পরে আলাপ পরিচয়ের চেষ্টায় তাঁকে গলদ্ঘর্ম্ম হতে হোত। জীবনটা তাঁর পক্ষে তাই বিষম যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল। কত সময় কত রকমে অপ্রস্তুত ও বিদ্রূপের কারণ হয়ে উঠতেন, তিনি তা বেশ বুঝতে

পারতেন; তবু সাহস করে তাঁর স্বামীর সাহেব-পূজায় বাধা দিতে কিম্বা নিজেকে বাদ দেওয়াতে পারতেন না। এক দিন বিকালে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে চা-পার্টী ছিল। সে দিন সকালেই তিনি ইংরেজী গ্রামারের একবচন ও বহুবচনের সমস্যা নিয়ে দুঘণ্টা ধরে গভর্নেসের কাছে কাটিয়েছিলেন। কিছুতেই তার নানা জটিল ব্যবস্থা তাঁর মাথায় ঢুকছিল না। অনেক কষ্টে শুধু এইটুকু মনে রইল যে, বহুবচন হলে তার শেষে "এস্" যোগ দিতে হয়। বিকালে চা-পার্টীর সময় হোষ্টেস্ হয়ে সকলকে অভ্যর্থনা করে চায়ের টেবিলের দিকে ডেকে আনতে হচ্ছিল ও সারি সারি চায়ের পেয়ালায় চা-চিনি দুধ মিশিয়ে হাতে হাতে "পাশ" করে দিতে হচ্ছিল। অন্যান্য দিনের মত বেশী ভাগ আলাপই তিনি করমর্দ্দন, শিরশ্চালনা good afternoon, how do you do করে সারছিলেন। গরমে ও লজ্জায় তাঁর সমস্ত নাক মুখ এক একবার রাঙ্গা হয়ে উঠছিল। কি জানি কেন, একবার সাহস করে দুটী চায়ের পেয়ালা দুটী ভদ্রমহিলার সামনে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, "Mrs. Jones, Mrs. Smith comes takes teas" ভদ্র মহিলাদুটীর ওষ্ঠকোণে ও নয়নের চাহনীতে যে অতি সামান্য একটু বিদ্রূপের হাসির রেখা পেলে গেল, সেটুকু তাঁর দৃষ্টি এড়াল না, তিনি বুঝতে পারলেন নিশ্চয় তিনি খুব ভুল করেছেন। লজ্জায় তাঁর দুই গাল ও কাণ লাল হয়ে উঠ্‌ল, মনে হোল চায়ের পেয়ালা ইত্যাদি সব ফেলে ছুটে চলে যান আপনার নিভৃত অন্তঃপুরের ছায়ায় আশ্রয় নিতে। তাঁর স্বামীর এ কি নিষ্ঠুর বিধি—এমন করে সং সাজিয়ে তাঁকে শত কৌতূহল-দৃষ্টির বিদ্রূপ-বাণের মধ্যে ফেলা। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার বা আপত্তি করবার তাঁর একটুও সাহস ছিল না।

মেয়েরা একটু বড় হলে জমীদার সাহেব একবার তাদের নিয়ে বিলাত যান। সেবার কিন্তু স্ত্রীর অনেক কান্নাকাটিতে তাঁকে দেশে রেখে যান। সেইখানে প্রতুলের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয় ও ছেলেটী সদ্বংশজাত ও লেখাপড়ায় এত ভাল ছিল যে, শীঘ্রই সে গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠবে বুঝতে পেরে তিনি তাঁর প্রথমা কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করে রাখেন। স্থির রইল যে, প্রতুল কাজ পেয়ে দেশে গেলেই বিবাহ হবে। তাই এ দেশে ফেরবার অল্প দিনের মধ্যেই প্রতুলের বিয়ে হলেও কালুরামের স্বপ্ন-কল্পিত টুকটুকে রাঙ্গাবৌ এসে আর প্রতুলের পার্শ্ব আলোকিত করেনি। প্রতুলের মারও বধূ নিয়ে ঘর করবার সাধ মেটেনি। কিন্তু চাটুর্য্যে মশাই সংসারী লোক,—তিনি আর প্রতুলের এই বিবাহে কিছু অমত করেননি। বিলাত-ফেরৎ আই-সি-এস ছেলের যে এই রকম আদব-কায়দা-জানা বড় মেয়ে না হলে চলবে না, তা তিনি বেশ জানতেন। তারপর শ্বশুর বড়লোক জমিদার, স্বজাতি,—তিনি এ বিবাহে আপত্তি করবার কিছু দেখলেন না।

বধূ যখন বিবাহের দুই দিন পরে দুই দিনের জন্য মাত্র এ গৃহে আগমন করে, তখন তার রূপের অভাব ও গর্ব্বিত ব্যবহার তার ধনী পিতার অজস্র বিবাহ-যৌতুকে ও তত্ত্বে ঢেকে দিয়েছিল। বধূ দেখে সকলেই—কি সুন্দর চুল—এই বলেই ক্ষান্ত ছিলেন। কারণ, রূপের মধ্যে বধূর চুলই কেবল খুব সুন্দর ছিল, অলকা নাম তার তাই বৃথা হয় নি।

প্রতুলের আপত্তি সত্ত্বেও মাতা কালুরামকে তার সঙ্গে দিয়াছেন। কিন্তু ভৃত্যবহুল প্রাসাদে তার কোন কার্য্যই নেই। খোকাবাবুর ঘরের দিক মাড়াবারও তার হুকুম নেই। তাকে অসভ্য পাড়াগাঁয়ে বলে অলকা মোটে দেখতে পারে না। সে যখন-তখন ময়লা কাপড় পরে, খালি গায়ে ঘরে ঢুকতে চায়। না জানে সভ্য বুলি, না জানে একটা কিছু কেতা-দোরস্ত জিনিস! Mr. Chatterji একটু মাথা ধরলে, "খোকাবাবু" "খোকাবাবু" করে অস্থির হয় কেন? কতবার শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে—"সাহেব" "মেমসাহেব" বলবি, তা কিছুতে সে তা মনে রাখবে না। সেদিন আয়াটার সামনে "বৌমা" "বৌমা" করে এসে উপস্থিত। আয়াটা যে কি ভাবলে, তার ঠিকানা নেই। Mrs. Ghose আর Miss Ray সে দিন মুখ-টেপা-টেপি করে কত হাসলেন। টেনিস খেলে এসে তাঁরা বারাণ্ডায় বসেছিলেন, খানসামা এসে "আইস লেমনেড' সার্ভ করছিল। তাঁরা বেবীকে একটু দেখতে চাইলেন। আয়াকে ডাকাতে সে perambulators শুদ্ধ যখন তাকে এনে হাজির করল, দেখা গেল, তার দুচোখ ভরা কাজল। সে তা হাত দিয়ে খুব রগড়েছে, আর তা মুখময় হয়ে গেছে ও সুন্দর মসলিন বেবীফ্রকটাতেও কতক লেগেছে। সকালে

ঠাণ্ডা লাগাতে সারা দিন ধরে তার চোখ দিয়ে একটু জল পড়ছিল। কথা ছিল, Dr. Birকে ডেকে একটু boric lotion দেবার। তার পর জানা গেল, কখন কর্পূরের কাজল করে কালুরাম তাকে পরিয়ে দিয়েছে। কোথাকার একটা সিদ্ধ শেকড় ছিল, ছেলেপিলের চোখের ব্যায়রাম না কি আরাম করে, সেটা মাদুলীর মত করে বেবীর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে, আয়ার কথা শোনেনি।

Mrs. Ghose একটু মুচকী হেসে বল্লেন, "তা বেশ হয়েছে। খালি ফ্রকটা এর সঙ্গে মানাচ্ছে না। কাপড় চোপড় সব খুলে ফেলে, ঘুন্সী পরিয়ে, পায়ে ডুগাছা মল দিয়ে দিন Mrs Chatterji—রক্ষা-কবচ তো গলাতেই আছে। আজকাল তো স্বদেশীর পাল্লায় এ সবের খাতির আবার হচ্ছে খুব।" রাগে, দুঃখে, লজ্জায় অলকা ফুলতে লাগল। এ অসভ্য বর্ব্বর চাকরটার জ্বালায় সে অস্থির। তবু স্বামী তো তার কথা শুনবেন না,—এ আপদকে বিদায় করতে চাইবেন না। বলচেন, অনেক দিনের পুরানো চাকর তাঁর, কোলে পিঠে করে' মানুষ করেছে; এখন এ বুড়ো বয়সে তাকে কি করে বিদায় দেন। বেশ তো, কটা টাকা পেনসেন হিসেবে ধরে দিলেই হয়। তারপর দেখা যাবে, কেমন সে তার সাধের খোকাবাবুকে ফেলে না যেতে চায়। এ সব লোকদের আবার বুঝি "হার্ট" থাকে; তারা খেতে পেলে, মাইনে পেলেই হোল।

কিছু দিন পরে "বেবী" দাঁতের একটা মাড়ী ফুলে ভারী কষ্ট পেতে লাগল। কখন জ্বর, কখন পেটের অসুখ, এই রকম একের পর এক অসুখ লেগেই রইল। ডাক্তার নানারকম ওষুধ দিতে লাগলেন; বল্লেন একটু difficult teething হচ্ছে, তাই কষ্ট পাচ্ছে, আর কয়েক দিন দেখে তিনি মাড়ীটা না হয় একটু চিরে দেবেন। বেবী সে ক-দিন যন্ত্রণায় অনবরত কান্নাকাটি করত। কালুর প্রাণে তা যেন সইত না। যদিও বেবীর কাছে তার আসবার বড় একটা হুকুম ছিল না, তবু সুযোগ পেলেই সে তাকে কোলে জড়িয়ে বুকে করে শান্ত করতে চাইত। বুক যে তার জুড়িয়ে যেত; মনে হোত, আবার তার ছোট খোকাবাবুটীকে সে যেন তার বুকের মধ্যে ফিরে পেয়েছে। এহেন খোকাবাবুর খোকাবাবুকে দিন দিন এ রকম ভাবে শুকিয়ে যেতে দেখে, বৃদ্ধের প্রাণ আশঙ্কায় ভরে উঠত। আহা, যদি কোথাও থেকে, মার পায়ের দুটো প্রসাদী ফুল ও একটু পাদোদক সংগ্রহ করে এনে সে খোকনকে দিতে পারত, তাহলে বুঝি বা সব অমঙ্গল তার কেটে যেত; কিন্তু বৌমা তো সে কথা কাণেই তুলবেন না। আর তিনি তো তার কোন কথাই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চান না। সে যে বড় বুড়ো হয়ে গেছে, এ দু'বছরের মধ্যে হঠাৎ সে বার্দ্ধক্যের পথে অগ্রসর হয়ে পড়েছে। আগেকার সে শক্তি সামর্থ্য তার কিছুই নেই। তা না হলে দু'দশ ক্রোশ হাঁটা তো তার কাছে কিছুই ছিল না, সেখানেই না একটা মার থান আছে সে শুনেছে।' বসে বসে অনেক কল্পনা-জল্পনা তার বৃদ্ধ মস্তিষ্কের ভেতর খেলে গেল। শেষ এক সংকল্পের আভায় মুখখানা তার উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

এক দিন সকাল-বেলা, ভার তৈলসিক্ত লাল গামছাটী বেশ ভাল করে মাথায় জড়িয়ে, একখানা অর্দ্ধময়লা মোটা চাদর কাঁধে ফেলে, তার মোটা বাঁশের লাঠীটা বগলে পুরে সে, যেখানে সাহেব মেম ছোটাহাজরী খাচ্ছিলেন, সেখানে এসে এক মস্ত সেলাম ঠুকিল। ইদানীং অলকার অনেক তাড়নায় ও শিক্ষায় সে সেলামটুকু করতে শিখেছিল; কিন্তু "সাহেব" "মেমসাহেব" বুলি কিছুতে গলা দিয়ে তার বার হোত না। বরঞ্চ খোকাবাবু বড় হয়েছে, এখন তাকে "দাদাবাবু" সে বলতে শিখতে চেষ্টা করতে পারে। আর "বৌমা" বুলীটি কেমন মিষ্টি, কেন যে বৌমার তা ভাল লাগে না, কিছুতে সে তা বুঝতে পারে না। অলকা তো তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই নাসিকা কুঞ্চিত করে উঠল,—কি একটা বেয়াড়া কাণ্ড না করে বসে। সেলাম ঠুকে সে যখন জানালে, একটী দিনের ছুটী সে চায়, তখন অলকা অনায়াসে বল্লে "আচ্ছা যাও।" ভারী তো কাজ—শুধু যত বিপত্তি করে বেড়ায়,—তার আবার ছুটী নেওয়াতে কি এসে যায়! প্রতুল শুধু একটু জিজ্ঞেস করল "কোথায় যেতে চাসরে কালু?" "এই একটু দরকার আছে, আজ্ঞে"—বলে আর একটা মস্ত সেলাম ঠুকে সে বার হয়ে চলে গেল।

ক'দিনের অসহ্য গরমের পর সেদিন সন্ধ্যা নাগাত আকাশটার কোণে বেশ খানিকটা মেঘ জমে এসেছে। বেবী সেদিনও সারাদিন বড় অস্থির ছিল। বিকাল বেলায় বাগানের ছায়ায় ঠেলা-গাড়ীতে ঘোরাতে ঘোরাতে অনেক

কষ্টে তাকে ঘুম পাড়িয়ে তার দোলা-খাটটীতে শুইয়ে দিয়ে, পাশের বারাণ্ডার দিক দিয়ে একটা গুদোমে গিয়ে আয়া পানীওয়ালার সঙ্গে একটু ইয়াকীর চেষ্টায় ছিল। ড্রয়ীং রুমে টেনিসের পর পূরাদমে "ব্রীজে"র আড্ডা চলেছে। আকাশে এ হেন ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত ভীষণ মেঘের সঞ্চার দেখে, "ব্রীজের" মায়া ত্যাগ করে, যে যার টমটম, বগী, মোটর আনবার অর্ডার করে উঠবার চেষ্টা করছে। Mrs. Chatterji সকলকে সমান ভাবে তাঁর হাসি ও মনোযোগ বিতরণ করে, আপ্যায়িত করে বিদায় দিচ্ছেন।

যে যার চলে যাবার পর, তিনি পিয়ানো প্র্যাকটিস করতে বসবার আগে, বেবীর ঘরে উঁকি মেরে দেখতে গেলেন যে, সে কেমন ঘুমুচ্ছে, পিয়ানোর আয়োয়াজে জেগে উঠবে কি না। প্রতুল মুখে একটা সিগারেট দিয়ে কালকের একটা খুব জরুরী কেসের নথী দেখবার জন্যে অফিষ-রুমে চলে গেল।

ঘরে ঢুকে এক কোণে বাতির আলোতে প্রথমে অলকা কিছুই দেখতে পেলে না। তার পরে মনে হোল, বাথরুমের খোলা দরজাটার দিকে পেছন করে একটা দীর্ঘ কালো ছায়া বেবীর খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি জানি কি করছে। হঠাৎ এ রকম দেখে সে ভয়ে খুব চীৎকার করে উঠল। তার সে চীৎকারে এক সঙ্গে বেহারা, খানসামা, আয়া এমন কি প্রতুলও "কেয়া হুয়া" "কেয়া হুয়া" করে বেড-রুমের দিকে দৌড়ে এল। দেখা গেল ক্লান্ত শ্রান্ত চেহারা, সারাদিনের পথশ্রমে ধূলি-ধূসরিত কালুরাম ভয় পেয়ে নিতান্ত দীন-হীন অপরাধীর ন্যায় আস্তে আস্তে স্নানের ঘরের পথ দিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছে। তার এক হাতে একটা পাতার ঠোঙ্গায় গুটীকত প্রসাদী ফুল ও একটা ছোট ভাঁড়ে একটু পাদোদক। অন্তর তার বলছিল মায়ের প্রসাদী ফুল একটু খোকনের কপালে ছুঁইয়ে দিলে ও একটু পাদোদক খাইয়ে দিলেই অসুখ তার আরাম হয়ে যাবে; কিন্তু রূঢ় অভিজ্ঞতা তাকে জানিয়ে দিয়েছিল, কত সাবধানে তাকে তা করতে হবে। তাই তার মন কিছু অন্যায় করছে বলে না জানলেও, ধরা পড়ার ভয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ফিরে এসে চোরের মত সে খোকনের ঘরে ঢুকে সুযোগ বুঝে শুধু একটী প্রসাদী ফুল তার কপালে ঠেকিয়ে তার বিছানার নীচে গুঁজে রাখছিল; আর ভয়ে ভয়ে শুধু একটু আঙ্গুল ডুবিয়ে এক ফোটা পাদোদক তার ঠোঁটের কোণে ছুঁইয়ে দিচ্ছিল। এর বেশী সে আর কিছু করেনি। ধরা পড়ে লজ্জায় ভয়ে বৃদ্ধ বেতস-পত্রের ন্যায় কাঁপতে লাগল।

অলকার ততক্ষণে চোরের ভয় চলে গিয়েছে। যখন দেখলে এ শুধু কালুরাম ও তার কীর্ত্তি, তখন সে খুব বিরক্ত হয়ে উঠল। স্বামীকে জানাল এ হেন lunaticকে রাখলে বেবীর প্রাণটা কোন্ দিন সংশয় হয়ে উঠবে; কারণ তারই ওপর এর যত বেশী চোট দেখা যায়। কালই একে বিদায় করে দেওয়া উচিত। বেবীরও শরীর খারাবের সময় কোথাকার ময়লা জল এনে যদি সে খাওয়াতে থাকে ও germওয়ালা পচা ফুল শুঁকোতে থাকে, তাহলে কি যে একটা ভয়ঙ্কর অসুখ ধরে যাবে, তার জন্যে দায়ী হবে কে তখন? প্রতুলেরও তাই মনে হতে লাগল।

সে কালুকে তো তার এ কাণ্ডর জন্যে খুব খানিক বকাবকি করল। নীরবে কালু তা সব শুনে গেল। কিন্তু যখন তাকে বিদায় দেবার কথা উঠল, তখন মাটীতে বসে পড়ে সে বালকের মত কেঁদে উঠল ও তার ভগ্ন জড়িত কণ্ঠে বারবার শপথ করে জানাল, এমন কাজ সে আর কখন করবে না, খোকামণির ত্রিসীমানায় আসবে না। কিন্তু তার বাঁচনের এ কয়টা দিন যেন তার খোকাবাবু ও খোকনের মুখ চেয়ে থাকতে দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা না হয়।

কিন্তু এবার প্রতুল ও অলকার সংকল্প অটল রইল। ডিনারের পর কালুরামকে তারা চাপরাশী দিয়ে ডেকে পাঠাল। বিচারপ্রার্থী অপরাধীর মত কাঁপতে কাঁপতে সে এসে উপস্থিত হোল। কাঁদতে কাঁদতে তার কোটরগত চোখ দুটী জবা ফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে, রগের শিরাগুলি আরো যেন ফুলে গিয়েছে: সেই ভোরে পাঁচ ক্রোশ পথ না খেয়ে অতিক্রম করে গিয়েছিল। উপোসী থেকে প্রসাদ আনলে বেশী উপকার হবে বলে, সারাদিন সে জল-স্পর্শও করেনি। আবার রৌদ্র থাকতেই ধূলো বালিতে তার স্বল্পশক্তি, শীর্ণ দেহ ঠেলে পাঁচ ক্রোশ পথ ফিরে এসেছে। এসে অবধি এখন পর্য্যন্ত মুখে হাতে জল পর্য্যন্ত দেয় নি, এক ফোঁটা জল কি আহার্য্য পেটে পড়া তো দূরের কথা;—সে কথা তার মনেই ছিল না, শুধু

দণ্ডাজ্ঞার ভয়ে জোড়হস্তে কাঁপতে কাঁপতে সে এসে প্রতুলের সামনে দাঁড়াল।

প্রতুল হিসেব করে তার মাইনের পাঁচ টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা ও মাস মাস পেনসেন হিসাবে আরো পাঁচ টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, কালকের বিকেলের গাড়ীতে টিকিট করে চাপরাশী তাকে দেশের গাড়ীতে তুলে দেবে। সে ছেলেবেলা থেকে তাদের জন্য অনেক খেটেছে। সেজন্যে তার প্রভুভক্তির কথা স্মরণ করে, যাতে সে বৃদ্ধ বয়সে একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, সেজন্যে মাস মাস এ পেনসনটা তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ফাঁসীর আজ্ঞা-প্রাপ্ত আসামীর মত সমস্ত মুখখানা তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে সে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল। মনে হতে লাগল যেন টাকা কটা তাদের সাদা রূপালী দাঁত কটা বার করে তাকে কামড়াতে আসছে। ক্রন্দনের ঝাঁকানিতে সমস্ত প্রাণটা তার যেন অস্থি, কঙ্কাল, পঞ্জর ভেদ করে কেঁপে কেঁপে বার হয়ে আসতে লাগল। কিছুতেই সে নিজেকে যেন সামলাতে পারছিল না। কেঁদে কেঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে টাকা কটা প্রতুলের পায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে, বলতে লাগল, টাকার তার দরকার কি? কোন রকমে একপেট ভাত তার জুটে যাবে দিনান্তে। মা ঠাকরুণের কাছে থাকলেও এক কোণায় সে পড়ে থাকতে পারবে। কিন্তু তার খোকাবাবুর দর্শন-সুখের স্বর্গ থেকে বিদায় করে দিলে কি নিয়ে কি করে সে বেঁচে থাকবে?

ক্রন্দনের বেগ তার বেড়ে যেতে লাগল, সমস্ত ক্ষীণ দেহযষ্টি ঝড়ের মুখে বাঁশগাছের মত কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। কিছুতেই নিজেকে সে সামলাতে পারছিল না। বাড়ীর সব চাকর-বাকর, খানসামা, বাবুর্চ্চি মজা দেখবার জন্যে বারাণ্ডায় এসে জড় হোল। এহেন scene অলকার একেবারেই পছন্দ হোল না, এতে অন্য চাকরদেরও যে স্পর্দ্ধা বেড়ে যায়। সে চাপরাশীকে হুকুম দিল, কালুকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। চাপরাশী এসে তাকে দুহাতে ঠেলতে ঠেলতে চাকরদের গুদামের দিকে নিয়ে চল্ল।

এমন সময় অনেকক্ষণের ঘনীভূত মেঘ ঝড় ও বৃষ্টি রূপে মুসলধারে নেমে এলো। সারারাত তার দাপট চল্ল।

সকালের দিকে বৃষ্টি একেবারে ধরে গিয়েছে। প্রতুল যখন তার ড্রেসিংরুমে বসে shave করছে, এমন সময় বেহারা এসে বল্ল, গুদোমে কালুরাম জ্বর হয়ে অজ্ঞানের মত পড়ে আছে; ঠিক সেই সময় অলকাও খবরের কাগজ হাতে ঘরে ঢুকে তা শুনতে পেলে। পেয়ে বল্লে "সর্ব্বনাশ! চারিদিকে যা influenza হচ্ছে, তাই না আবার কাল সে যত সব dirty native quarters থেকে নিয়ে এলো! এবার সকলকে না infect করে বেড়ায়।" প্রতুল সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে একমনে দাড়ী কামানো শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও বেহারাকে বল্ল ড্রেসিং গাউনটা এগিয়ে দিতে। ড্রেসিং গাউনটা পরে সে বারাণ্ডা দিয়ে নেমে গুদোমের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখতে গেল ব্যাপারখানা কি। অলকাও eucalyptusএর শিশি হাতে, তাঁর হাঁটুর কাছে সাড়ীখানা তুলে, যেন influenza পোকা মাটী থেকে লাফিয়ে লাফিয়েই তার সাড়ীতে উঠবে,—প্রতুলের পিছু পিছু গিয়ে খানিকটা ওষুধ তার রুমালে ঢেলে দিয়ে বল্লে "তুমি গিয়ে শেষ একটা infection নেবে দেখছি, হাঁসপাতালের গাড়ী ডেকে এখুনি একে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত কর। জমাদারকে ডাকিয়ে ফেনিল টেনিল দিয়ে আমিও ঘরটা ধোবার বন্দোবস্ত করি গে।"

প্রতুল গিয়ে দেখল ঘরের কোণে একটা ছেঁড়া মাদুরে জ্বরের ঘোরে কালু বিষম ধুঁকছে। হঠাৎ পদশব্দ শুনে জ্বরারক্ত চোখ দুটী মেলেই প্রতুলকে তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, সমস্ত শীর্ণ মুখখানা তার হাসির আভায় ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তার পরেই চাপরাশীকে ডেকে তাকে হাঁসপাতাল পাঠাবার ব্যবস্থার হুকুম শুনতে পেয়ে, সমস্ত প্রাণখানা তার ভয়ে এতোটুকু হয়ে গেল, কিছু প্রতিবাদ করবার আর তার সাহস বা শক্তি রইল না।

কিছুক্ষণ পরে বাগানের উড়ে মালীটা এসে দয়াপরবশ হয়ে তাকে এক ঘটী জল দিয়ে গেল; সারারাত পাশের গুদোমে শুয়ে সে "জল" "জল" চীৎকারই শুনেছে কি না। তাকে আসতে দেখে কালু ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল; বল্ল "ভাইরা, দয়া করে তোর সাহেব মেমসাহেবকে বল গিয়ে, এবেলাটা আমার থাকতে দিতে। তার পর একটা

গরুর গাড়ী করে আমায় কোন রকমে ষ্টেশনে গাড়ীতে তুলে দিতে পারবি না রে? এখনও তিনটে টাকা আমার জমান, কোঁচার খুঁটে বাঁধা আছে, যদিও দুটো কাল কালীর থানে প্রসাদী খরচ হয়েছে।" কোন রকমে মা-ঠাকরুণের কাছে গিয়ে পড়তে পারলে এ হাঁসপাতাল থেকে যে উদ্ধার পায়! ছেলেবেলা থেকে যে হাঁস-পাতালের নামে তার প্রাণটা ভয়ে উড়ে যায়। মনে পড়ে গেল, একবার তার ওলাউঠার মত হয়েছিল; তখন মা-ঠাকরুণ নিজে এসে তাকে ওষুধ আর পথ্য দিয়ে যেতেন। তিনি যেন সাক্ষাৎ ভগবতী ছিলেন, তাই কোন অমঙ্গলই তাকে স্পর্শ করত না।

মালীটার কালুর দুঃখে বড় সহানুভূতি হয়েছিল। তাছাড়া সেও তো জানে, হাঁস্পাতাল জিনিসটার আতঙ্ক মানুষের প্রাণকে কেমন করে শুকিয়ে দেয়। তাই সাহসে ভর করে সে তার প্রস্তাব মেমসাহেবকে গিয়ে বল্ল। তাতে এমন তাড়া খেল যে দ্বিতীয়বার বলবার আর সাহস হোল না। এ সব ছোঁয়াচে রুগী যত শীঘ্র পারা যায় সরিয়ে ফেলা উচিত, একে আবার বিকেল পর্য্যন্ত রেখে কি বাড়ীতে বীজ ছড়িয়ে বেড়াতে দেবে!

দুঘণ্টার মধ্যেই হাঁস্পাতালের লোক এসে কালুকে নিয়ে গেল। একটী আপত্তি-বাক্যও সে উচ্চারণ করল না। ভেতরটা যদিও তার ভয়ে কাঠের মত হয়ে গিয়েছিল, তার দুচোক গড়িয়ে জলের ধারা বাধা মানছিল না, শুধু গাড়ীতে ওঠবার সময় একবার ব্যাকুলভাবে সে যেন কার জন্যে এধার-ওধার তাকিয়ে দেখল। কিন্তু যে বাঞ্ছিত মুখখানার আশায় তার তৃষিত চোখ দুটো ঘুরে বেড়াল, তার কোন চিহ্নই কোথাও সে দেখতে পেলে না। প্রতুল কোর্টে যাবার আগে তখন স্নানে ঢুকেছিল। অলকা শুধু হাঁস্পাতালের ডাক্তারের হাতে একটা চিঠি দেবার জন্যে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে চাপরাশীকে ডাকছিল!

কোর্ট থেকে ফিরে এসে কি জানি কেন, প্রতুলের মন সেদিন বড় ভারী ভারী হয়েছিল। মাথা ধরার ছুতো করে সে Mr. Ghoseদের বাড়ী tennis partyতে গেল না, শুধু অলকাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। একটা মেঠো রাস্তা ধরে টমটম হাঁকিয়ে অনেকক্ষণ সে ঘুরতে লাগল। গলার কাছে কি একটা ব্যথা যেন তার মাঝে মাঝে চেপে ধরছিল, মনটাও অনর্থক ভারা অবসন্ন হয়ে পড়ছিল।

বাড়ীতে ডিনারে বসে ও রাত্রে শোবার সময় অলকা দেখলে স্বামী অস্বাভাবিক রকম কেমন না জানি গম্ভীর হয়ে রয়েছেন। দুএকটা প্রসঙ্গ পাড়বার চেষ্টা করে কোন উত্তর না পেয়ে শেষ সে ম্যাগাজিন নিয়ে পড়তে বসল। প্রতুল ও মাথাধরা বলে শীঘ্র শুতে চলে গেল।

তার পরদিন রবিবার। বেশ একটু দেরী করে প্রতুল সেদিন উঠল, কারণ রাত্রে তার ভালো ঘুম হয় নি। তার পর উঠেই সে ড্রেসিং রুমের দিকে চলে গেল। এদিকে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে অলকা খাবার ঘরে বসেই আছে; খানিক পরে শুনতে পেলে প্রতুল সেই ঘর থেকেই টমটম তৈয়ের করবার হুকুম দিচ্ছে। খানিক পরে বাইরে যাবার পোষাক পরে হ্যাট হস্তে সে খাবার ঘরে ঢুকল ও অলকাকে বল্ল, শীগগীর এক পেয়েলা চা ঢেলে দিতে। অলকা ডিম ও টোষ্ট ইত্যাদির প্লেট এগিয়ে দিয়ে বল্ল "আর কিছু খাবেনা!" প্রতুল বল্ল তার ক্ষিধে নেই। চায়ের পেয়ালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুমুক দিয়েই, অলকার সঙ্গে বিশেষ কিছু কথা না বলেই, সে বারাণ্ডার দিকে গাড়ীর কাছে অগ্রসর হোল। স্বামীর এরকম অদ্ভুত ভাব দেখে চেয়ার ঠেলে অলকাও উঠে তার সঙ্গে সঙ্গে বারাণ্ডায় এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, না খেয়ে দেয়ে সে কোথায় এমন ব্যস্তভাবে যাচ্ছে। হাতের glovesএর বোতাম আঁটতে আঁটতে প্রতুল বল্ল "হাঁসপাতাল"।

"হাঁসপাতাল? ওঃ, কালুরামকে দেখতে বুঝি? এরকম করে infectious disease কি দেখতে যাওয়া তোমার উচিত, বাড়ীতে বিশেষতঃ যখন ছোট বেবী রয়েছে?" প্রতুল কিছু উত্তর না দিয়ে এমন গম্ভীর ভাবে তার দিকে তাকাল যে, দ্বিতীয় কথাটী বলবার আর অলকার সাহস হোল না। স্বামীর এ রকম অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য ভাব কখন সে আগে দেখেনি!

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সকালেই হঠাৎ টমটম হাঁকিয়ে হাঁস্পাতালের দিকে আসতে দেখে সকলেই একটু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠল। সেখানকার ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি বারাণ্ডায় বেরিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নামিয়ে আনলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব

শুধু অন্যমনস্ক ভাবে "হাঁ না" উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। খানিকক্ষণ পরে অতিকষ্টে শুকনো দুটো ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কালকের লোকটী যাকে তাঁর চাপরাশী দিয়ে গিয়েছিল, সে কোন্ ঘরে আছে, তাঁকে তিনি একটু দেখতে চান।

ডাক্তারবাবু প্রতুলের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ নীরব রইলেন; তার পর আস্তে আস্তে বল্লেন যে, "সে caseটা মোটেই যদিও influenza ছিল না, তবু old stageএর heat খারাপ থাকাতে কোনরকম বিশেষ মানসিক উত্তেজনায় প্রথম থেকেই তার শরীরে অবসাদের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। জ্বরও তেমন বিশেষ ছিল না; কিন্তু আজ ভোর রাত্রে জ্বর বিরামের সঙ্গে সঙ্গে heart fail করে সে মারা গেছে।" ডাক্তার বাবু দেখতে পেলেন, তাঁর কথা শুনে কখন চেয়ার ছেড়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন। টেবিল চেপে দুহাতে যে দাঁড়িয়ে আছেন, সে হাত দুখানি থরথর করে কাঁপছে ও মুখ একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় ভরে উঠেছে। তাড়াতাড়ি নিজে থেকেই একটা কুঁজো থেকে জল ঢেলে তিনি তাঁর সামনে ধরলেন। গেলাসটা কম্পমান হস্তে অনেক কষ্টে ধরে এক নিঃশ্বাসেই প্রতুল তা খেয়ে ফেল্ল ও ডাক্তার বাবুকে বল্ল কোন্ ঘরে তার শবদেহ রাখা হয়েছে, সেখানে তাকে নিয়ে যেতে।

ওয়ার্ডগুলির সামনে দিয়ে সমস্ত বারাণ্ডাটা পার হয়ে একটা ছোট ঘরে পথ দেখিয়ে ডাক্তার বাবু তাঁকে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটা খাটিয়ার ওপর একখানা অর্দ্ধ-ময়লা চাদর ঢাকা কালুরামের পার্থিব জীবনের শীর্ণ অবশিষ্টটুকু পড়ে ছিল। শ্রান্ত বৃদ্ধ যেন এতদিন পরে আরামে নিদ্রা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ তার পাশে নীরবে গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ ছোট বালকের মত হাঁটু গেড়ে নদীয়া জেলার এতবড় সবডিভিসানাল অফিসার তাঁর সব prestige ভুলে গিয়ে সে ময়লা কাপড় ঢাকা মুখের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে লাগলেন। ডাক্তার বাবু এ দৃশ্য দেখতে ও বুঝতে না পেরেও, তা কুতূহলী চোখের থেকে আড়াল করবার জন্য পরদাখানা ভাল করে টেনে দিলেন; নিজেও পিছু ফিরে সরে দাঁড়ালেন। ভগ্ন প্রাণের পঞ্জর-ভেদী দীর্ঘশ্বাসের সাথে মধ্যে মধ্যে এক-একবার অস্পষ্ট স্বরে শুনতে পেলেন "ও কালুদাদা, কালুদাদা গো।"

দ্বারকা

অধ্যাপক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

আমরা যখন মার্চ্চ মাসে বরোদায়, তখন সেখানে খুব গরম। দিনে বাড়ীর বাহির হওয়া দুষ্কর; বেলা ৫টার পূর্ব্বে গরমে ত্রাহি মধুসূদন করিতে হয়। দ্বারকা যাওয়ার প্রস্তাবে, দিনে ভ্রমণ বাদ দিয়া রাত্রের গাড়ীতে যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। সুতরাং 'টাইম টেবিল' দেখিয়া দেখিয়া বিকালের ৫টার ট্রেণ ছাড়া আর কোন সুবিধামত গাড়ী পাইলাম না। উহাতেই দ্বারকায় 'থ্রু' টিকিট লইয়া বসা গেল। গাড়ীতে তেমন ভিড় ছিল না। ক্রমে যখন গাড়ী আমেদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ষ্টেশনে ষ্টেশনে লোকের নামা-উঠা বাড়িতে লাগিল। গম্ভীর কর্ম্মব্যস্ত ভাটিয়া ব্যবসাদারগণ তাঁহাদের পরদাবিহীনা সুন্দরী স্ত্রীগণকে লইয়া নিঃসঙ্কোচে আমাদের নিকটে বসিতে লাগিলেন। ইহাতে হয় ত আমাদের মহিলাগণ স্বজাতীয়াগণের এইরূপ স্বাভাবিক স্বাধীনতা দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিতেছিলেন! পরে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে, এ দেশ-রীতি তাহাদের নবীন নহে, বহু শতাব্দী হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে। বরং আমাদের স্ত্রীলোকগণের জড়সড় ভাব ও অবগুণ্ঠন দেখিয়া তাঁহারা কৌতুক অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু ঐ গুজরাটি সুবেশা মহিলাগণ আপনাদের জিনিসপত্র, বিছানা, এমন কি ছোট তোরঙ্গ পর্য্যন্ত নিজে রেল হইতে বহিয়া লইয়া যাইতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। এক দিকে রূপ, সুচিক্কণ বহুমূল্য সাড়ীও উৎকৃষ্ট রুচির পরিচায়ক অলঙ্কার, আবার আর এক দিকে মাথায় ছোট ছোট ট্রাঙ্ক। আমি ইহার সামঞ্জস্য করিতে অসমর্থ। আমাদের সহযাত্রিণী একটী বাঙ্গালী মহিলা বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, এ আবার কি!"

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ৮টায় আমেদাবাদে পৌঁছিলাম। প্রকাণ্ড ষ্টেশন, বহু ফিরিওয়ালা ফল, পান্, সিগারেট্ চা লইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এ দেশে ও বোম্বাইতে লোকের চা খাইবার প্রবৃত্তি নেশার সমকক্ষ। পিতলের ছোট বাটিতে রেকাবীর উপর বসাইয়া চা-বিক্রেতা বলিতে লাগিল, "বামুনিয়া চা" "লেও বামুনিয়া চা"। ত বড় বড় ষ্টেশনে গিয়াছি,—ঐ এক প্রথা। মুসলমান

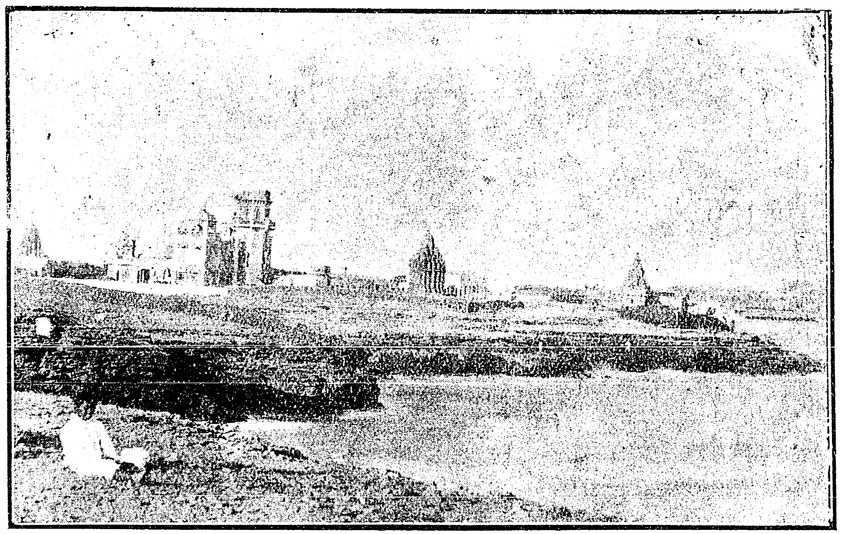

সমুদ্রতীর—দ্বারকা

চা-ওয়ালার কোন বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক শব্দ শুনিতে পাই নাই। আমেদাবাদের দুই ষ্টেশন পূর্ব্বে কয়েকটি যুবক আমাদের কামরায় উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা কথায়-বার্ত্তায় খুব ভদ্র। মহাত্মা গান্ধীর কথা তুলিলেন। তাঁহারা রেল হইতে দূরে সাবর্ণমতীর ধারে গান্ধীজির আশ্রম দেখাইলেন। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলাম না।

বিরমগাম্ জংসন ষ্টেশনে আমাদিগকে গাড়ী বদলাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীতে বসিতে হইল। গাড়ীতে বেশ স্থান ছিল, অতএব রাত্রিটা সুনিদ্রায় কাটাইয়া ভোর ৬টায় দেখি, গাড়ী মরুভূমি প্রদেশের উপর দিয়া

চলিতেছে। এখন যে প্রদেশ দিয়া আমরা যাইতেছি, তাহা কাঠিওয়াড়। কোন ষ্টেশনে জল পাওয়া যায় না। ষ্টেশনে কেন, লোকালয়েও জলের জন্য হাহাকার। যদিও বা কোন ষ্টেশনে জল পাওয়া গেল, তবে একটী ছোট লোটা ভরিতে দুই পয়সা দিতে হইল!

বেলা ১০টার সময়ে রাজকোট্ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সেখানে আবার গাড়ী বদলাইতে হইবে। ঘণ্টা দেড়েক সময় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে আমরা স্নান সারিয়া যথাপ্রাপ্য কিছু জলযোগ করিয়া লইলাম। ইতিমধ্যে আমাদের একটী সহৃদয় বাঙ্গালী সহযাত্রী (পরে বন্ধু) জুটিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে গল্পে আলাপে ভ্রমণটী আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পুনরায় আমরা গাড়ীতে বসিলাম। এবার দিনে ভ্রমণ। ভীষণ গরম, কিন্তু উপায় নাই। মাঝে মাঝে তরমুজা, কমলা লেবু খাইয়া তৃষ্ণা ও গরম দূর করিতে লাগিলাম পথের দৃশ্য নূতন রকমের। মাঝে মাঝে কঙ্করপূর্ণ জমি, বেশীর ভাগ ধূধূ মরুভূমি। পালে পালে হরিণ দেখা যাইতে লাগিল। তাহারা সূর্য্য-কিরণে ও বালির রংএর প্রতিবিম্বে একেবারে স্বর্ণ-মৃগের মতই দেখাইতেছিল। রেলপথের দো-ধারি কত যে হরিণ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, তাহার সংখ্যা করিতে পারি নাই। তাহার পর একটী দৃশ্য জীবনে প্রথম দেখিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, দূরে প্রকাণ্ড একটী জলাশয়। অন্যান্য যাত্রীগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কোন্ নদী?" তাহারা উত্তর করিল, "এ একটী মায়া।" প্রথমে বিশ্বাস করি নাই। পরে আবার তাহা অদৃশ্য হইল। তখন মনে হইল, এই বুঝি—"মরীচিকা, মৃগতৃষ্ণা"। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, (এখন অনুভব করি) "মৃগ তৃষ্ণাং সমং বীক্ষ সংসারং

ক্ষণভঙ্গুরং।” মৃগগণও তৃষ্ণার্থ হইয়া প্রকৃতির মায়ায় পড়িয়া ঐ অলীক জলাশয়ের দিকে ছুটে, পরে আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারে। কিন্তু এ ভ্রমে পুনঃ পুনঃ পড়ে, এ মায়ার ফাঁদ হইতে যে জন্মেও তাহাদের উদ্ধার নাই! মনে পড়িল (গজনীর) দুর্দ্দান্ত সোলতান মামুদ এক দিন এই মায়াজালে পড়িয়া এক ফোঁটা জলের জন্য কাতরকণ্ঠে জানু পাতিয়া দুনিয়ার মালিক খোদাতালার কছে এই মরুভূমিতে প্রার্থনা করিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তখন এক মরীচিকা সত্যই জলাশয় রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল! জগতেও ইহা ঘটে। যেখানে সত্য বিশ্বাস আছে, যেখানে প্রকৃত প্রার্থনা আছে, সেখানে আর একটী অলৌকিক লোক ফুটিয়া উঠে। এই মামুদ অব্-গজনী প্রভাসের নিকটবর্ত্তী সোমনাথ শিবকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ধনরত্নাদি দস্যুর মত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেখানকার পাণ্ডারা তখনও আত্মকলহে মগ্ন,—তাহাদের না ছিল বলবীর্য্য, না ছিল একতা, না ছিল ভগবানে ঐকান্তিক পূর্ণ বিশ্বাস। ভগবানের নিকটে, মহাদেবের নিকটে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ নাই, সুতরাং ন্যায় বিচারই হইয়াছে, বলিতে হইবে। ট্রেণ তখন মরুভূমির উপর দিয়া ছুটিতেছে। এক একটী স্থানে এত জলের অভাব যে, নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা পুত্র-কন্যার মাথায় কলসী দিয়া এঞ্জিনের নিকট জল লইতে ছুটিয়া আসে। এঞ্জিন-চালকেরা দয়া করিয়া এঞ্জিনের ট্যাঙ্ক হইতে কিছু কিছু জল উহাদের দেয়। দূর হইতে একদল ছুটিয়া আসিতেছে, কিন্তু ট্রেণ ছাড়িল দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল। এই দৃশ্য বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, দেখিয়া চোখের জল রাখা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছিল।

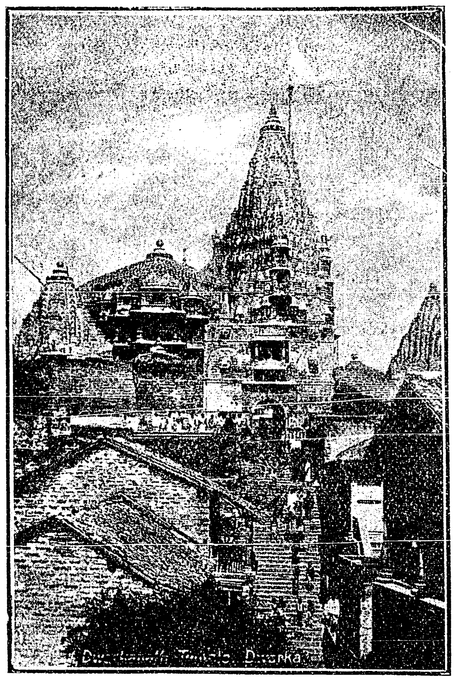

দ্বারকানাথের মন্দির

এই পথের ষ্টেশনগুলি অতি দরিদ্র। এখানে অন্য কোন জিনিস পাওয়া যায় না; তবে প্রায়ই উৎকৃষ্ট খোয়ার ক্ষীরে প্রস্তুত বড় বড় পেঁড়া পাওয়া যাইতে লাগিল। বেলা আন্দাজ দুইটার সময়ে জামনগরে উপস্থিত হইলাম। এইখানে আমরা বিশ্রাম ও নগর দেখার উদ্দেশ্যে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাদের সহযাত্রীগণ সটান্ দ্বারকা চলিলেন। ষ্টেশনটি ছোট, রেল হইতে দেখিলাম, সহর বড় বড় অট্টালিকায় পরিপূর্ণ। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একখানি বড় টাঙ্গা (১) ভাড়া করিয়া অগ্রসর হওয়া গেল। ষ্টেশনের হাতার বাহিরে আসিবামাত্র অতি অসভ্য চুঙ্গীর লোকেরা বড়ই উপদ্রব করিল। “তামাক পাতা আছে কি না” “পাণ আছ কি না”, আর অসভ্য কর্কশ ভাষা! অবশেষে আমাকে পুলিসের আশ্রয় লইয়া ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইয়াছিল। জামনগরের লোকগুলি একটু রুক্ষ প্রকৃতির, দেখিতে পাইলাম। ষ্টেশনের নিকটেই দুই তিনটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধর্ম্মশালা আছে। আমরা পশ্চিম দিকের ধর্ম্মশালার একটি কামরায় আশ্রয় লইলাম। সেখানেও সেই জল-কষ্ট। আমাদের সঙ্গে চাকর ছিল। প্রথমে জল কিনিতে হইয়াছিল, পরে আর কষ্ট হয় নাই। কিন্তু কুয়াতে জল নাই বলিলেই হয়। জামনগর সহর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিদ্যুতের আলো আছে। ট্রাম্‌গাড়ী আছে। বাজারের কাছ দিয়া একটী বৃত্তাকার রাস্তা

(১) গুজরাটের ন্যায় টাঙ্গা আর কোথাও দেখি নাই। গাড়ীগুলি বড়ই আরামদায়ক। অনেকটা বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ীর মত। ভিতরে ৪ জন বাহিরে কোচ্-মানের নিকট একজন বসা যায়; প্রায় গাড়ীতেই রবার ও ঘণ্টা দেওয়া।

গিয়াছে; তাহার দুই পাশে নানা রকম দোকান-পসার। শাক-সব্‌জির বাজারও বেশ বড়। একটী জৈন মন্দির আছে; স্থাপত্য-শিল্পে সেটী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটী দেখিবার জিনিস। পরদিন সকালে একখানি টাঙ্গা ভাড়া করিয়া মহারাজের প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। ষ্টেশন বা ধর্ম্মশালা হইতে রাজপ্রাসাদ ১ মাইল দূরে হইবে। প্রাসাদের প্রহরীগণ অতি অসভ্য। মোটা-মুটি প্যালেস্ দেখা গেল। চিত্র-সংগ্রহ খুব মূল্যবান্। মহারাজা খুব শিল্প-প্রিয়, তাই শিল্প-সংগ্রহে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। জামনগরের ২॥০ মাইল দূরেই সমুদ্র। দ্বারকা যাইতেছি বলিয়া আর সেখানে যাই নাই।

তৎপরদিন বেলা দুই-টার সময় পুনরায় সেই ট্রেণে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গাড়ী আবার অর্দ্ধমরুভূমি দিয়া ছুটিল। পথে “খাম্বালিয়া” নামক ষ্টেশনটী বিখ্যাত। এই স্থানটী অর্থশালী ভাটিয়ায় পূর্ণ। এক একজন ভাটিয়া স্ত্রী-পরিবার লইয়া গাড়ীতে উঠিতে লাগিল, আর তাহাদের দেহস্থিত অলঙ্কারে বুঝাইয়া দিতে লাগিল, যে তাহারা কত সমৃদ্ধিশালী। প্রকৃতই এ দেশ-গুলি লক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন!

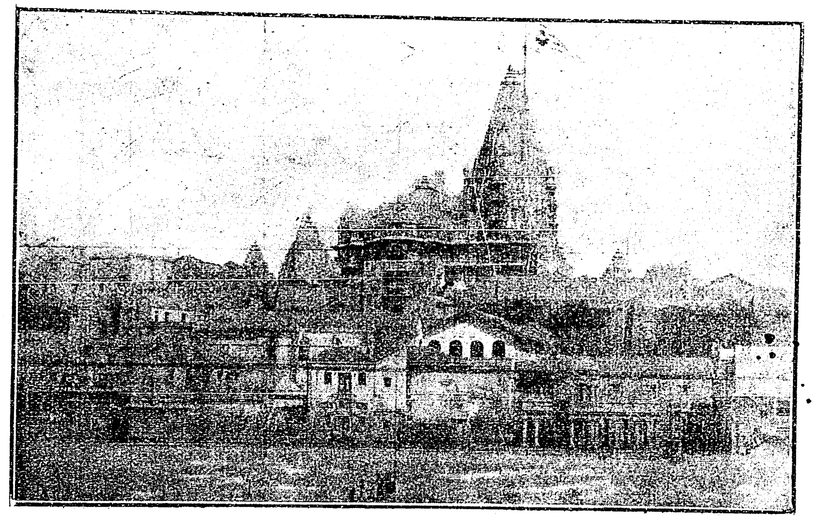

গোমতীতীরস্থ মন্দির

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তখন প্রায় ৮ টা। এ প্রদেশে এইরূপ বরাবরই লক্ষ্য করিয়াছি; কারণ ইহা ভারতের একেবারে পশ্চিম প্রান্ত। কতক্ষণে আকাঙ্ক্ষিত দ্বারকায় পৌঁছিব, এই আনন্দ ও উদ্বেগে ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। ট্রেণ ‘লেট্’ হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ১০ টায় দ্বারকায় পৌঁছিলাম।

এদিককার টাঙ্গা ছোট,—তাই দুইখানি ভাড়া করিয়া টাঙ্গাওয়ালাদের সমুদ্র-তীরে বরোদার মহারাজার “রেষ্টহাউস” অভিমুখে যাইতে উপদেশ দিয়া অন্ধকারে নূতন যায়গার এদিক-ওদিকে চাহিতে লাগিলাম; কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেবল দূরস্থিত বিদ্যুতের আলোকে পরিপূর্ণ একটা কারখানা দেখিয়া কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম উহা এখানকার বিখ্যাত “সিমেণ্ট ফ্যাক্‌টরি।” রাত্রি ১১টায় খবর পাইবামাত্র ক্যাপ্টেন্ ইকুইলো সাহেব বাংলোর দরজা খুলাইবার ব্যবস্থা ইত্যাদি করিয়া নানা কথার পর “Good night” বলিয়া বিদায় লইলেন। সমুদ্রের কুলেই বাংলো। দক্ষিণের দরজা খুলিবামাত্রই সমুদ্রের বাতাস পাইতে লাগিলাম ও গর্জ্জন শুনিতে লাগিলাম। দ্বারকায় তিন দিন বাস করিয়াছিলাম। প্রথমে সমুদ্রে স্নান করিতে গেলাম।—মনে পড়ে, একজন বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, “বোম্বাইর সমুদ্র পুরীর ন্যায় সুন্দর নয়, সেইরূপ বীচি-ভঙ্গ নাই।” কিন্তু দেখিলাম সেরূপ নয়। বেলা-ভূমিতে বালিও আছে, আবার একেবারে সমুদ্রের ধারে পাথর আছে। সম্মুখে চাহিলে কূল কিনারা দেখা যায় না; অসীম নীলাম্বু ঈষন্নীল আকাশের সঙ্গে দূরে বহুদূরে দিক্‌চক্রবালে মিশিয়া গিয়াছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতেছে; তীরভূমির নিকটে আসিয়া মরকত-প্রাচীরের ন্যায় স্ফীত হইয়া পরক্ষণে শত শত মুক্তার ন্যায় শ্বেত ফেন ছড়াইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে। দূরে একখানি জাহাজ ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে যাইতেছে, দেখা গেল। জিজ্ঞাসায়

জানিলাম, সেখানি মেল-ষ্টিমার। দুই-একখানি ছোট ডিঙ্গির ন্যায় নৌকাও দেখিলাম ষ্টিমারের নিকট আসিতেছে। আমরা আনন্দে পিট পাতিয়া "ঢেউ" লইলাম। আমার সঙ্গের চাকরটী মথুরার লোক ছিল; বলবান হইলেও সে ভয়েই অস্থির। সে প্রথম দিন ভয়ে, আর তরঙ্গের বিক্ষোভ ও নির্ঘোষ দেখিয়া-শুনিয়া স্নানই করিল না। পরে আমি দ্বিতীয় দিনে তাহাকে জোর করিয়া নামাইয়া ভয় ভাঙ্গাইয়াছিলাম।

দ্বারকার সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য স্থান, বলা বাহুল্য, দ্বারকানাথের মন্দির,—সমুদ্র তীর হইতে আন্দাজ অর্দ্ধ মাইল অন্তরে অবস্থিত। পথে বরোদার মহারাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

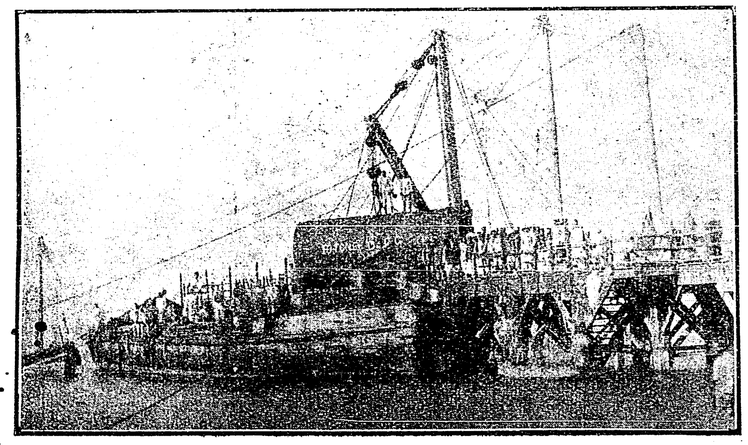

সমুদ্র-বন্দর

পাবলিক্ লাইব্রেরী দেখিলাম। উহাতে সাধারণ সংবাদ-পত্রাদি ও বহু পুস্তক আছে। লাইব্রেরী স্থাপনের দ্বারা জ্ঞানবিস্তার করা মহারাজের একটী আদর্শ কীর্ত্তি। দ্বারকা বরোদা রাজ্যের অধীন ওখমণ্ডল প্রদেশের প্রধান সহর। এখানকার লোক-সংখ্যা ৫০০০। ইহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, সামান্য বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এখানে মহারাজার এক পল্টন ফৌজ ও পুলিস আছে। তাহারা প্রাতে ব্যাণ্ড বাজাইয়া মার্চ্চ ও নানা কুচ কাওয়াজ করে। পূর্ব্বোক্ত ইকুইনো সাহেব তাঁহাদেরই ক্যাপ্টেন। মন্দির অভিমুখে যাইতে যাইতে এখানকার ক্ষুদ্র বাজার-হাট দেখিলাম। আবশ্যক জিনিস পত্রাদি মাত্র পাওয়া যায়। এখানকার ধূপ খুব প্রসিদ্ধ। পাণ্ডারা বেশ ভদ্র, অত্যাচারী নহেন। একজন পাণ্ডা আমাদিগকে মন্দির দেখাইতে লইয়া গেলেন। মন্দিরে বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় ১০,০০০ যাত্রী আসিয়া থাকে। প্রথমে বিগ্রহ দর্শন করিতে গেলাম। এখানকার দেবমূর্ত্তির নাম রণছোড়জি। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত নাতিউচ্চ বিষ্ণু-মূর্ত্তি। বহুমূল্য নানা অলঙ্কারে সুশোভিত। শুনা যায়, প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রণছোড়জির আসল মূর্ত্তি পুরোহিতেরা চুরি করিয়া গুজরাটের অন্তর্গত ঢাকুর নামক স্থানে লইয়া গিয়া রাখে। তদবধি উহা তথায় রহিয়াছে। তৎপরে দ্বারকায় যে দ্বিতীয় মূর্ত্তি স্থাপিত হন, তাহাও আজ ১৫০ বৎসর হইল ঐরূপে অপহৃত হইয়া একটী খাঁড়ীর অপর প্রান্তস্থ বটদ্বীপ বা শঙ্খোড় দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে পুনরায় দ্বারকার মন্দিরে বর্ত্তমান এই তৃতীয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিগ্রহ দর্শনান্তে বাহিরে আসিয়া মন্দির দেখিতে লাগিলাম। মন্দিরটী ১০০ ফিট উচ্চ ও ৫ তলায় বিভক্ত। স্থাপত্যরীতি জগন্নাথের মন্দিরের ন্যায়। মন্দিরের সম্মুখে একটি নাট-মন্দির আছে। নাট-মন্দিরের ত্রিকোণাকার চূড়া অতি উচ্চ। মন্দিরের গাত্রে বিবিধ কারুকার্য্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পের ছাত্রগণ এখানে আসিয়া দেখিলে অনেক "মডেল" শিখিতে পারিবেন। দুঃখের বিষয়, মন্দিরটি "লাইম ষ্টোন" বা চূণা-প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাই মন্দির-গাত্রের অনেক চিত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মন্দিরের নিম্নেই, সিঁড়ি দিয়া নামিলেই, গোমতী নামক পুণ্য-সলিলা নদীতে পৌঁছিতে পারা যায়। যাত্রীগণ এইখানে স্নান করিয়া থাকেন। এই স্নানের জন্য কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। পুরোহিতগণ তীর্থ-যাত্রীগণের হস্তে ছাপ দিয়া থাকেন। সকলেই যে ছাপ লয়, তাহা নয়।

দ্বিতীয় দিন বৈকালে রুক্মিণীর মন্দির দেখিতে গেলাম। এই মন্দির "রেষ্ট হাউস" হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত; সে স্থানটি অতি নির্জ্জন। মন্দিরটি স্থাপত্য-

শিল্পে দ্বারকা-নাথের মন্দির অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর। বিগ্রহ লক্ষ্মী-মূর্ত্তি। রুক্মিণীর মন্দির কৃষ্ণ-মন্দির হইতে এত দূরে হইল কেন, বুঝিতে পারিলাম না। এই মন্দির দেখিয়া আমরা এখানকার বন্দর দেখিতে গেলাম। নৌকা, ছোট ষ্টিমার, 'ল্যাণ্ডীং ষ্টেজ' প্রভৃতি রহিয়াছে। কল্পনা হইতেছে, বরোদার মহারাজা দ্বারকায় একটি বৃহৎ পোতবন্দর নির্ম্মাণ করিবেন। এখান হইতে সূর্য্যাস্ত বড় মনোরম। পশ্চিমে সমুদ্র বীচিবিক্ষুব্ধ বক্ষ লইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। অস্তমান রবির কিরণগুলি বারিধির বক্ষে শত কনকচূর্ণের সৃষ্টি করিতেছিল। ধীরে ধীরে রক্তগোলক সূর্য্য যেন সন্ধ্যা-স্নানের জন্য সমুদ্র-বক্ষে সাঁতার কাটিতে কাটিতে ডুবিয়া গেল। আমরা ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বারকানাথের বিগ্রহ

তখন সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায়

তৎপর দিন সকালবেলা গাড়ীতে দ্বারকার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। গাড়ী ৩ ঘণ্টা "লেট"! বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, দ্বারকার এই নূতন লাইনের গাড়ী বড়ই অসুবিধাজনক। সময়ের ঠিক নাই; কখন এঞ্জিন খারাপ হইল, অর্দ্ধ রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল। এঞ্জিন মেরা-মত করা আরম্ভ হইল। যাহা হউক, এই রেল সমুদ্র-পথের চেয়ে অনেক ভাল। ফিরিবার পথে রাজকোটে নামিয়া "ওয়াট্‌সন মিউজিয়াম" দেখিলাম। আমেদাবাদে দুই দিন ছিলাম। গান্ধীজির বিদ্যাপীঠ দেখিলাম। পুরাতত্ত্ব-মন্দির একটা "রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্।" আমেদাবাদে রাস্তায়-ঘাটে মোটর, জনতা, পণ্যশ্রেণী। প্রকাণ্ড ব্যবসায়ের স্থান। যত্র তত্র "মিল ওনার"—বোধ হয় "মিলিওনায়ারে"র সহিত একার্থবাচক।

চিররাত্রি

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এম-এ

মেয়ে-কলেজের ছুটীর পর প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যান-বাটিকা হইতে এক-একখানি গাড়ী মেয়ের দলকে বুকে তুলিয়া লইয়া দিকে দিকে ছুটল। যে অল্প সংখ্যক শিক্ষা-র্থিনী ঘরের গাড়ীতে যাতায়াত করে, তাহারাও নিজ নিজ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। যাহারা কলেজ বোর্ডিএ বাস করে, তাহারাও সেই দিকে ঝুঁকিল। আভা বরাবর ঘরের গাড়ীতে যাওয়া-আসা করে; কিন্তু আজ তাহার গাড়ী আসিবে না, সে জানিত। আজ কলেজে আসিবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আভা যখন আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার সাড়ীর আঁচলটা দুরস্ত করিয়া লইতেছিল, তখন তাহার বিধবা বর্ষিয়সী স্নেহশীলা পিসীমা ঘরে ঢুকিয়া কুণ্ঠিত ভাবে জানাইলেন যে, আজ নেবুতলা হইতে তাঁহার কন্যা কম-লাকে আনিতে যাইবার কথা হইয়াছে। কমলা তাহার পিসতুত বোন;—গত আঠার মাসের মধ্যে সে শ্বশুর বাড়ীর বাহির হইবার অনুমতি পায় নাই। আভা পিসীমার ব্যথা অনুভব করিয়া বলিল, তা বেশ, গাড়ী যেন নেবুতলা থেকে দিদিকে আনতে যায়—কলেজে সাড়ে তিনটের সময় বেহারা ছট্টুকে পাঠিও, ভুলো না যেন।

ছুটীর পর আভা যখন বেহারার আশায় গেট পর্য্যন্ত যাইয়াও তাহাকে দেখিতে পাইল না, তখন সে ফিরিয়া

আসিয়া লাল সুরকি দেওয়া পথের একপার্শ্বে উৎকণ্ঠিত চিত্তে দাঁড়াইল।

ক্ষণকাল পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যদিও আকাশ তখন মেঘমুক্ত নয়, তবুও মেঘান্তরাল-নিঃসৃত সূর্য্যালোকে ভাদ্রের অপরাহ্ণ ঝলমল করিতেছিল। আভা যখন তাহার বেহারার জন্য ব্যগ্র-প্রতীক্ষায় পাইচারি করিতেছে, তখন সে পথে সহাধ্যায়িনী মণিকা সিদ্ধান্ত তাহার কলেজ বোর্ডিং-এ ফিরিতেছিল। সে সুন্দরী ও হাস্যমুখরা। সে আভাকে তাহার স্ত্রী বলিয়া ডাকিত। এই উপহাসে আভা প্রথম-প্রথম রাগ করিত, কথা কহিত না; কিন্তু ইদানীং সহিয়া গিয়াছিল। ইহাদের দুজনের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ কলেজের মেয়ে-মহলেও বিদিত ছিল। মণিকা অনুপস্থিত থাকিলে, মেয়েরা আভাকে জিজ্ঞাসা করিত, 'কর্ত্তাকে দেখচি না যে?' সেও বেশ স্বাভাবিক সুরেই উত্তর দিত 'এই যে এখানেই ছিল, দেখি, কোথায় গেল।' আভা না থাকিলে মণিকাকেও এই ধরণের প্রশ্ন সহধ্যায়িনীরা করিত। মণিকা আভাকে দেখিয়া হাসিমুখে কটাক্ষ হানিয়া বলিল,—'এ কি, গিন্নী যে! এখনও যাও নি? কি বল্লে, হেঁটে যাবে? গাড়ী আসে নি? তা বেশ, লক্ষ্মীটী, সমজে যেও, ডাইনে বাঁয়ে যেন চেও না। আভা যেন তাহার ঠাট্টা বুঝিতে পারে নাই, এই ভাবে বলিল, কেন বল ত?' মণিকা আভার গালে একটা টোকা মারিয়া বলিল, বলা যায় কি ভাই—কলেজের ছেলেরা এখন বাড়ী ফিরচে, আজকের ঘুম তো তাদের অনেকেরই মাটী হবে, দু একজন জলে-পুড়েও মর্ব্বে দেখচি—বলিয়া মুচকিয়া হাসিল। বলিল, দেখো, যেন আমায় ভাসিও না, অনেক কালের খাতির, একটা কি বলে ওকে, দখলি স্বত্বও জন্মেচে। আভা তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, 'মুখ খুল্ল বুঝি। মণিকা এদিক ওদিক একবার দেখিয়া, টপ করিয়া আভার গালে একটা অত্যাচারের চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, প্রেয়সি, তোকে দেখলে আমার জ্ঞান থাকে না। আভা তাড়াতাড়ি অত্যাচারের স্থানটি মুছিয়া লইয়া বলিল, 'দূর দূর'। মণিকা হাসিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইল, কোনও কথা বলিল না।

এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল, তবুও বাড়ী হইতে বেহারা বা দরোয়ান কেহই আসিল না। আভা বিরক্ত হইয়া গেটের দিকে পুনরায় অগ্রসর হইল। সেখানে যাইয়াও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোনও দিনই ঠিক এমনটি ঘটে নাই; ইহাতে সে অভ্যস্ত ছিল না। গাড়ী প্রস্তুত থাকিত, সে চড়িয়া বসিত, ইহাই ছিল এতকালের নিয়ম। যখন ক্ষুৎপিপাসা-কাতর দেহ-মন গৃহের দিকে তাহাকে টানিতেছিল, তখনও কাহারও দেখা নাই। না, সে আর অপেক্ষা করিতে পারে না; পথ তো তাহার অপরিচিত নয়, সে একলাই যাইবে। খান-দুই বই ও খান-তিনেক খাতা সে শক্ত করিয়া ধরিয়া গেটের বাহির হইয়া পড়িল। তখন মেঘে সূর্য্য ঢাকিয়াছে, গাছের পাতাগুলিও নড়িতেছে না। আর একটা বদ্ধ অসহ্য গরম আসন্ন বারিপাতের অগ্রদূত হইয়াই যেন বিরাট অজগরের ন্যায় পড়িয়া আছে—নিচল নিথর। পথে আসিয়াই আভা বুঝিল যে, সে ভুল করিয়াছে, কলেজের চাকর বেহারা কাহাকেও সঙ্গে লওয়া উচিত ছিল; অন্ততঃ একটা ভাড়াটে গাড়ী করিয়া আসিলেও হইত। কিন্তু তখন তাহার ফিরিতে লজ্জা হইতেছে। বই খাতা শুদ্ধ অনভ্যস্ত হাতখানা যেন কাঁপিতে লাগিল। সাড়ীটাও বাগ মানিতেছে না—ব্লাউসটাও কেমন সরিয়া গিয়াছে, হাতের পেনসীলটীও পড়ে-পড়ে—সর্ব্বত্রই যেন বিদ্রোহের লক্ষণ পরিস্ফুট। আভা স্বভাবতঃ বেশী লাজুক ছিল না; কিন্তু আজ একাকী রাজপথে চলিতে তাহার কেমন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু এখন চলা ভিন্ন আর উপায় নাই। তাই সে কোনও দিকে না চাহিয়া সোজা পথ ধরিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটা রাস্তার মোড় ফিরিতেই বৃষ্টি সুরু হইল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটা, তার পর ঝরঝর বাদলধারা। যদিও সে অর্দ্ধেকের বেশী পথ অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু যখন বারিপাতে সে বিহ্বল হইয়া পড়িল, তখনও যে তাহাকে অনেকটা যাইতে হইবে! তরুণী সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তরুণী যদি আবার সুন্দর মুখের অধিকারিণী হয়, তাহা হইলে তো কৌতূহলের সীমাই থাকে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ কি! অযুত পথিকের দৃষ্টি-স্নাত হইয়া, জলধারা মাথায় করিয়া তরুণী চলিয়াছে, এ দৃশ্য অভিনব। তাহার সাড়ী, ব্লাউস, সাদা হিল-তোলা জুতা ভিজিয়া উঠিল। বিপর্য্যস্ত বিহ্বল আভা লজ্জায় লাল

হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বৃষ্টি-ভয়ে ভীত পথিকের দল স্থানে স্থানে পথিপার্শ্বস্থ গৃহের বারান্দার নীচে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই সময় স্কুল কলেজের প্রত্যাগত ছত্রহীন ছেলের দল, সাধারণ পথিক, ঝাঁকামুটে, পথের দুই একটি গাভী ও কুকুর এই সকল মিলিয়া সে সব স্থানকে এমন মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে যে, সেখানে সে দাঁড়াইবার কল্পনা করিতেও পারিল না। কি করিবে সে? বারিবর্ষণে সে আর চলিতে পারিতেছে না; বসন সিক্ত ও বিপর্য্যস্ত; এমন সময় একটী যুবক—দেখিতে কিছু অসাধারণ নয়—মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে দেখিয়া কি ভাবিল, এবং পরক্ষণে অগ্রসর হইয়া নিজের হাতের ছাতাটি তাহার হাতে দিয়া, দ্রুতপদে এক বারান্দার রোয়াকে আশ্রয় লইল। সে আভাকে কোনও কথাই বলে নাই; শুধু তাহার বৃষ্টিসিক্ত অসহায় অবস্থা দূর হইতে দেখিয়া দ্রুত আসিয়াছিল; কিন্তু কাছে আসিয়াও সে লজ্জায় তাহার চক্ষু দুটি তুলিতে পারে নাই; কেবল মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়া তাহার যৎসামান্য কর্ত্তব্য করিয়া দ্রুতপদে নিজকে বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য আশ্রয়-স্থানে গেল। আভা কিন্তু যুবকটীকে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিল। এই সহৃদয় অথচ অপরিচিত অদৃষ্টপূর্ব্ব পথিক বন্ধুর দান তাহাকে যে কত বড় লজ্জা ও বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিল, তাহা সে অন্তরে অন্তরে ভাল করিয়াই বুঝিল।

গৃহে পৌঁছিয়া আভা দেখিল, দানাপুরী বেহারা তখনও নিদ্রিত। ন্যস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অবহেলার জন্য তাহার উপর চারিদিক হইতে কটু তিক্ত অম্ল কষায় নানা বর্ষণ হইল বটে, কিন্তু যে কাণ্ডটি আজ হইয়া গিয়াছে, তাহা আভার জীবনে এমন একটি ছোটখাট ছাপ রাখিয়া গেল যে, তাহা মুছিবার কোন উপায় রহিল না। ধনী গৃহস্বামীর একমাত্র দুলালী দুহিতার এইরূপ বিপর্য্যস্ত অবস্থায় করুণ গৃহ-প্রবেশে সেবা ও সহানুভূতির বান ডাকিয়া উঠিল। ভিজা কাপড় ইত্যাদি ছাড়ার পর্ব্ব, বিলাতী দামী তোয়ালে দ্বারা চুলের গোড়া হইতে এতটুকু জল নিঃশেষ ভাবে মুছিয়া লওয়া, তাহা সব নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হইল। গরম চা, গরম দুধ, এ সব না খাইলেও নিস্তার নাই। সন্ধ্যার পর যখন সে তাহার নির্জ্জন কক্ষের নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে আশ্রয় লইল, তখন সর্ব্বাগ্রে তাহার এই কথাই মনে হইল যে, ছাতাটী সে তাহার অপরিচিত যুবক অধিকারীকে কেমন করিয়া ফিরাইয়া দিবে। সে সময় পথে তাহার নিজের কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ বা অবস্থা ছিল না। আর যুবকটি? সে তো তাহার মুখের দিকে চাহিতেই পারে নাই। আজকার এই আকস্মিক ব্যাপারটীকে সে ধৈর্য্যের সহিত গ্রহণ করিতে পারিল না। প্রথমে গাড়ী না যাওয়ার জন্য বিরক্ত হইল; তার পর বেহারার উপর রাগ করিল। পরে বর্ষার মেঘকে দোষী করিল, এবং যে যুবকটি নিজে ভিজিয়া তাহার উপকার করিল, সেও রেহাই পাইল না! তাহাকে সে মনে মনে অনুযোগ করিল, 'বাহাদুর' বলিয়া খাটো করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু ইহাতেও তাহার মন শান্ত হইল না। দাসী জলখাবার লইয়া আসিয়া বকুনি খাইল, ছোট ভাই অজিত 'দিদিভাই' বলিয়া ডাক দিয়া দিদির মুখ দেখিয়াই সরিয়া পড়িল।

গভীর রাত্রিতে শয্যায় প্রবেশ করিয়া আভার একবার মনে হইল যে, আজকার বন্ধুটির চেহারা খুব সুশ্রী না হইলেও বৈশিষ্ট্যহীন নয়—গায়ে টুইলের সার্ট, তদুপরি এক খানি মোটা চাদর, চোখে রূপা-বাঁধান চশমা।..... হাতে একখানা লাল রংএর বই দেখলুম না? 'যাক্ গে ছাই' কে, না কে দায় পড়েছে আমার তার কথা ভেবে।'

এইবার সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

(২)

বিমল বছর দুই হইল এক কলেজে অধ্যাপনা করিতেছে। ইদানীং সে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ স্মৃতি-পুরস্কার বা ঐ প্রকার একটা বিশেষ সম্মানের জন্য একটা প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত ছিল। সেদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হইতে ফিরিবার মুখে সে ট্রাম হইতে মধ্যপথে কি একটা কাজে নামিয়া পড়ে; তাহার পর হাঁটিয়াই গৃহাভিমুখে রওনা হয়। পথে জলসিক্ত আভাকে সে তাহার ছাতাটি সসংকোচে দিয়া নিকটে একটি বারান্দায় আশ্রয় লয়। কিন্তু বৃষ্টি থামিবার লক্ষণ না দেখিয়া ভিজিয়াই বাড়ী ফিরে। গৃহে যখন সে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। মাতা কক্ষান্তরে গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত, সে তাঁহাকে ডাকিল না। ঘরে যাইয়া নিজের ভিজা কাপড় ছাড়িল। ভৃত্য রাঘব উপস্থিত ছিল না। সে নিজেই আলোটি জ্বালিয়া, টেবিলের সামনে অল্পমূল্যের

একটি কাঠাসনে বসিয়া, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আংশিক অধীত একটি মৌলিক প্রবন্ধ-পাঠে মগ্ন হইল। আজকার ঘটনাটি তাহার চিত্তে কোনও রেখা আঁকিতে পারে নাই। সে আভার ন্যায় বিরক্ত, উত্যক্ত হয় নাই সত্য, কিন্তু মাধুর্য্যের সহিত সমস্ত ঘটনাটিকে স্মরণ করিবার অবকাশও তাহার ছিল না। কেবল গভীর রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে তাহার একবার মনে হইল যে আর একটি ছাতা কিনিতে হইবে। যেটি সে আজ দিয়া আসিয়াছে,তাহা আনিবার কথা মনেই হইল না, কারণ অপরিচিতার আবাস বা কোনও কিছুই সে জানিত না। সেইজন্য এ ক্ষেত্রে তাহার কিছুই করিবার ছিল না। পুরানো ছাতাটির কথা মনে করিয়া সে মনে মনে হাসিয়া বলিল, ছাতাটির ভাগ্য ভাল, এমন একটি কাজে লাগিয়া গেল। দিন পাঁচেক পরে আর একটি নতুন ছাতা দেখিয়া মা বলিলেন, এ যে নতুন—পুরাণোটা ?

সে হাসিয়া বলিল, সেদিন পথে জলে ভিজিতে ভিজিতে এক মেয়ে যাচ্ছিল, তাকে দিয়ে এসেছি। মা সেটি আনাইয়া লইবার কথা তুলিতেই বিমল হাসিয়া ফেলিল; বলিল, আমি কি তাকে চিনি, না তার ঠিকানাই জানি? মাও স্মিতমুখে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, ও আমার কপাল! আভার বাড়ীতে যে ঘটনাটি বিরক্তি ও ক্রোধের সঞ্চার করিয়াছিল, এ গৃহে মাতা-পুত্রের মধ্যে সেটা হাস্য-পরিহাসেই সমাপ্ত হইল।

(৩)

মাস পাঁচেক পরে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন প্রখ্যাতনামা শিষ্য আমেরিকায় বেদান্তের প্রচার করিয়া বহুদিন পরে সম্প্রতি এ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারই অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের জন্য একটা বড় গোছের সভার আয়োজন হইয়াছে। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নরনারী—বিশিষ্ট ব্যক্তিই, সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন,—তাহা এই হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধা বশতই হোক, বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক। বিমল সভার অনুষ্ঠাতাদিগের দ্বারা নিমন্ত্রিত ও অনুরুদ্ধ হইয়া সেখানে গিয়াছিল। বক্তৃতা, অভিনন্দন, অভিনন্দিতের প্রত্যুত্তর এসব যথারীতি সম্পন্ন হইল। সভাভঙ্গের পর বিমল একটুকু অপেক্ষা করিয়া, জনতা কমিয়া গেলে গৃহোদ্দেশে সামনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে মাত্র, তখন একটী অল্পবয়স্কা মহিলা তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বিমলের মুখের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, কই, আপনার ছাতাটী তো নিলেন না। পাঁচ মাস পূর্ব্বে বর্ষার অপরাহ্ণের কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। সহসা উত্তর দিতে পারিল না—বিহ্বল অথচ জিজ্ঞাসুভাবে প্রশ্নকারিণীর মুখের দিকে চাহিল; দেখিল, সেখানে বিরক্তির সুস্পষ্ট রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তরুণী কণ্ঠস্বরে একটু ঝাঁজ দিয়া বলিল, ভাল জ্বালায় পড়লুম। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে নিজেই লজ্জিত হইয়া, অপেক্ষাকৃত নরম সুরে লজ্জিত দৃষ্টি বিমলের মুখের দিকে তুলিয়া "সেই যে কলেজের ফেরত আমি ভিজে"—; সে আর বলিতে পারিল না। কিন্তু তাহার অসম্পূর্ণ উক্তিতেই বিমলের সব মনে পড়িয়া গেল।

সে তাহার স্বাভাবিক বিনয়-নম্র ধীর স্বরে বলিল, ও, মনে পড়েছে। যাক, তাতে আর কি, ভারি তো জিনিস! তরুণী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, বাঃ, আপনি আমার আপনার ওই দামী জিনিসটী দান কর্ত্তে চান না কি? তাহার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ ও ক্রোধের আভাস গোপন রহিল না। বিমলের ছাতাটী মেয়েদের ছাতা নয়, অল্পমূল্যের অতি সাধারণ ছাতা মাত্র; কিন্তু এ কথার উল্লেখ করিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিবার কি প্রয়োজন, তাহা বিমল বুঝিতে পারিল না। এই রূঢ় এবং অনুচিত ব্যঙ্গের উত্তর বিমল ফিরাইয়া দিবার চেষ্টামাত্র করিল না,—শুধু অতি সংক্ষেপে তরুণীর ঠিকানা জানিয়া লইয়া নিজের পথে অগ্রসর হইল।

ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া আভা সভায় গিয়াছিল। সেখানে দূর হইতে বিমলকে দেখিয়া তাহার চিনিতে বিলম্ব হয় নাই। বাড়ী ফিরিয়া আভার মনে হইল যে, তাহার কথাগুলি স্বাভাবিক তো হয়-ই নাই, বরং একটা অশোভন রূঢ় ভাব ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও মনে পড়িল যে,সভার বিশিষ্ট ও মাননীয় অভ্যাগতের নির্দ্ধারিত স্থানে স্বল্পভাষী যুবকটী যখন বসিয়া ছিল, তখনও তাহার যেমন শান্ত বুদ্ধিতে উজ্জ্বল শ্যামমূর্ত্তি সে দেখিয়াছে, যখন সে তাহার সহিত কথা বলিল, তখনও ধীর শান্ত মুখেই সব বলিল;—তাহার রূঢ় কথার উত্তরেও এতটুকু অধৈর্য্য, বিন্দুমাত্র অসৌজন্য প্রকাশ করিল না।

যেন আভা আজ হারিয়া আসিয়াছে,—সে নীরবে চলিয়া গেল, সেই যেন জয়ী হইয়া ফিরিল।

আজ সে নিজের উপরেই বিরক্ত হইল।

বহুক্ষণ সে বারান্দার রেলিং ধরিয়া বাহিরের মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। এ আঁধার যেমন অজানিত রহস্যময়, দূরে ঘুমন্ত সৌধ-শ্রেণীও যেন রহস্যে ভরা। সর্ব্বাপেক্ষা গভীর রহস্যময় আজ তাহার মনে হইল এই অজানিত যুবকটীর পরিচয়।

(৪)

সেদিনকার বাক্যালাপে আভার দিক হইতে যথেষ্ট রূঢ়তা প্রকাশ পাইলেও বিমলকে বিঁধিতে পারে নাই,—ক্ষণকালের জন্য তাহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছিল মাত্র। নরনারীর বিচিত্র হৃদয়-রহস্য ও মনোভাব লইয়া সে নাড়াচাড়া করিত না। সে জানিত, ইহা নিতান্তই বাজে-খরচ। সুদ তো আসেই না, আসলও মারা পড়ে। দিন তিনেক পরে সে ভৃত্য রাঘবকে ঠিকানা দিয়া ছাতাটী আনিতে পাঠাইল এই মনে ভাবিয়া, যে, সে ঠিকানা লইয়া আসিয়াছে, ইহাতেও যদি ছাতা না আনে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার জবাব দেওয়া হয় ত কঠিন হইবে। সন্ধ্যার পর রাঘব ফিরিয়া সংক্ষেপে বলিল, ছাতা দিলে না। ইহাতে বিমল ও তাহার মাতা উভয়েই আশ্চর্য্য হইলেন। পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া এই বুদ্ধিমান জীবটীর নিকট হইতে যাহা জানা গেল তাই এই,—প্রকাণ্ড বাড়ীর দুই তিনটা মহল পার হইয়া তাহাকে দোতালার এক বড় ঘরে বাড়ীর একটী চাকর লইয়া গিয়াছিল; এবং সেখানে একটি মেয়ে তাহাকে অনেক জেরা করিয়াছে—বাবুর নাম, বাড়ীর ঠিকানা, বাড়ীতে কে কে থাকেন, বাবু কি করেন? এসবই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন। তবুও ছাতা দেবার বেলায় বল্লেন, তোকে বিশ্বেস হয় না, তুই ফাঁকী দিয়ে নিতে এসেছিস, সেটি হচ্ছে না।—আর একটি বিধবা কাছে ছিলেন; তিনি কিন্তু মেয়েটিকে দিতেই বল্লেন, কিন্তু মেয়েটি বললে, না, কার জিনিস কাকে দেবো, শেষে জবাবদিহিতে পড়তে হবে।

সেদিন বিমলকে ঠিকানা দিয়া এবং ভৃত্য রাঘবকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও যে ছাতাটি আভা কেন দিল না, তাহা বিমল না বুঝিতে পারিলেও এই অপ্রিয় ব্যাপার এত সহজেই মিটিয়া গেল ভাবিয়া সে তাহার টেবিলে যাইয়া বসিল এবং একখানি ইংরেজী মাসিকের জন্য একটি অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ আজ শেষ করিবে মনে করিয়া কলমের পুরানো নিব ফেলিয়া নতুন নিব পরাইতে লাগিল।

ইহার ঠিক পরদিন।

অপরাহ্ণের রৌদ্র তখন নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছিল। একখানি গাড়ী বিমলের গৃহদ্বারে আসিয়া লাগিল। গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া গৃহদ্বারে একটি টিনে লিখিত ইংরেজী নম্বরটা ভাল করিয়া দেখিয়া আভা, তাহার পিসীমা ও ছোট ভাইকে লইয়া নামিয়া পড়িল। আভার ভ্রাতা দরজার কড়া নাড়িল। গৃহে তখন বিমলের মা ছাড়া আর কেহই ছিল না। বিমল তখনও ফিরিয়া আসে নাই। রাঘব কি একটা কাজে বাহিরে গিয়াছে। বিমলের মা উপর হইতে ইহাঁদিগকে দেখিয়া কিছু ঠাহর করিতে পারিলেন না,—সব মুখগুলিই তাঁহার অপরিচিত। তিনি নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাকে চান? ইহার উত্তর আভাই দিল, বিমল বাবুর বাড়ী এই না? বিমলের মা সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়িতেই, একটুকু দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে আভা বলিল, তাঁর কাছেই এসেছি। ইহার পর এক মুহূর্ত্ত থামিয়া বিমলের মা বলিলেন, তা বেশ, ভেতরে আসুন—বিমলের আসবার সময় হল প্রায়। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল এবং অপ্রশস্ত সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলে উঠিল। বিমলের মাতা ইহাঁদিগকে লইয়া বিমলের ঘরে বসাইলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আভা সেই বর্ষার দিনের কথা সংক্ষেপে সলজ্জ কণ্ঠে বলিয়া, ভ্রাতার হাত হইতে ছাতাটী লইয়া আলনায় রাখিয়া দিল। বিমলের মা বলিলেন, এত কষ্ট করে আপনার আস্‌বার কি দরকার ছিল?

বাস্তবিক ব্যাপার এই যে, আজ তাহার মাসীর বাড়ী যাইবার জন্য পিসীমা ও ভ্রাতাকে লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; আসিবার সময় সঙ্গে ছাতাটী দেখিয়া, পিসীমা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ওটা কেন? সে সংক্ষেপে উত্তর দিল, সেদিন যে চাকর এসেছিল, তার ঠিকানাটা যদি সত্যি হয় তবে আজ যাবার সময় দিয়ে যাব। সেইজন্যই তো অজিতকে সঙ্গে নিলুম, নইলে মাসীমার বাড়ী যেতে—; কিন্তু এই অতি সামান্য কাজের উপলক্ষ্য করিয়া

অপরিচিতের গৃহে উপস্থিত হওয়ার মধ্যে যে চিরন্তন লজ্জা আছে, আভা তাহা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। আসিবার পূর্ব্বেও সে এ কথা যে ভাবে নাই এমন নয়।

আভা বিমলের ঘরে ঢুকিয়া বসিল না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে তিনটী আলমারি বইএ পূর্ণ ছিল, তাহা দেখিতে লাগিল। দুটী আলমারি তখনও খোলা রহিয়াছে, একটীর গায়ে তালাশুদ্ধ চাবি ঝুলিতেছে,—গৃহস্বামী খুলিয়া আর বন্ধ করিবার অবকাশ পান নাই। বইগুলি কোথাও বেশ সজ্জিত, কোথাও এলোমেলো—এ উহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। আভা এই সব দেখিতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই একটী বই টানিয়া লইয়া দেখিতে আরম্ভ করিল,—লজ্জা ও সংকোচ গোপন করিবার জন্য সে যেন অন্তরাল খুঁজিতেছে। দেয়ালে টাঙান একটি ছবি—বিলাতী পটুয়ার আঁকা এক খানি সাধারণ চিত্র—কবি দান্তের সহিত ফ্লোরেন্সে হ্রদের পাশে প্রণয়িনী বিয়াট্রিসের দেখা—সেখানা সে বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিল। অপর দিকে বিমলের পরলোকগত পিতার একখানি বড় আলোক-চিত্র ছিল—সেখানিও অনাবশ্যক মনোযোগের সহিত দেখিল। তার পর টেবিলে আসিয়া বিমলের বই কাগজ নাড়িতে লাগিল। দুই একখানি বইএর মধ্যে অধীত অংশের চিহ্ন রহিয়াছে, তাহাও দেখিল। এদিকে পিসীমার সঙ্গে বিমলের মা সংসারের সুখ-দুঃখের কথা কহিতেছিলেন। সে দুই একটি কথা আভা শুনিতে পাইতেছিল, তাহা হইতেই তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এই প্রৌঢ়া নারীর ব্যবহারে একটা গাম্ভীর্য্যময় সহিষ্ণুতা আছে—কথাবার্ত্তায় বিশিষ্ট সৌজন্য ভাব আছে। আধুনিক কালের শিক্ষাদীক্ষা হয় ত ইঁহার নাই; কিন্তু শিক্ষা যদি চিত্তের শ্রীবৃদ্ধির জন্যই হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষা ইহাঁর নিশ্চয় আছে। সব দেখিয়া-শুনিয়া এঘর-ওঘর ঘুরিয়া আভা এই সরল জীবন-যাত্রাকে ঠিক মাধুর্য্যের সহিত না দেখিলেও একটুকু নূতন চোখে দেখিল। পূর্ব্বে যেখানে অবিমিশ্র উপেক্ষা অবজ্ঞা ছিল, সেখানে সে ভাব রহিল না। কোনও গোলযোগ নাই—মাতা, অবিবাহিত পুত্র ও একটীমাত্র ভৃত্য লইয়া সংসার পাতিয়াছেন;—সঙ্গী রহিয়াছে যুগযুগান্তের কত চিন্তা, কত অভিজ্ঞতা, কত কল্পনা—রাশি রাশি বইএর ভিতরে ধরা।

ইহার পর সংকোচের সহিত বিমলের মা জানাইলেন যে, চাকর এখনও ফিরিয়া আসে নাই, অন্য প্রকার ব্যবস্থা সম্ভব হইবে না;—আভা ও তাহার ভ্রাতা যদি কিছু মনে না করে, তাঁহার স্বহস্ত-প্রস্তুত দুই একটি জিনিস তাহাদিগকে দিতে পারেন। আভার মুখের দিকে চাহিয়া যখন তিনি বলিলেন, মা, আনব, কি বল? এই অকৃত্রিম মাতৃ-সম্বোধন মাতৃহীনা আভার হৃদয় স্পর্শ করিল। আভা হাসিয়া মুখ নত করিয়া কহিল, আচ্ছা আনুন, ক্ষিদেও পেয়েছে! সযত্নে প্রস্তুত জিনিসগুলি শ্বেত পাথরের দুখানি রেকাবীতে সাজাইয়া তিনি তাঁহার নিজের ঘরে আসন পাতিয়া ভ্রাতা ও ভগিনীর সামনে ধরিয়া দিলেন। আহার্য্য বোধ করি আভার ভালই লাগিতেছিল, কিন্তু সে ভাবিতেছিল অন্য কথা।

সে ভাবিতেছিল, যে ভাবে তাহাদের জীবন-যাত্রা, যে খাদ্য তাহাদের নিত্য আহার্য্য, তাহা হইতে যেন এগুলি বিভিন্ন, স্বতন্ত্র এবং অনাড়ম্বর। আভা একটী মিষ্টি একেবারে গালে পুরিয়া অসংকোচে জিজ্ঞাসা করিল, এগুলির নাম কি? বিমলের মা নিকটে উপবিষ্টা আভার পিসীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, এগুলি বকুল-পিঠে। আভা বলিল 'ও'। তার পর একটুকু থামিয়া বলিল, আমার ভারি ইচ্ছে করে, এসব তৈরি কর্ত্তে শিখি। কিন্তু কে বা শেখাবে, কোথায় বা শিখবো? বিমলের মা শুধু হাসিয়া বলিলেন, বেশ তো।

আভা প্রণাম করিয়া, বিদায় লইবার সময় বিনীত ভাবে বিমলের মাকে বলিল, সেদিন উপকার পেয়েছি, আজও খেয়েই গেলুম। এতে ঋণের বোঝাই ভারি হল। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল, যদি দয়া করে আসচে রবিবার দিন আমাদের বাড়ী যান, তাহলে খুব খুসী হব। মাথা নীচু করিয়া কহিল, যাবার জন্য আপনাকে মিনতি কচ্ছি; আমার এই ছোট ভাই অজিত আপনাকে নিতে আসবে।—না, না, সে হবে না—আপনার কোনও আপত্তিই শুনবো না,—বলুন, আপনি যাবেন?—বলিয়া বিমলের মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমার পিসতুত বোন আজ শরীর ভাল নেই বলে এলো না—তার সঙ্গেও দেখা হবে। কথা দিন, নইলে আমি নড়ব না।

* * * *

আভা রাত্রিতে পিতার ঘরে আসিয়া আজকার ঘটনা

বলিল। বিলেত-ফেরত গৃহস্বামী শিক্ষিতা কন্যার ইচ্ছা মানিয়া চলিতেন; সেদিক হইতে মাতৃহীনা কন্যার জন্য তাঁহার একটু দুর্ব্বলতা ছিল। অপরিচিতের গৃহে কন্যার এইরূপ অযাচিত গমনে তিনি কিছু বলিলেন না। শুধু বিমলের মায়ের আসিবার কথায় বলিলেন, বেশ,—বেশ, কবে আস্‌বেন?

(৫)

বিমল সেদিন যখন গৃহে ফিরিল তখন রাত্রি প্রায় দশটা। সে মাতার নিকট সমস্ত শুনিয়া কিছু বিমনা হইল এবং একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল; কারণ, সে জানিত যে, ধনী পরিবারের সহিত এরূপ পরিচয়ের পরিসমাপ্তি অনেক সময়েই আনন্দের মধ্য দিয়া তো হয়ই না—শুধু অনাবশ্যক ক্ষোভের সৃষ্টি করে মাত্র। ধনী-গৃহে আভার আহ্বানে মাতাকে পাঠাইতে তাহার আপত্তি ছিল না, এমন নয়;—তাঁহারা কি ভাবে তাহার মাতাকে গ্রহণ করিবেন, তাহার ঠিক কি,—উপলক্ষ তো একটা দিনের আকস্মিক সামান্য একটা ঘটনা মাত্র। ইহা ভাবিতে ভাবিতে, রবিবারের মধ্যাহ্নে অজিত একজন দাসী সঙ্গে যখন গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল, তখন বিমল তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। অজিত বলিল, আপনিও চলুন না। বিমল বলিল, তা কি হয়?

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিমলের মা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, বেশ লোক। আর লোকই বা কাকে বলি—মেয়েটির মা নেই—মেয়েটি আমাকে খুব আদর যত্ন করেচে, আহা বেশ মেয়েটি।

যাক্, ব্যাপার এইখানেই চুকিয়া গেল ভাবিয়া, বিমল একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

* * * * *

পরিচয়ের বাঁধন খুলিয়া গেলে, পরিচয় কখন যে তাহার কোঠা ডিঙ্গাইয়া ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়, তাহা ঠাহর করিতেও সময় লাগে।

আর একদিন আভা পিসীমা ও ভাইকে লইয়া সকাল-বেলা উপস্থিত হইল,—অজিতের জন্মদিন আসচে শুক্রবার, যাওয়া চাই, কোনও ওজর শুনিবে না। এইরূপে অজিতের জন্মদিনে, পরে তাহার মাতার মৃত্যু-তিথিতে যাইতে হইল। একদিন অজিত আসিয়া খবর দিল, দিদির অসুখ—খুব জ্বর—আপনাকে দেখতে চেয়েচে। এবারও না যাইয়া উপায় নাই। এইরূপে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা অনেক-দূর অগ্রসর হইয়া গেল। আভা বার-কয়েক আসিয়াছে বটে, কিন্তু এক দিন ছাড়া বিমলের সঙ্গে দেখা হয় নাই। সে নিজে ইচ্ছা করিয়াই এখন সময়টিতে আসিত, যখন বিমলের গৃহে থাকার সম্ভাবনা কম। সেই যে সভায় ফেরত সে বিমলকে দু একটী রূঢ় কথা বলিয়াছিল, সেই অবধি তাহার শিক্ষিত মন যেন লজ্জিত হইয়া আছে। সে ভাবিত যে, এই তরুণ অধ্যাপকটি তাহার সম্বন্ধে কত না হীন ধারণা পোষণ করিতেছে। সে সহজ শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া কথা কহিতে জানে না—ইহাই কি সে মনে মনে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে? ছি, ছি, কি লজ্জা! যাহা বাহিরে প্রকাশ পাইল, সেইটাই হইল সত্য,—কিন্তু মন যেখানে কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ, তাহা কেহ দেখিল না। কেন এমন হয়? এই প্রশ্নই সে আপন মনে করিত। 'আমি তো সত্যি সত্যিই তাকে বলিনি—আর আমি তাকে তখন কতটুকুই বা জানতুম!'

বিমল আসিয়া মায়ের কাছে শুনিত যে, আভারা আসিয়াছিল। তখন ঠিক শঙ্কা বা কুণ্ঠার ভাব তাহার মনে উদয় হইত না। সে শুনিয়া শুধু বলিত, তাই না কি। কোনও দিন বলিত, 'তার পর'! ঐ পর্য্যন্ত। উত্তরে মা কি বলিলেন, তাহা শুনিবার আগ্রহ ইতিপূর্ব্বে তাহার ছিল না। কিন্তু ইদানীং সে যেন, মা কি বলেন কাণ পাতিয়া শোনে, এবং শুনিলে যেন একটু আনন্দই পায়। মনের এই পরিবর্ত্তন সে লক্ষ্য করিয়া লজ্জিত হইয়াছে। তাই মনের কোণে এই অতি ছোট একটি অঙ্কুরের আভাষকেই সে রোজ নির্ম্মম ভাবে দুই পায়ে দলিত করিয়া যায়। কিন্তু রোজই আবার সেটি মাথা তোলে। সেদিন আভার সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল—সেই দিনটির কথা বলিতেছি। আভা সেদিন কলেজে যায় নাই, একটা পর্ব্ব উপলক্ষে কলেজের ছুটি ছিল। বিকালের কাছাকাছি আভা অজিতকে লইয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল, সদর দরজা খোলা রহিয়াছে। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে উঁচু গলায় কৌতুকের সুরে বলিল, বাঃ, কোথাও কেউ নাই দেখচি। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিমল তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। চোখাচোখি হইবামাত্র আভা

বিবর্ণ ও মলিন হইয়া গেল। বিমলের 'ভাল আছেন?' প্রশ্নে সে হাসিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু মুখে হাসি তেমন ফুটিল কই? আভা আসিয়া দেখিল, বিমলের মা আহারে বসিয়াছেন। আভা ঘরে ঢুকিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। তিনি ইহা বুঝিয়া বলিলেন, এস মা এস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন। আভা জুতো খুলিয়া ঘরে ঢুকিল এবং বিমলের মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও মসৃণ মেঝের উপর অসংকোচে বসিয়া পড়িল। অজিতকে ইতিমধ্যে বিমল নিজের ঘরে লইয়া গিয়াছিল। ইহার ঘণ্টাখানেক পরে আভা ও অজিত জল খাইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় আভার সহিত বিমলের পুনরায় দেখা হইল। আভা বিমলের ঘরে ঢুকিয়া এবার মুখে স্বাভাবিক হাসি আনিয়াই 'চল্লুম' বলিয়া নমস্কার করিল। বিমল দাঁড়াইয়া হাসি মুখে নমস্কার করিল মাত্র, কিছু বলিল না।

কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে।

বিমলের মাতার কন্যাহীন হৃদয় মাতৃহারা আভার প্রতি একটু ঝুঁকিয়াছিল বটে, কিন্তু এ মমত্ব-বোধ তাঁহার নিজের নিকটেই অর্থহীন বোধ হইত। সেদিন তিনি আহ্নিক শেষ করিয়া উঠিয়াছেন মাত্র, তখন একটা কথা তাঁহার মনে হইল, এবং মনে পড়িবামাত্র মনের কোণটায় আলোকের আভাস ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণে বিপরীত সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হওয়াতে ক্ষণিকের আলোক-সম্পাত মিলাইয়া গেল। এইরূপে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিচারে তাঁহার চার পাঁচ দিন কাটিল। কথাটী এই যে, বিমল বিবাহে উদাসীন বলিয়া বিমলের মাতা পুত্রের বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু এই চার পাঁচ দিন আগে মাত্র তাঁহার মনে হইয়াছে যে, আভার সহিত বিমলকে মিলাইয়া দিলে কেমন হয়? 'সে দিককার মত আগে জানিতে চেষ্টা করি, তার পর বিমলকে বলিলেই হইবে।' আভার পিতা বিলেত-ফেরত বলিয়া তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। উভয় পক্ষই ব্রাহ্মণ,—বিবাহ হিন্দুমতে হইলেই হইল।

ইহার দিন সাতেক পরে আভার পিসীমা ভ্রাতার কক্ষে আসিয়া দুই একটি কথার পরই সোজাসুজি আভার বিয়ের কথা তুলিয়া বিমলের মায়ের ইচ্ছা আভার পিতাকে জানাইলেন। আভার পিতা তাঁহার হস্তস্থিত ইংরেজী দৈনিকখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, ক্ষেপেছ! অত গরীব ঘরে বিয়ে দিলে আমার কি মান থাকে?

পিসিমা, আভার সামনে বি-এ পরীক্ষা—সেইজন্যে বিয়ের কথা চাপা আছে—এইরূপ কি একটা কথা বলিলেও, বিমলের বুদ্ধিমতী মাতা আভার পিতার অনিচ্ছা বুঝিলেন; কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্ষুণ্ণ হইলেন না! 'সত্যিই তো, এ ঘরে তাকে মানায় না, তাদের বাড়ীর তুলনায় আমার বাড়ী তো পায়রার ঘর! অবস্থার ব্যবধানটাও তো দেখিতে হইবে।' মাতা ও পুত্রের মধ্যে কোনও কথা গোপন ছিল না। তাই বিমলের মা বিমলকে তাঁহার এই বিফল প্রয়াসও জানাইলেন। বিমল শুধু বলিল, ভাল কর নাই, আমায় জিজ্ঞাসা কর্লে আমি নিষেধ কর্ত্তাম। মাতা কুণ্ঠিত, পুত্র স্তব্ধ।

(৬)

কয়েক মাস পরে।

সদ্য বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা আভার সহিত বিলাত-প্রত্যাগত অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হইল। ইনি বিলাতে যে বিষয়ে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে বার দুই ফেল করিয়া, আসিবার সময় সস্তা দুই একটী এ, বি, সি, ডি নামের সঙ্গে যোগ করিয়া এ দেশে ফিরিয়াছেন।

দুই পক্ষই ধনী; সুতরাং বিবাহে ব্যয়ের নামে যে অপব্যয় হইল, তাহার উল্লেখ করিয়া লাভ নাই। বিবাহের রাত্রিতে বিমলের মাতা বিমলকে লইয়া ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। বিমলের সঙ্গে বিবাহের কথাটা যখন তিনিই এক সময় তুলিয়াছিলেন, সেইজন্যই তো আজ তাঁহাদের যাওয়া চাই,—না-যাওয়া অশোভন হইবে।

ফিরিবার পূর্ব্বে বিমলের মা আভাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, কয়েকখানা বই ও আর দুই একটী জিনিসের সঙ্গে তাঁহার নিজের শাশুড়ীর দেওয়া সিঁদূরে ভরা সোণার কৌটাটী তাহার হাতে দিলেন। এই কৌটাটী বিমলের সহিত আভার বিবাহ হইলে পুত্রবধূ আভাকে দিবেন, এই সংকল্প করিয়াছিলেন। যদিও আভা অপরের বধূ হইয়া পরগৃহে চলিয়াছে, তথাপি তিনি মনে মনে যাহাকে দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহাকেই দিলেন। তাঁহার নিজের ও তাঁহার শাশুড়ীর স্মৃতি-জড়িত বিমলের ভাবী বধূর জন্য রক্ষিত এই কৌটাটী দিবার পূর্ব্বে বিমলকে একবার

জিজ্ঞাসা করিলেন। বিমল অকৃত্রিম আনন্দের সহিত বলিল, বেশ তো, এটী তাকেই দাও মা! মা যেন আজ পুত্রের মনের গোপন খবর পাইলেন।

বিবাহ-বাসরে বরবেশী অমিয় চট্টোপাধ্যায়কে দূর হইতে দেখিয়া বিমলের মনের কোণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাঃ, বেশ চেহারা। লোকজন কায়দা-কানুন বড় লোকের মতই। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে বিশ্রী হত;—এই বেশ হয়েচে।

* * * * *

ফুলশয্যার রাত্রিতেই আভা স্বামীর মুখে মদের গন্ধ পাইল। এই মদ্যপ যুবকটী ইংরাজী বাংলা মিশ্রিত রসিকতা করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া নেশার ঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল। আজ নিজের উপরেই যেন আভার প্রতিহিংসা ছাপিয়া গেল। সে পিতা কর্ত্তৃক অমিয়ের সহিত পরিচিত হইবার পর তাহার বিলাতের হাইড পার্কের গল্প, স্কটলণ্ডের ঝরণার কথা—এই সব শুনিয়া ঠিক বিরূপ ছিল না। সে মনকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, বেশ হয়েচে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল যে, অমিয়ের সহিত তাহার ঠিক দুটী দিনের বেশী আলাপ হয় নাই। এখানে চারি দিক হইতে সে তাহার প্রশংসাই শুনিয়াছে।

আভা ভাবিতেছিল, এই তো তাহার নতুন জীবনের সূচনা। বিখ্যাত জুয়েলার-নির্ম্মিত হাজার বারো টাকার গহনা সে শ্বশুরবাড়ী হইতে উপহার পাইয়াছে। ধূমধামেরও কোনই ত্রুটী হয় নাই। তাহার পিসতুত বোন কমলা তাহার ভাবী সুখ-সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিল, সব তোর কপাল! মরে যেন তোর কপাল পাই। তাই বটে! ইহার পর মাস দুই যাইতে না যাইতেই আভা তাহার স্বামীর মদের সজীব উপকরণটীরও সন্ধান পাইল!

পিত্রালয় হইতে আর সে বিমলের বাড়ী যায় নাই এমন নয়। কিন্তু সেই পবিত্র ছোট অকিঞ্চিৎকর আবাসখানি—তিনটী প্রাণী লইয়া সংসার—বারান্দার কোণে একটী কেরোসিনের টিনে পোঁতা তুলসী গাছ,—বিমলের ঘরে সেই তিনটী বইএর আলমারী—ইতিমধ্যে আরও একটী নূতন হইয়াছে,—বিমলের মায়ের সেই স্নিগ্ধ কথাগুলি—এই সবের সম্মুখে সে যেন নিজেকে ছোটো মনে করিত। নিজের এই দৈন্যের সহিত তাহার নূতন পরিচয়। বাড়ী ফিরিয়া ক্লান্ত অবসন্ন দেহে তাহার মনে হইত, শুধু পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া অভ্রভেদী ইমারত গড়িলে, চুনি মতি দ্বারা দেহকে মনোহারী দোকান করিয়া তুলিলে, এ সবের ভারে মনুষ্যত্ব ও চিত্ত দুই-ই পীড়িত হয়। তাই মাস দুই পরে আভা বিমলদের বাড়ী আসিয়া ফিরিবার সময় বিমলের মাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল, মা, আমায় যেন ভুলো না। এই প্রথম সে বিমলের মাকে মা বলিল। বিমলের মা আভার অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটী দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। তবে তিনি অমিয়ের সম্বন্ধে ইদানীং যে একটা জনরব শুনিয়াছিলেন, তাহা কি সত্য? আভার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন,—না, মা তোমায় ভোলা যে আমার কত বড় দুঃখ, তা আমি জানি। সে দুঃখ থেকে ভগবান আমাদের চিরদিন রক্ষা করুন।

আভা বাড়ী ফিরিয়া সদ্য-বিবাহিতা সহাধ্যায়িনী মণিকা সিদ্ধান্তের পত্র পাইল। সে বিবাহের পর 'মিত্র' হইয়াছে। তাহার পিত্রালয় রাঁচি হইতে সে তাহার স্বামী-সৌভাগ্যের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছে যে, তাহার স্বামীর মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষার আর এক বছর বাকী। অবস্থা তেমন ভাল নয়, তাই মণিকা একটা মাষ্টারি লইয়া স্বামীকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছে;—ইহাতে তাহার কত গৌরব, কত আনন্দ—তাহা তাহার পত্রের প্রতি ছত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। স্বামী দরিদ্র বটে, কিন্তু সমস্ত হৃদয় দিয়া সে মণিকাকে ভালবাসে। পত্রশেষে মণিকা লিখিয়াছে,—ভাই, সেদিন আমি এখানে আসবার সময় দেখা কর্ত্তে গেলুম, তখন সত্যি-সত্যিই তার চোখে জল চিকচিক করে উঠল। তাকে কাঁদিয়েই এসেছি, তাই বেশী দিন এখানে থাকতে পার্ব্ব না।

এই পত্র আভা যখন পড়িল, তখন নিজের অজ্ঞাতসারে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

(৭)

চার পাঁচ বছর পরে।

আভা কেবল একটী বিষয়ে মনে মনে ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা জানায় এবং অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করে—সেটা এই যে, সে সন্তানের জননী হয় নাই। লজ্জাহত জীবনের চিহ্ন সে জনসমাজে রাখিয়া যাইতে চায় না, যাহাতে

তাহার সন্তানসন্ততি এই বিদ্রূপের তিলক ললাটে লইয়া যুগের পর যুগ ধাবিত হইতে থাকিবে ? মাতৃত্বের আনন্দ ও গৌরবও সে এজন্য ত্যাগ করিবে। সে বলিত, ভগবান, আমাতেই ইহার পরিসমাপ্তি হোক। লোকচক্ষে, বৌধ করি ধর্ম্মানুসারেও, সে একজনের পরিণীতা স্ত্রী ; কিন্তু তাহার ক্ষুব্ধিত হৃদয় দূরে থাকিয়াও আর একটী ক্ষুদ্র পরিবারের দৈনিক কাজ মনে মনে অনুসরণ করিত।

নিজের শয্যাত্যাগে বিলম্ব হইলে সে যেন নিজেই লজ্জিত হইত। বিমলের মাতা তখন বাসি কাজ সম্পন্ন করিতেছেন,—সে যেন দূরে থাকিয়াও মনে মনে তাঁহার সাহায্য করিতেছে এবং আনন্দ পাইতেছে। এই তিনি পুত্রের চা প্রস্তুতের জন্য ব্যস্ত হইলেন,—আভা যেন দূরে থাকিয়াও চোখে দেখিতে পাইল ; সে চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তার পর চা প্রস্তুত হইলে অধ্যয়নরত বিমলকে সে যেন সলজ্জ হস্তে চা দিয়া আসিল। আর বিমল,—সে কি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল ? আভাও অবসর করিয়া ঘণ্টাখানেক পড়াশুনা করিল—ইহা বিমল ও তাহার মায়ের আদেশ। দুই একটী সামান্য উপকরণ দিয়া এই অব্যাপকটী খাইয়া কলেজে চলিয়া গেল। বিমলের মাতা যেন তাহাকে বলিলেন, বৌমা, তুমি তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে বিমলের পাতেই বসে যাও। সে-ও তাই করিল। খাওয়ার শেষাশেষি বিমলের জন্য যে দই আসিয়াছে, তাহা অর্দ্ধেক খাইয়া বিমল বাকী অর্দ্ধেক রাখিয়া গিয়াছে। সে শ্বাশুড়ীর অনুরোধে সেটুকুও পাতে ঢালিয়া লইল। তার পর সে বিমলের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। এই অপরিসর কক্ষই যেন তাহার নিজের কক্ষ বলিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করে ; এবং যে গৃহে তাহার জড়-দেহ বধূরূপে বাস করিতেছে, সে গৃহ যেন এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর বাস সত্ত্বেও তাহার অপরিচিত। কোনও কোনও দিন সে স্নান করিয়া শ্বাশুড়ীর পূজার সাজ করিতেছে, ইহা ভাবে ; অথবা রন্ধনের দ্রব্য গুছাইয়া রাখিতেছে, মনে করে। কোন দিন রাঁধিতে যায়। শ্বাশুড়ী স্নান করিয়া, পূজা আহ্নিক সারিয়া, পরম পরিতোষের সহিত তাহার অপটু হস্ত-প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিতেছেন। খাওয়ার সময় শ্বাশুড়ীকে বাতাস করে, তার পর নিজের ঘরে যাইয়া একটুকু বিশ্রাম—বিমলের এলোমেলো বইগুলি গোছান, বিমলের জামার বোতাম লাগান—এমনি সব কাজ করে। তার পর বিমলের জলখাবার তৈরি, বৈকালিক কাজ, শয্যা প্রস্তুত। ইহার পর তাহার সাহায্যে প্রসাধন। বিমলের মা, ঠাকুরমা যে সিঁদুরের কৌটা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতে সিঁদুর রেখাটী আঁকে—তাহা যেন বড় উজ্জ্বল, বড় মধুর বোধ হয়। বিমল ফিরিলে, একটুকু বিশ্রাম করিলে, সে খাবার লইয়া যায়। বিমল কিছু খাইয়া বাকীটুকু তাহাকে খাইতে বলে,—সে খাইবে না, অন্ততঃ তখন নয়—বিমল না খাওয়াইয়া ছাড়ে কই ? রাত্রিতে বিমলের ঘরে সে রাত্রির আহার্য্য লইয়া প্রবেশ করে। বিমল এগারটার পর খায় ; সেজন্য খাবার উষ্ণ রাখিবার চেষ্টাও তাহাকে করিতে হয়। বিমলের খাওয়া হইলে, নিজের খাওয়া কোনও মতে সারিয়া সে শয়ন-কক্ষে আসে। বিবাহের পূর্ব্বে তাহারা পান খাইত না। বিবাহের পর শ্বাশুড়ীর অনুরোধে সে দুই একটি পান খায়। সে বিমলকেও তাহা ধরাইয়াছে। তার পর বিমল এ বই সে বই পড়িয়া শোনায়,—কোনও দিন সে নিজেই বিমলকে পড়িয়া শোনায়।

এইরূপে সে দিনের পর দিন কল্পনার জাল বুনিয়া, তাহার ক্ষুধিত পীড়িত হৃদয়ের আহার জোগাইয়া চলে। সে দূরে থাকিয়া বিমলের জন্মদিন জানিত না ; তবুও একটা দিন কল্পনা করিয়া লইত যে, আজ বিমলের জন্মদিন ;—সেই ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে সেদিন আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। আভার জন্মদিনে শ্বাশুড়ী-দত্ত নূতন শাড়ী পরিয়া সে শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিতেছে। বিমলের মুখে কি আনন্দ, ইহা যেন সে মানস চক্ষে দেখিতে পাইত। আজ অরণ্য-ষষ্ঠী, আজ পৌষ-পার্ব্বন, আজ অরন্ধন—এই সব বারব্রতের ভিতর দিয়া এই শিক্ষিতা নারী যেন মনের নিত্য নূতন খোরাক সংগ্রহ করিত। তাহার দেহ রহিয়াছে এক গৃহে ; কিন্তু মন ক্রীড়া করিতেছে অপর গৃহে ;—সেই গৃহের সুখ-সৌভাগ্যের চিন্তায় সে রত। সে মনে করিত, এমনি করিয়া সে কি বাকী জীবনটাকে কাটাইয়া দিতে পারিবে না ? এই তো ছাব্বিশ বছর তার বয়স ; আর কত দিন বাঁচিবে—ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ! যদি বেশী বাঁচে ? না, না—সে বেশী বাঁচিবে না। সে বেশী দিন বাঁচিতে চায় না !

বিমলের ইংরেজী বাংলা রচনা, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব বিষয়ক লেখা ও গল্প, দুই তিনটি মাসিকে দেখা যাইত।

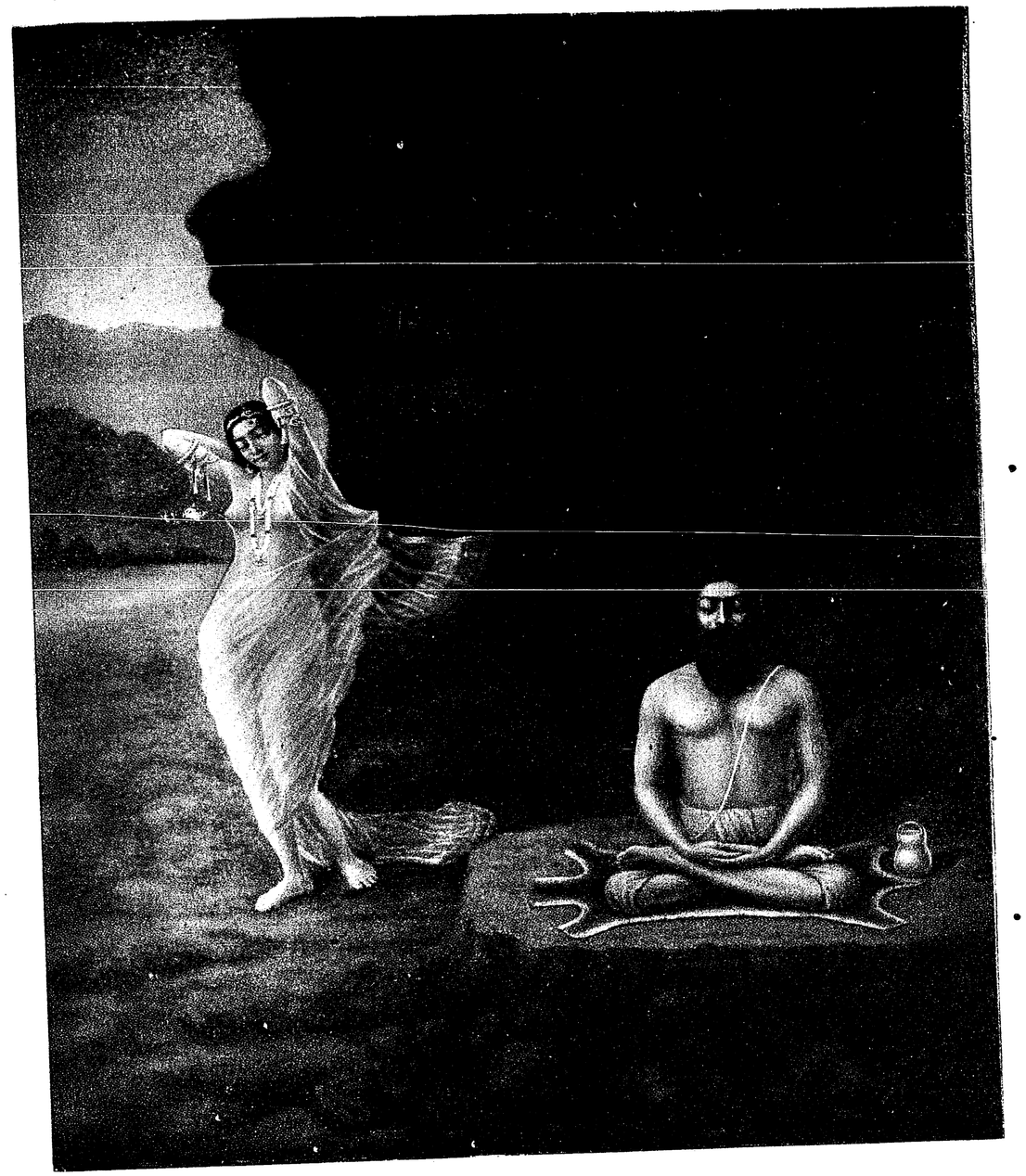

বিশ্বামিত্র-মেনকা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাগচী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATI

সেগুলির সে নিজে গ্রাহক ছিল। নিয়মিত পড়িত। একবারের যায়গায় পাঁচবার পড়িয়াও যখন তৃপ্তি বোধ হইত না, তখন মণিকাকে পত্র লিখিত,—ভাই, অমুক কাগজে যে লেখাটি পড়িয়া দেখিও, কি সুন্দর। আবার সামনের মাসে এই লেখকের লেখার জন্য দিন গণিয়া চলিত। পড়া হইয়া গেলে, সেগুলি যত্নের সহিত রাখিয়া দিত। সেবার কয়দিনের কিছু আগে বিমলের সমাজতত্ত্ব বিষয়ে একখানা নূতন গল্পের বই একখানা বাহির হইল। সে তিন চার কপি করিয়া কিনিয়া নিজে রাখিল, বন্ধু মণিকাকে পাঠাইল, আর দিদি কমলাকে দিল। তার পর বিমলের মায়ের সহিত দেখা হইলে, তিনি যখন দুইখানা বই-ই বিমলকে দিয়া লিখাইয়া দিলেন,—"শ্রীমতী আভা দেবী কল্যাণীয়াষু—আশীর্ব্বাদিকা তোমার মা—।" হস্তাক্ষর রহিল বিমলের, নাম রহিল তাহার মায়ের—কিন্তু ইহার সঙ্গে মন রহিল মাতা পুত্র উভয়েরই,—তখন তাহার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

আভা একটি জিনিস প্রথম বারেই বিমলের মায়ের কাছ হইতে চাহিয়াছিল, কোনও সংকোচ করে নাই; একদিন বলিয়াছিল, মা, সিঁদুর দিও—তোমার কৌটো যে খালি হয়ে এলো। ধনী কন্যার, ধনবানের স্ত্রীর, তাঁহার কাছে সিঁদুর চাহিবার যে কি করুণ অর্থ, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন। আভা পিত্রালয়েই থাকুক আর শ্বশুরালয়েই থাকুক, এই সিঁদুরই পড়িত, সিঁদুর-রেখাটি সে সযত্নে সীমন্তে আঁকিত; সিঁদুর ফুরাইলে পুনরায় চাহিত। ইহার জন্য সে কি ভগবানের চোখে অপরাধিনী হইবে? হয় হোক। কিন্তু এই অপরাধের যে দুর্ব্বিষহ সুখ, যে অপরিমেয় দুঃখ—তাহা হইতে সে বঞ্চিত থাকিতে পারিবে না। তাই আজও পূজার প্রতিমাকে, মন্দিরের বিগ্রহকে এই উচ্চ-শিক্ষিতা নারী গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করে;—সাধারণ মেয়েদের মত ভ্রাতার জন্য পিতার জন্য যখন দীর্ঘায়ু কামনা করে,—তখন তাহার সেই অবনত লুণ্ঠিত অবস্থাতেই দূরে বুদ্ধিতে উজ্জ্বল যে এক শ্যামমূর্ত্তি তাহার মনের উপর ভাসিয়া ওঠে, তাহার দীর্ঘ-জীবন কামনা না করিয়া সে পারে কই?

এইরূপ মন লইয়া সে খেলা করিতেছে—মনও তাহাকে খেলা যোগাইতেছে। এমনি করিয়া তাহার দিন কাটিতেছে। সে মনের সূত্র ধরিয়া বিমলের সহিত প্রতিদিন এক হইতেছে। পরগৃহে থাকিয়াও সে যেন বিমলের সহিত বাস করিতেছে। শুধু কি তাই; যে মাসিক, যে দৈনিক বিমল ভালবাসে, তাহা সে ভালবাসিতে শিখিল। দূরে থাকিয়াও অনুগত শিষ্যার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে সে বিমলের ইচ্ছার অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিত।

* * * * * *

আর বিমল?

তাহাকে যেদিন মা তাঁহার চেষ্টার বিফলতা জানাইলেন, তখন সে নিজের অন্তরের অন্তরতম দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিছু দেখিতে পাইল না। তবে মাতার আশা-ভঙ্গে ব্যথা অনুভব করিল মাত্র। আভার বিয়ের দিন তাহার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে, যোগ্যস্থানেই আভার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু সেদিন আভার স্বামীর সম্বন্ধে অস্ফুট জনরব তাহার কাণে পৌঁছিল, সেদিন তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কাজের ভিড়ে সে ডুবিয়া থাকে; পড়াশুনা লইয়া অনেক সময় যায়; কিন্তু সযত্নে রক্ষিত পুরানো ছাতাটীর দিকে নজর পড়িবামাত্র বর্ষার দিনটী মনে পড়ে;—সে অন্যমনস্ক হইয়া যায়। ফেরিওলা ঢাকাই শাঁখা হাঁকিয়া যায়। মা আসিয়া বলেন, শাঁখা যাচ্ছে, একবার ডাকু না, আভার জন্য কিনতুম। বিমল হাসিয়া বলে, তোমার বি-এ পাশ করা মেয়েটী শাখা পর্ব্বে তো? মা বলেন, বলিস কি? মায়ের এই দুটী কথাই যথেষ্ট। মাতা-পুত্র শাঁখা বাছিতে বাছিতে বলেন, এর চাইতে ভাল নেই? আরো ভাল—দেখ, আরও ছোট দাও, তার হাত বেশ নরম কি না। এমনি করিয়া মাতা-পুত্রে শাঁখা কেনে, পছন্দসই সাড়ী কেনে। প্রথম বছরে আভা এক দিন বিমলের অনুপস্থিতিতে তাহার ঘরে ঢুকিয়া টেবিলে বসিয়া এ-বই সে-বই ঘাঁটিতেছিল,—হঠাৎ কালীর দোয়াত উল্টিয়া গিয়া একখানা ইংরেজী বইএর দুইখানা পাতা একেবারে কালীমাখা হইয়া যায়। ইহাতে আভা বড় লজ্জিত হইয়া পড়ে। পড়িতে পড়িতে সেই বইখানি বিমল হাতে করিলে তাহাতে আভার স্পর্শ, আভার ব্যাকুল-লজ্জা মাখান রহিয়াছে অনুভব করে। কিছুদিন পরে এই নিস্পৃহ যুবকটী দেখিতে পাইল যে, তাহার মনের গোপন দেশে, যেখানে সে ক্ষুদ্র অঙ্কুরটীকে বারবার পদ-

দলিত করিয়াছে, তাহারই অগোচরে সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুরটী এক চারা-গাছে পরিণত হইয়াছে। আজ এ গাছটীকে বিনাশ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না; বরং মন আনন্দের সঙ্গে ইহার গোড়ায় জল দিতে লাগিল। তাই অজিত যেদিন আসিয়া বলে 'দিদির অসুখ'—অজিত বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেও এই পরিবারে মাতা ও পুত্রের ব্যাকুলতার অন্ত থাকে না। মাতা ও পুত্রের মধ্যে ইহা লইয়া কথা হয় না বটে, কিন্তু তাহারা নীরবে নিজেদের মনোভাব বুঝিতে পারে। আভা সেখানে রোগশয্যায় শায়িত থাকিলে, মহানগরীর অপরপ্রান্তে এই যুবকটীর হৃদয় যেন রাত জাগিয়া আভার শিয়রে অপলক দৃষ্টিতে বসিয়া থাকে।

(৮)

এইরূপে আভার জীবন চলিতেছে।

এমনি করিয়া বিমলের দিনগুলি কাটিতেছে।

যেন তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণসমুদ্র গর্জ্জিয়া চলিয়াছে, ওপার হইতে আভা অনিমেষ নয়নে এ-পারে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। এ পারের অধিবাসীর চক্ষুদুটীও পারান্তর-বাসিনীর সুন্দর মুখে ন্যস্ত। তাহারা পরস্পরের হৃদয় বুঝিতেছে, মন বুঝিতেছে; একের বক্ষস্পন্দনও বুঝি অপরের অগোচর নাই। কিন্তু কেহ কাহারও সহিত মিলিত হইয়া সার্থকতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

হৃদয়ের বিধান দলিত হইয়া চিরদিনই কি মানবের হাতে-গড়া বিধান জয়ী হইবে?

শূদ্রোত্থান

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ওঠ, জাগো, ভারতের সম্মিলিত শূদ্র-শক্তি আজি
তীব্র দৃপ্ত বজ্র সম বাজি,
মেলিয়া বিপুল দেহ, পদাহত ভুজঙ্গের মত,
বক্ষে করি শত শত শতাব্দীর অপমান-ক্ষত;
ফেলিয়াছ যত অশ্রু এত দিন হারায়ে সম্মান
তাদেরে প্রমূর্ত্ত করি আন' শুধু অগ্নি অনির্ব্বাণ;
কিরাইয়া লও পুন নিজ অধিকার,
হে বিরাট শূদ্ররূপাধার,
পতিত ব্রাহ্মণগণে বুঝাইয়া দাও সগৌরবে—
শূদ্র কভু ক্ষুদ্র নহে, রুদ্র সে যে ভবে।

ভারতের মেরুদণ্ড, হে বিপুল, কর' উন্মোচন
বিশ্বরূপ ধাঁধিয়া লোচন!
উদ্যত সবেত্র শাস্তি পররক্ত-লোভী দু'টি পাণি
স্বার্থপর ব্রাহ্মণের, হিংসা দ্বেষ নির্য্যাতন গ্লানি
বিস্ময়ে থামিয়া যাক্, স্তব্ধ হোক্ সব অত্যাচার,
সমস্ত নিরস্ত হয়ে, দু'য়ে মিলি হোক্ একাকার;
ব্রাহ্মণ, এখনো এস, কর' কোলাকুলি,
শূদ্র তোমা নিবে বুকে তুলি,—
মিত্র যদি নাহি ভাব', মহাশত্রু শূদ্র হ'ল তবে—
শূদ্র কভু ক্ষুদ্র নহে, রুদ্র সে যে ভবে!

হে ব্রাহ্মণ, ছিলে তুমি সে অতীতে সত্য মহীয়ান্
বিশ্বে তব ছিল না সমান!
আজ তুমি অতি নীচ, অতি ছোট, দীনাদপি দীন,
কুকর্ম্মের বিশ্বকর্ম্মা, ধর্ম্ম কর্ম্ম বিদ্যা বুদ্ধি হীন;
যে ত্যাগ ও মনীষার অপরূপ সিংহাসন-তলে
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য লয়ে, রাজেশ্বর ফিরিত বিফলে,
বিশ্বজিৎ যে চরণে রাখি ধনুর্ব্বাণ
মানিত সে অপার সম্মান,
আজ তার আছে কিবা? ফেলে দাও এ ব্রহ্মণ্য-শবে,
শূদ্র কভু ক্ষুদ্র নহে, রুদ্র সে যে ভবে।

হে পতিত, ভুলে যাও সে অতীত গৌরব-স্বপন,
সে-তুমি কি এ-তুমি কখন?
হে বৃদ্ধ, যযাতি সম করিও না যৌবনের কাম,
হে মৃত, তপস্যা কোথা ফিরে যেতে জীবিতের ধাম?
আজি তুমি এত মূর্খ, নাহি জ্ঞান শক্তি তব কত,
হে অজ্ঞান, হে অক্ষম, তাই তুমি উৎপীড়ন-রত'!
এত দিন সয়েছে সে সব নির্ব্বিচারে,
আজ সে পড়েছে ভেঙে ভারে,
তবু তুমি নহ' ক্ষান্ত? হে উন্মাদ, ভুঞ্জ ফল তবে—
শূদ্র কভু ক্ষুদ্র নহে, রুদ্র সে যে ভবে!

স্বেচ্ছায় হারায়ে রাজ্য রাজদণ্ড করিবে চালন
স্বাধিকার-প্রমত্ত ব্রাহ্মণ!
প্রবঞ্চনা প্রতারণা কত দিন বল' আর চলে?
এখনো সময় আছে—খোল চক্ষু, মিল' গলে গলে!
আর তুমি নহ উচ্চ, নহ শ্রেষ্ঠ, ত্যজ' অহঙ্কার,
সমভাবে সাম্যে শূদ্রে, ভাই বলি ধর' হস্ত তার!
তোমারি জ্বালিত বহ্নি, অই দাবানল,
অত্যাচার পীড়নের ফল,
তব পানে ধেয়ে আসে লুকলকি শিখা হুহু রবে—
শূদ্র কভু ক্ষুদ্র নহে, রুদ্র সে যে ভবে।

জমীদারী বন্দোবস্ত

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল

কিছুদিন পূর্ব্বে "কর্ণওয়ালিসি বেদ" নামে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তার একমাত্র প্রতিপাদ্য ছিল এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর আমাদের জমীদার-সমাজের যে আস্থা যে, কথায় কথায় তাঁহারা ইহার দোহাই দেন, তার যুক্তি অনুসারে জমীদারদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা যেন তাঁহাদের করিতে হয় না; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে সেই যুক্তির দোহাই দেওয়া ঠিক সঙ্গত হয় না। জমীদারী বন্দোবস্ত ব্যাপারটা সমগ্র ভাবে তাহাতে আলোচনা করিবার চেষ্টা করি নাই।

জমীদারী বন্দোবস্ত বা ভূমির স্বত্ব সম্বন্ধে বর্ত্তমানে এদেশে যে বিধি চলিত আছে, তাহার দোষ এবং ত্রুটির নানা দিক হইতে আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে সব সমালোচনা হইয়াছে, তার মধ্যে সব চেয়ে মারাত্মক সমালোচনা ইহার সমর্থন প্রসঙ্গে করিয়াছেন বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়। সম্প্রতি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে মিত্র মহাশয় এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁর মতে, যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন, তারা বিলাতী অর্থনীতির খবর রাখেন না, এ দেশের economics এর কোনও সংবাদই রাখেন না। তিনি দেশী অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রগাঢ় জ্ঞানের যে অংশ বিতরণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, যদি আজ চট্ করিয়া কোনও মতে জমীদারদিগকে বাঙ্গলা সমাজ হইতে বাদ দেওয়া যায়, তবে অবিলম্বে বাঙ্গলার সরকারী তহবিলে সাড়ে বার কোটি টাকা বাড়িয়া যাইবে, অর্থাৎ বাঙ্গলার রাজস্বের পরিমাণ হঠাৎ দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। যদি তাহা হইতে পারিত, তবে কি হইত? বর্ত্তমান পদ্ধতিতে শাসন-কার্য্য চালাইবার জন্য আর এক কপর্দ্দক ট্যাক্স দরকার হইত না; বর্ত্তমানে যে বিবিধ ট্যাক্স প্রচলিত আছে, তাহা সমস্ত অনায়াসে মকুব করা যাইত। ট্যাক্স মকুব না করিলে, এই বার্ষিক সাড়ে বার কোটি টাকায় দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার প্রত্যেক শিশুকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া যাইত, প্রত্যেক গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া দূর হইতে পারিত, দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইতে পারিত। শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়কে যে তিন বৎসরের মন্ত্রীত্বের পরে কেবল আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে হইয়াছিল যে, টাকা নাই বলিয়া আমরা কিছু করিতে পারিলাম না, এমন দুর্দ্দশা মন্ত্রীদের হইত না।

মিত্র মহাশয় আরও দেখাইয়াছেন যে, এই সাড়ে বার কোটির স্থলে, আরও পঞ্চাশ কোটি হওয়াও কিছু বিচিত্র হইত না। এ কথার একমাত্র তাৎপর্য্য আমি এই বুঝি যে, তাঁর বিবেচনায়, জমীর উপর এই পরিমাণ margin of taxation আছে। ইহার দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ভূস্বামী ও কৃষকেরা শোষিত হইত। তাহা প্রমাণ হয় নাই। কেন না, বাঙ্গলার রাজকার্য্যের জন্য আপাততঃ প্রয়োজন প্রায় বার কোটি টাকা। সেস্থলে গবর্ণমেণ্টকে পঞ্চাশ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করিতে কোনও ব্যবস্থাপক সভা অনুমতি দিত না। সুতরাং এ হয় অমূলক। কিন্তু মিত্র মহাশয়ের উক্তিতে প্রমাণ হয় যে, জমীদারী বন্দোবস্ত না থাকিলে, বাঙ্গলার ভূমির ট্যাক্স দিবার শক্তির পরিমাণ পঞ্চাশ কোটি। তবু বাঙ্গলার মন্ত্রী 'হা টাকা' বলিতে বলিতে পদত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গলার রাজসরকারের আয় বৃদ্ধি করিবার এবং দেশের নিতান্ত প্রয়োজনীয় খরচ জোগাইবার এই যে সহজ উপায় আছে, তাহা জমীদারী বন্দোবস্তের ফলে বন্ধ হইয়াছে—জমীদারদিগের মতে চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে না প্রজার, না জমীদারের মঙ্গল হইতেছে।

আপাততঃ পঞ্চাশ কোটির কথা ছাড়িয়া দিয়া সাড়ে বার কোটি টাকা, যাহা আজ বাস্তবিক প্রজার নিকট হইতে আদায় হইয়া জমীদারের হাতে যাইতেছে, তাহার কথা একটু আলোচনা করা যাউক। এই টাকাটা কি ভাবে খরচ হইতেছে?

জমীদারদের মধ্যে অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তি বরাবরই ছিলেন এবং আছেন। অনেকে নিজেদের বিবেচনা ও

বুদ্ধি অনুসারে সৎকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সমগ্র ভাবে ধরিতে গেলে, এই টাকার অধিকাংশ অপচয় হইতেছে। ধীরে ধীরে দেশের এই বিপুল ঐশ্বর্য্য অযথা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে।

এই সাড়ে বার কোটি টাকা কেবল বড় বড় জমীদারের টাকা নয়, ইহার অংশীদারের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তাহাদের যে আয়, তাহার অধিকাংশ তাহাদের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাত্র ব্যয় হয়। এই গ্রাসাচ্ছাদনটা তাঁরা সমাজের কোনও কাজ করিয়া পান না, ইহা তাঁহাদের একটা বৃত্তি বিশেষ। যে পরিমাণ অর্থ এইরূপ ভাবে ইঁহাদের দ্বারা কাজ না করিয়া উপভুক্ত হয়, তাহা জাতীয় হিসাবে অপচয় বলিয়া ধরিতে হইবে। তা' ছাড়া, নানাবিধ বিলাসে তো অপচয় হয়-ই।

অপচয়ের পরিমাণ যে কতখানি, তাহা নিরূপণ করিবার একটা উপায় আছে। বাঙ্গলা দেশে রোজ রোজ বহু জমীদারী, তালুকদারী বা অন্যপ্রকার মধ্যস্বত্ব দেনার জন্য বিক্রয় হইতেছে। এই বিক্রয়ের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, এই সব সম্পত্তির সমস্ত মূল্য স্বত্বাধিকারী ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং সে ব্যয়ের ফলে ধনবৃদ্ধি হয় নাই। ধর, বার্ষিক এক হাজার টাকা উপস্বত্বের একটি সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল। ইহার মূল্য যদি ধরা যায় পোনেরো হাজার টাকা, তবে এই বিক্রয়ের মানে এই যে সম্পত্তি অর্জ্জনের কাল হইতে বিক্রয়ের কাল পর্য্যন্ত সম্পত্তির মালিক পোনেরো হাজার টাকা unproductively consume করিয়াছেন—অর্থাৎ ইহার জাতীয় সম্পদ হিসাবে অপচয় হইয়াছে। এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে বৎসরে যে পরিমাণ মূল্যের সম্পত্তি বেচা কেনা হইতেছে, ঠিক সেই পরিমাণ জাতীয় সম্পদ এই জমীদারী বন্দোবস্তের ফলে প্রতি বৎসর অপচয় হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে।

খরিদ্দার যে টাকা দিয়া সম্পত্তি কিনিল, সে টাকাটা সে হয় তো ব্যবসায়ে, না হয় তেজারতিতে, না হয় শিল্প কার্য্যে অর্জ্জন করিয়াছে। তার এ টাকা নূতন সৃষ্ট সম্পদ। এমনি করিয়া যে সম্পদ দেশে নানা প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হইতেছে, তাহার অনেকটা অংশ দ্বারা জমীদারী কেনা হইতেছে; এবং কালক্রমে এ টাকাও অপচয় হইয়া যাইতেছে। এমনি করিয়া এই জমীদারী বন্দোবস্ত দুই মুখ দিয়া জাতীয় সম্পদ শুষিয়া অপচয় করিতেছে।

আমি এ কথা বলিতে চাই না যে, সব জমীদার সব টাকা অপচয় করিতেছেন। পক্ষান্তরে অনেক বড় বড় জমীদার টাকা বাঁচাইতেছেন, অন্যান্য উপায়ে বাড়াইতেছেন, প্রজার ও দেশের জনসাধারণের হিতার্থ বহু সম্পদ ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু জমীদারী বন্দোবস্ত ব্যাপারটা আলোচনা করিতে গেলে এই মুষ্টিমেয় বড় এবং সদাচারী জমীদারের কথা ভাবিলে চলিবে না। ভাবিতে হইবে সমগ্র দেশের সমস্ত মধ্যস্বত্ববানদের কথা।

জমীদারী বন্দোবস্তের দোষের এই একদিক দেখাইলাম। আরও অনেক দোষ ইহার আছে। ইহার ফলে বাঙ্গলা দেশের ভূমিস্বত্ব বিষয়ক আইন এত অযথা জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা বলিবার নয়। তাহার ফলে দেশে কত মামলা মোকদ্দমা, কত অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। এ পথেও জাতীয় সম্পদের অপচয় হইয়াছে। তা ছাড়া আরও অনেক কথা এ সম্বন্ধে বলিবার আছে, তাহা লইয়া আমি সম্প্রতি আলোচনা করিতে চাই না।

আমার প্রতিপাদ্য এই যে, বাঙ্গলা দেশের ভূমি হইতে সমস্ত দেশবাসীর যে পরিমাণে সমৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল, জমীদারী বন্দোবস্তের ফলে তাহা হইতেছে না। এবং আজ যদি কাহারও কোনও স্বত্ব না থাকিত, আমরা যদি নূতন করিয়া সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন করিতে বসিতাম, তাহা হইলে জমীদারী বন্দোবস্তটাকে দেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলদায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতাম না। জমীদারী বন্দোবস্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যে বাঙ্গলা দেশকে রক্ষা করিয়াছে, ইহাতে সে কালের অনিশ্চয়তার যুগে যে বাঙ্গলার অনেক শান্তি ও শৃঙ্খলা আনিয়াছিল, এসব কথা আমি সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করি। কিন্তু আজ দেশের যে অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে জমীদারী বন্দোবস্ত সমগ্র জাতীর মঙ্গলের দিক হইতেই বল, প্রজার মঙ্গলের দিক হইতেই বল; আর জমীদারের মঙ্গলের দিক হইতেই বল, কোনও মতেই ইহা দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছে না।

ইহা যদি সত্য হয়, তবে কর্ত্তব্য কি? পল্লবগ্রাহী

রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ বলিবেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া জমীদারের উপর নূতন টেক্স ধার্য্য কর। এ ব্যবস্থা সুব্যবস্থা নয়। জমীদারকে রাখিয়া তাহাকে শোষণ করিলে দেশের চরম মঙ্গল বা কোনও প্রকার মঙ্গলই লাভ হইবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আমি দোষ দেখি না, ইহার দোষ এই যে ইহা জমীদারী বন্দোবস্ত। আমাদের করিতে হইবে সেই ব্যবস্থা, যার ফলে সমস্ত বাঙ্গলার ভূমি-সংক্রান্ত ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে। জমীদার ও মধ্যস্বত্ববান উঠিয়া যাইবে, ভূমি প্রজার নিজস্ব সম্পদ হইবে এবং ইহা হইতে সমগ্র জাতির যতদূর মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা উদ্ধার করা হইবে। ইহা করিতে হইলে সমস্ত মধ্যস্বত্ববান বিলুপ্ত করিলেই হইবে না,—জমীগুলিরও এমন ভাগে পুনর্ব্বিভাগ করিতে হইবে, যাহাতে কৃষির সৌকর্য্য সাধিত হয়।

বর্ত্তমান কালে কৃষির উৎকর্ষের নানা অন্তরায় আছে। তার মধ্যে কৃষির ভূমির বিখণ্ডিত অবস্থা ও চাষীর সম্বলের অভাব দুইটি প্রধান। এ দুইটি দোষ দূর করিতে না পারিলে, কেবলমাত্র চাষীকে মালিক করিয়া দিলেই যে কোনও গুরুতর উপকার হইবে, এরূপ আমার মনে হয় না। একজন চাষীর যদি পাঁচ বিঘা জমী থাকে, তবে সে প্রায়ই পাঁচভাগে থাকে, এবং হয় তো অনেকটা তফাতে তফাতে থাকে। তা ছাড়া, এমন অনেক চাষী আছে, যাহাদের জমীর পরিমাণ এত ক্ষুদ্র যে, তাহাতে লাভজনক ভাবে চাষ করা অসম্ভব। চাষের উন্নতি করিতে হইলে এক দিকে জমীগুলির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বড় হওয়া দরকার, প্রত্যেক চাষীর সমস্ত জমী যথাসম্ভব এক চাপে থাকা দরকার, এবং চাষীর হাতে যথেষ্ট মূলধন থাকা দরকার। একবার কৃষিবিভাগের একজন ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান বন্দোবস্ত যে পর্য্যন্ত না বদলায়, সে পর্য্যন্ত চাষীদের শিক্ষা দিয়া চাষের উন্নতি করিবার কোনই উপায় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা কিছু করা যাইতে পারে, চাষী তাহা ভাল রূপেই জানে। বৈজ্ঞানিক যাহা তাহাকে শিখাইতে পারে, সে শিক্ষা কাজে লাগাইবার টাকা তার নাই, আর এই সব খণ্ডবিখণ্ড ভূমিতে সে সব প্রক্রিয়ার প্রয়োগে খুব বেশী ফল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই। এই বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞের কথা যে কতটা সত্য, তাহা যে কেহ এ বিষয় একটু গভীর ভাবে আলোচনা করিয়াছে, সেই জানে।

সুতরাং সংস্কার যদি করিতে হয়, তবে সমস্ত ভূমিঘটিত ব্যবস্থার এমন আমূল সংস্কার করিতে হইবে, যাহাতে পরিশেষে চাষীর জমীগুলির বর্ত্তমান বিখণ্ডিত অবস্থা দূর হয়, এবং প্রত্যেক চাষী অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন হইতে পারে।

ইহার একটা খুব সোজা উপায় কল্পনা করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিবেন, জমীদারদের উচ্ছেদ করিয়া দেও; সমস্ত ভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া, সুবিধামত টুকরা করিয়া, প্রজাদের মধ্যে এমন সর্ত্তে বিলি করিয়া দেও যে, তাহা আর খণ্ডিত না হইতে পারে; এবং চাষী ছাড়া অন্যের কাছে হস্তান্তরিত হইতে না পারে। এ ব্যবস্থা সহজ এবং সরল; এবং সেই জন্যই ইহা সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব। জটিল সমাজ-ব্যবস্থার এমন সহজ প্রতিকার মাত্রই ভুল হইতে বাধ্য। কেন না সামাজিক যে কোনও প্রতিষ্ঠান সমাজ-মন্দিরের গায়ে বটগাছের মত শিকড় গাড়িয়া বসিয়া থাকে। তাকে উপড়াইয়া ফেলিলে শুধু সেই সবই নষ্ট হয় না, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক জিনিষ নষ্ট হইয়া যায়।

ধর জমীদারদের উচ্ছেদ। ইহার মানেটা তলাইয়া দেখিয়া অতি-বড় বোলশেভিক যে, সেও ইহার অনুমোদন করিবে না। জমীদার মানে যদি কেবলমাত্র বড়লোক হইত, তবে অন্ততঃ এক শ্রেণীর লোকের কাছে তাঁদের সর্ব্বনাশ সাধনও প্রীতিকর হইতে পারিত। কিন্তু জমীদারীর উচ্ছেদ মানে সমস্ত ভদ্রলোক গোষ্ঠীকে একেবারে বিনাশ করা। জমীদারী, তালুকদারী প্রভৃতির উপরই প্রায় সমস্ত ভদ্রলোক-সমাজের বৃত্তি নির্ভর করিতেছে। ইহাদিগের উচ্ছেদ করিলে জাতির একটা প্রকাণ্ড অংশ হঠাৎ নিরন্ন হইয়া পড়িবে, অথচ ইহাদিগের করিবার মত অপর কিছুই হালফিল উপস্থিত থাকিবে না। একটা বিশ্রামবহুল-শ্রেণী জাতির মধ্যে থাকা অত্যন্ত ভাবে প্রয়োজনীয় কি না, abstract theoryতে এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই রকম একটা শ্রেণীর অস্তিত্ব যে সমাজের রক্ষা ও পরিণতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং হঠাৎ কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই শ্রেণীটির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিলে, সমগ্র জাতির পক্ষে নানা

দিক দিয়া আশু অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। ইহার ফলে হয় তো একটা ভীষণ অরাজকতার মধ্য দিয়া শেষ পর্য্যন্ত একটা মঙ্গলময় পরিণতিতে পৌঁছান যাইতে পারে; কিন্তু সে পরিণতি অনিশ্চিত;—রুশিয়ার ইতিহাসও এ বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোনও ধ্রুব উপদেশ দিতে পারে না।

কাজেই সহসা জমীদার শ্রেণীর উচ্ছেদ আমি কোনও মতেই অনুমোদন করিতে পারি না। আমার মতে প্রয়োজনীয় সংস্কারটি আরম্ভ করিতে হইবে সম্পূর্ণ বিপরীত দিক দিয়া। রায়তকে সংহত ও উন্নত করিয়া ক্রমে ভূস্বামী করিয়া তুলিতে হইবে, এবং সে কাজ করিতে হইবে এমন কোনও প্রক্রিয়ায়, যাহাতে জমীদার শ্রেণী কালক্রমে বিলুপ্ত হইলেও তাঁহারা তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত কোনও বিশেষ ক্ষতি বোধ করিবেন না।

আমি এ সম্বন্ধে যে পন্থার পক্ষে, সেটি এই।

প্রথমতঃ করিতে হইবে জমীর consolidation। গ্রামস্থ সমস্ত রায়তকে সংঘবদ্ধ করিয়া তাদের সমগ্র জমী এওজ-বদল দ্বারা এমন ভাবে জমীগুলির পুনর্ব্ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক চাষীর জমী একচাপে পড়ে এবং জমীর পরিমাণ যথেষ্ট হয়। এইরূপ ভাগে যাহাদের জমীর পরিমাণ এত কম হয় যে, তাহাতে তাহার পক্ষে ইহা আবাদ করা লাভজনক হইবে না, তবে তাহাকে হয় জমী বাড়াইয়া দিতে হইবে, না হয় তাহাকে জমীর মূল্য দিয়া স্থানান্তরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

এ কার্য্য সহজ নয়, এবং আইনের গুরুতর পরিবর্ত্তন ছাড়া সম্ভবও নয়; কিন্তু ইহা অসম্ভবও নয়। কো-অপারেটিভ সোসাইটির সাহায্যে এ কার্য্য পঞ্জাবে কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব হইয়াছে। বাঙ্গলায় জমীদারী বন্দোবস্ত এবং এক জমীর ভিন্ন ভিন্ন স্তরের নানা মালিক থাকায় এ সমস্যার সমাধান আরও জটিল। কিন্তু যদি এ বিষয়ে আইনের কতকটা সংশোধন করিয়া লইয়া, কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠন করিয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়া যায়, তবে দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে ইহা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নয়।

এই প্রক্রিয়ায় কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে প্রজাগণ সংঘবদ্ধ হইবে। তাহাতে তাহাদের মূলধন বাড়িবে এবং ঋণ পাওয়ার সুবিধা হইবে। তাহা ছাড়া, এই কো-অপারেটিভ সোসাইটির সাহায্যে ধান পাট প্রভৃতি একেবারে মূল খরিদ্দারের কাছে বিক্রী করিলে, প্রজারা অপেক্ষাকৃত অধিক সমৃদ্ধ হইবে; আরও অনেক এইরূপ উপকার হইতে পারিবে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী উপকার হইবে এই যে, প্রত্যেক কৃষক একচাপে রীতিমত উন্নত প্রণালীতে চাষের যোগ্য যথেষ্ট জমী পাইবে।

ইহার পর চাই এমন একটী বিধান, যাহার ফলে চাষী ইচ্ছা করিলে থোক টাকা দিয়া জমীদারকে খাজনা দিবার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই জমীর বাবদ দেয় খাজনার পোনেরো গুণ কি পঁচিশ গুণ মূল্য দিয়া যদি সে মুক্তিলাভ করে, তবে সেই মূল্যের ভিতর কতক টাকা জমীদারকে ও কতক গভর্ণমেণ্টকে দিয়া জমীকে সে সম্পূর্ণ লাখেরাজ ভাবে পাইতে পারে। এইরূপ খাজনার স্বত্ব পরিদ করিতে হইলে যে টাকার প্রয়োজন, তাহা কো-অপারেটিভ সোসাইটির সাহায্যে গভর্ণমেণ্টের যোগে ঋণগ্রহণ করিয়া চাষী কিস্তি-কিস্তিতে পরিশোধ করিতে পারে।

এমনি একটা ব্যবস্থা হইলে, সমস্ত প্রজা ক্রমে চাষী-মালিক হইয়া উঠিবে। জমীদারী অনুষ্ঠানটি আস্তে আস্তে দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; অথচ জমীদারও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না; প্রজাও হঠাৎ আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইবে না।

এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে হইলে, অনেক কথা ভাবিতে হইবে, অনেক বাধা বিঘ্ন অনেক অসুবিধা বিদূরিত ব্যবস্থার দ্বারা দূর করিতে হইবে। সে সব ক্রমে পরীক্ষার দ্বারা করা যাইতে পারিবে। এই ব্যবস্থার সুবিধা এই যে এ কাজে অবিলম্বে হাত দেওয়া যাইতে পারে; এবং ধীরে ধীরে পরীক্ষার দ্বারা অগ্রসর হওয়া যায়। যদি ইহার ভিতর কোনও ভুলচুক থাকে, তাহা অভিজ্ঞতার দ্বারা ক্রমে সংশোধিত হইয়া যাইবে। আর ধীরে ধীরে দেশের একটা প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, জমীদারী বন্দোবস্ত ab-tract justice হিসাবে আজকালকার দিনে সমর্থন করা অসম্ভব। হঠাৎ ইহার উচ্ছেদসাধন দেশের পক্ষে প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিবে; কিন্তু ইহা চিরদিন থাকিতে পারে না; কালে ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী। এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যদি দেশবাসী ইহা দূর করিয়া, ইহার স্থলে উন্নততর ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উল্লিখিত উপায়ে কার্য্য করিতে যত্নবান হন, তবে তাঁহারা জমীদার ও অজমীদার, দেশের সর্ব্বসাধারণের প্রভূত স্থায়ী উপকার সাধন করিবেন। জমীদারগণ নিজ স্বার্থের সম্বন্ধে যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সজাগ থাকেন, তবে যাহা অবশ্য বিনষ্ট হইবে, সে বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া না থাকিয়া, আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, এবং তাঁহারাই অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের প্রজাদের মধ্যে এই প্রকার সমবায় গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন।

রাগদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া, সমস্ত অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যদি তাঁহারা এ প্রস্তাব বিবেচনা করেন, তবে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ইহা জমীদারী বন্দোবস্তের বিরোধী হইলেও, জমীদারদিগের প্রকৃত হিতসাধনের শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা।

দেবতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

(১)

দরিদ্র গৃহস্থ পরিবার। দূর পল্লীগ্রামে বসতি। গৃহকর্ত্তা যোগেন্দ্র সপ্তবিংশবর্ষীয় যুবা, কলিকাতার কোন জাহাজ কোম্পানীর আফিসে কার্য্য করে। বাড়ীতে অষ্টাদশ-বর্ষীয়া যুবতী স্ত্রী ও এক বৎসরের শিশু পুত্র, প্রৌঢ়া খুড়িমার তত্ত্বাবধানে থাকে। সাত দিনের ছুটি লইয়া যোগেন্দ্র এক মাস পরে বাড়ী আসিয়াছে। কলিকাতায় ফিরিয়া এবার তাহাকে জাহাজে করিয়া সিঙ্গাপুর, পিনাং, প্রভৃতি নানা স্থানে যাইতে হইবে, ফিরিতে তিন মাস সময় লাগিবে। দেশ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্ব-দিন রাত্রে শয়ন করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল।

সর, তিন মাস দেখ্‌তে পাবে না, খুব কষ্ট হবে, নয়?

সে আমি না বল্‌লে যেন বুঝতে পার না!

বুঝতে পারি বৈ কি। এবার ঘুরে এসেই কিন্তু, তোমার ইচ্ছে-মত ব্যবস্থা করবো।

ঠিক করা চাই কিন্তু। আমার এখানে একা থাকতে আর মোটে ভাল লাগে না।

যোগেন্দ্র সরযূকে বাহু-বেষ্টনে ধরিয়া বলিল, একা কি রকম? খোকা রয়েচে, খুড়িমা রয়েছেন.....

তা হলেই বা, আসল লোক যে থাকে না। সত্যি সত্যি আমার বড় কষ্ট হয়।

কষ্ট হয় বলেই ত এবারে জাহাজে কাজ নিয়ে যাচ্ছি। এক ক্ষেপ ঘুরে এলে অন্ততঃ তিনশ টাকা উপায় হবে। হাতে কিছু জমাতে না পারলে যে ভরসা হয় না!

তিনশ টাকা পাবে, মাইনে ছাড়া?

তা না হলে আর সেধে কাজটা নিলুম!

তবে এবার আমার ইচ্ছে ঠিক পূরবে, নয়? কত দিন থেকে তোমায় বলচি.....

ষাট টাকা মাইনেতে সাহস হয় না বলে নিয়ে যেতে পারি না। হাতে কিছু থাকলে তবে সাহস হবে।

আমায় নিয়ে গেলে দেখো আমি কি রকম কম খরচায় সংসার চালাবো। ঝি-টী কিচ্ছু রাখতে হবে না।

কম হলেও ত মাইনের টাকাটা সব লাগবেই। ছোট্ট খোলার বাড়ীও পনের ষোল টাকার কমে ত পাওয়া যাবে না। তার পর বাকি টাকাটা খাই-খরচ ইত্যাদিতে ফুরিয়ে যাবে।

খোকা কাঁদিয়া উঠিল। সরযূ তাড়াতাড়ি স্বামীর বাহুবেষ্টন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া খোকাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইল। খোকার কান্না থামাইতে গিয়া তাহাদের আগেকার কথা চাপা পড়িয়া গেল।

খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া সরযূ স্বামীর দিকে ফিরিতেই, যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা সর, আমার ওপর ভালবাসা তোমার যেন আগের চেয়ে কমে গেছে, নয়?

কিসে বুঝ্‌লে ?

কেন, ঐ যে একজন ভাগীদার হয়েচে !

তাহলে তোমারও কমেচে বল ?

আমার কেন কম্‌বে ?

বাঃ, তুমি যেন খোকাকে ভালবাস না।

ভালবাসি বৈ কি, তা বলে অতটা নয়।

অতটা নয় বল্‌লেই কি না আমি বিশ্বাস করবো !

আচ্ছা, অতটা ভালবাস কেন ?

তোমার ছেলে যে, সেইজন্যে।

ওঃ, তাই না কি ? তা আমি জানতুম না।

দুষ্টু—বলিয়া সরযূ স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিল।

কদিন অন্তর চিঠি দেবে ?

সপ্তাহে একখানা ত পাবেই।

নিশ্চয়ই, তা না হলে বড় ভাববো।

কিন্তু তোমাদের ত চিঠি পাবো না, কখন কোথায় থাক্‌বো তার ত ঠিক নেই।

আমাদের জন্যে ভাবনা কি ? আমরা ত বাড়ীতেই থাক্‌বো।

এ রকম সুন্দরী বৌকে একা রেখে কখনও নির্ভাবনায় থাকা যায় ?

ভারী ত সুন্দরী.....

সরযূ স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইতে, যোগেন্দ্র আবেগভরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

(২)

প্রায় তিন মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্রের ফিরিয়া আসিবার সময় হইয়া আসিল। সরযূ যে কি করিয়া দিন কাটিতেছে, তাহা কেবল এক অন্তর্যামীই জানেন। যোগেন্দ্রের দেশত্যাগের পর দিন রাত্রেই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের এক দুর্বৃত্ত লম্পট যুবক কয়েকজন অনুচরের সাহায্যে সরযূকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যায়। গ্রামবাসীরা অনেক চেষ্টা করিয়া পর দিন তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে। দীর্ঘ দুইমাস ধরিয়া মকদ্দমা চলার পর দুর্বৃত্ত লম্পটের ও তাহার সহকারীদের কয়েক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়া গিয়াছে। মকদ্দমার সময় জেলার সদরে সরযূ এক সহৃদয় উকিলের আশ্রয়ে ছিল। অল্প কয়েক দিন হইল নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিলেও, নিজ আবাসে তাহার স্থান হয় নাই। নারী-জীবনের সার সতীত্ব যখন নষ্ট হইয়া গেল, তখন কি করিয়া তাহাকে গৃহে স্থান দেওয়া যাইতে পারে ? সমাজ-পতিরা দয়া করিয়া তাহাকে গ্রামের প্রান্তে, স্বামী-পরিত্যক্তা, আত্মীয়স্বজনহীনা এক বৃদ্ধার আশ্রয়ে থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন। ধর্ষিতা যুবতী সর্ব্বদা চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া কোন রকমে দিন কাটাইতেছে। তাহার সে স্বর্ণ কান্তি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। একমাত্র সন্তানকে নিকটে পাইলেও মনের কতকটা শান্তি হইতে পারিত, কিন্তু সমাজপতিরা সে অধিকার হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া সরযূ আশ্রয়দাত্রীর সহিত কথা কহিতেছিল।

বামন-পিসি. খোকাকে একবারটি যদি লুকিয়ে আনতে পারেন ?

বৃথা চেষ্টা মা, তোমার কাছে তাকে আর দিচ্চে না।

এত শাস্তি কেন, আমার কি দোষ পিসিমা ?

দোষ, মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছ এই দোষ।

পিসিমা, এ রকম করে যে আমি থাকতে পারবো না।

কি করবে মা, ঘরে তোমাকে ত আর স্থান দেবে না।

তাঁর যে ফিরে আসবার সময় হয়ে এলো, তিনি ফিরে এলে নিশ্চয়ই এর সুবিচার করবেন।

পুরুষের কাছে এর কোন সুবিচারের আশা নেই মা।

তিনি যে আমায় খুবই ভালবাসেন পিসিমা। কখনও আমার একটা সামান্য কষ্টও সহ্য করতে পারেন না।

তোমার বয়সে আমারও ঐ ধারণা ছিল মা। ভাল-বাসার কোন মূল্য নেই, কোন মূল্য নেই ; তা থাকলে আমাকে এই পঁয়ত্রিশ বছর এত দুর্দ্দশা ভোগ করতে হোত না।

পিসেমশাই কি আপনাকে খুব ভালবাসতেন ?

খুব—মনে হোত জগতে কোন স্বামী বুঝি কোন স্ত্রীকে এত ভালবাসতে পারে না।

তবে এ রকম হোল কেন ?

কেন ? আমি যে মেয়েমানুষ, এই জন্যে। তোমারই মত আঠার কুড়ি বছর বয়সে, স্বামীর এক আত্মীয় এক দিন আমার ওপর অত্যাচার করে। স্বামী তখন কি কাজের

জন্যে সহরে গেছলেন। তিনি ফিরে আসতেই তাঁকে সব কথা জানাই। তিনি আমার পরিত্যাগ করলেন। কত অনুনয়-বিনয় না করলুম,—এত ভালবাসা কোথায় তলিয়ে গেল। তবে এইটুকু ভাল ছিল যে, বাইরের লোকে এ কথার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারে নি। অনেকে মনে করে আছে যে, ছেলে-পিলে হয়নি বলে স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করেচে। বাপের শূন্য ভিটেয় এসে আশ্রয় নিলুম। এ আশ্রয়টুকু না থাকলে কোথায় যে দাঁড়াতুম, তা এক ভগবানই বলতে পারেন। তোমার যে মা আরও বিপদ,—দেশশুদ্ধ লোক যে জেনে গেছে, তোমার ওপর অত্যাচার করেচে—তোমার সতীত্ব নষ্ট হয়েচে। স্বামীর কাছে কোন সুবিচার পাবে না মা, কোন সুবিচার পাবে না।

বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল। সরযূর সমস্ত আশা যেন এক মেয়ে ভবিষ্যতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল।

(৩)

যোগেন্দ্র তিন মাস পরে কলিকাতায় পৌঁছিয়াই পর-দিন রাত্রে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সাধের সংসারে যে একটা বিষম ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও সে জানিতে পারে নাই। বাড়ীতে পা দিতেই খুড়িমা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্রন্দনের সুরের সঙ্গে যে কথাগুলি অস্পষ্টভাবে বাহির হইল, তাহাতে কতকটা অনুমান করিয়া যোগেন্দ্র বুঝিল যে, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহারা সরযূকে হারাইয়াছে। যোগেন্দ্রের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল,—মাথায় হাত দিয়া সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। খুড়িমার চীৎকারে খোকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঘরের মধ্য হইতে তাহার ক্রন্দন-শব্দ বাহিরে আসিতেই, খুড়িমা তাহাকে তুলিয়া আনিয়া যোগেন্দ্রের কোলে ফেলিয়া দিলেন। যোগেন্দ্র খোকাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

পার্শ্বেই সমাজপতি গাঙ্গুলী মহাশয়ের আবাস। যোগেন্দ্রের আসার সংবাদ পাইয়া তিনি সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ বিপদে যোগেন্দ্রকে সান্ত্বনা দান যে তাঁহার বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যোগেন্দ্র মন্ত্রচালিতের মত উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—কি করবে বাবা, ঘটনাচক্রের ওপর ত মানুষের কোন হাত নেই। তবে ছুঁড়িটার যাতে খাওয়া থাকার কষ্ট না হয়, আমরা তার ব্যবস্থা করেচি। মোক্ষদার কাছেই তাকে রাখা হয়েচে। বাড়ীতে ত আর কিছুতেই তাকে স্থান দেওয়া যেতে পারে না।

তবে কি তাহার সরযূ এখনও বাঁচিয়া আছে ! যোগেন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আজ্ঞে কি বলচেন ?

বলচি, মেয়ে মানুষের যখন একবার সতীত্ব নষ্ট হয়েচে, তখন কি আর তাকে সমাজের ভেতর স্থান দেওয়া যায় ! তাকে ত্যাগ করতেই হবে ; তা না হলে যে সমাজ একে-বারে রসাতলে যাবে।

যোগেন্দ্রের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে, সে এখনও ঘটনাটার বিষয় জানিতে পারে নাই। তিনি তখন তাহাকে সরযূকে হরণ করা হইতে, তাহার উদ্ধার, মকদ্দমার কথা, দুর্বৃত্তদের সাজার কথা, মোক্ষদার গৃহে আশ্রয় দান প্রভৃতি সকল বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। যোগেন্দ্র মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় শুনিয়া গেল।

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিতে লাগিলেন—ছুঁড়িটা ছেলেটার জন্যে একবারে পাগল। মোক্ষদা যে আমার কাছে কতবার এসে বলেচে, দাদাঠাকুর, ছেলেটা দিয়ে দিন, তা না হলে ছুঁড়িটা বাঁচবে না। কি করে দি বল, ওরও ত ভবিষ্যৎটা দেখতে হবে। এখন দিলে ভবিষ্যতে ওটারও যে সমাজে স্থান মিলবে না, কি বল বাবা ?

যোগেন্দ্র এতক্ষণ পরে মুখ খুলিল। বলিল—জেঠামশায়, খোকাকে ওর কাছে পাঠিয়েই দিন।

তা তোমার ইচ্ছে যখন বাবা, কালই পাঠিয়ে দেবো ! বুঝেচি, তুমি ও-সংশ্রবই একেবারে ত্যাগ করতে চাও ! সে ভাল কথাই। আমরা মনে করেছিলুম কি, ছেলেটাকে হয় ত তুমি রাখবে, সেইজন্যেই দিই নি। তা বাবা, তোমার ভাবনা কি, এক মাসের মধ্যেই আমি আবার তোমার বিয়ে দিয়ে দেবো। আজকালকার দিনে এ রকম ছেলে পাওয়া মেয়ের বাপের ভাগ্যির কথা। যাও বাবা, অনেক রাত্তির হয়েচে, কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়গে। ঘটনাচক্রের ওপর মানুষের ত হাত নেই।

গাঙ্গুলী মহাশয় বাড়ী ফিরিলেন। যোগেন্দ্র উঠিয়া

ঘুমন্ত শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া নিজের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

(৪)

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি। মোক্ষদা দেবী ঘুমাইতেছিলেন, সরযূ জাগিয়া বসিয়া ছিল। দুইদিন খোকাকে কাছে পাইয়া, সরযূকে বাহিরে কতকটা যেন শান্ত দেখিলেও, মনের ভিতরে তাহার যে বিষম অশান্তির ঝড় বহিতেছিল, মোক্ষদা দেবীও তাহা ততটা বুঝিতে পারেন নাই। যোগেন্দ্র ফিরিয়া আসিলে, নিশ্চয়ই তাহার প্রতি সুবিচার হইবে, এই আশায় যে সে এত দিন বুক বাঁধিয়া ছিল। সে আশা যে তাহার নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্র বাড়ী আসিয়া পরদিনই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে,—তাহার একবার কোন খোঁজ লওয়াও আবশ্যক বোধ করে নাই। তাহার সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্য ছেলেটাকে পর্য্যন্ত নিজেদের কাছ হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে। শেষে কি আত্মহত্যা করিবে—সরযূ তাহাই ভাবিতেছিল।

সর—

চিরপরিচিত কণ্ঠে সুমধুর ডাকে সরযূ ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসিল।

চন্দ্রকিরণ-উদ্ভাসিত ক্ষুদ্র আঙ্গিনার মধ্যস্থলে যোগেন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সর, তোমাদের নিতে এসেচি। কলকাতার বাড়ী ঠিক করেচি, কাল ভোরেই আমরা গ্রাম ছেড়ে যাবো।

সরযূ বাঞ্ছিতের মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া, তাহার পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

(৫)

পর দিন প্রভাতেই মোক্ষদা দেবী আসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়কে খবর দিলেন—ভোরের গাড়ীতে যোগেন সরযূকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে।

বল কি? নিয়ে গেল!

মেয়েটার খুব পুণ্যির জোর দাদাঠাকুর, তা না হলে অমন স্বামী পায়।

বল কি? ঐ ছুঁড়িটাকে নিয়ে আবার ঘর করবে। যোগেনের কি একটুও মনুষ্যত্ব নেই, ওটা কি মানুষ নয়!

মানুষ নয় দাদাঠাকুর—দেবতা। গাঙ্গুলী মহাশয় হাঁ করিয়া মোক্ষদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নিন্দক

(পল্টূদাসের হিন্দী হইতে)

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

নিন্দকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো।
যুগ-জনমের বন্ধু আমার, আঁধার ঘরের আলো॥
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে।
নিন্দক সে ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে॥
নিন্দকেরে দেখলে আমি প্রণাম করি পায়;
সংসারে সে মহান্ বটে, ধন্য মানি তায়॥
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে।
সাধকজনে নিস্তারিতে তার মত কে জানে?
বিনামূলে ময়লা ধু'য়ে করে পরিষ্কার।
বিশ্বমাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর॥

নিন্দক সে থাকুক বেঁচে—বিশ্ব-হিতের তরে।
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপাভরে॥
বিনে মাইনের চাকর আমার খাট্‌বে প্রাণপণ।
কোমর বেঁধে আপনি জেগে, জাগায় ত্রিভুবন॥
তাহার সনে তিলেক আমার নাইকো ছাড়াছাড়ি।
লেগেই আছে দিন রা'ত সে 'প্রেম সে দেতা গারী'॥
সাধক-জনে দৃঢ় করে ঘুচিয়ে মোহ ঘোর।
দয়াল গুরু তাঁর কৃপাতে নাম মেলে যে মোর॥*

---

* মূল হিন্দী সুহৃৎ শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন লিখিত পল্টূদাস শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে প্রাপ্ত।

জাগরণী

শ্রীরাধারাণী দত্ত

...লা দেশের ও মেয়েরা! আজকে তোরা জাগ্‌রে জাগ্,
... মেলে দেখ্ চেয়ে ঐ রঙিয়ে উজল পূরব-ভাগ।
...চে নূতন কনক তপন নবীন আলোয় দিক্ ভ'রে,
...টা খুলে আর দেখি সব জগন্মাতার রূপ ধ'রে!
...জা নারীর ভূষণ বটে, কিন্তু সেটা ভীষণ হয়
...লঙ্কারের অধিকভারে অঙ্গ যখন স্বাধীন নয়;
...লা দেশের ও মেয়েরা! আজ তোমাদের ঘোম্‌টা খোল',
...নত সলাজ আঁখি সকল ভয়ের ঊর্দ্ধে তোলো!
...খী-সচীব' শুন্‌তে মুখে, দেখছ' তো কেউ নও কো তা,
...ধ্বী সতী পতিব্রতার যোগ্য মানে রও কোথা?
...সীর জীবন বরণ করেই তোমাদের এই দুর্দ্দশা,
এ দেশে তাই নারীর গতি মহী-লতার বুক ধসা!
...ঙ্গনারী! ডাক্‌ছে জগৎ—বাইরে তোমার অনেক কাজ,
...গিয়ে তোলো নারীত্বকে উদ্বোধনের মন্ত্রে আজ;
...ইরে তোমার বিশ্ব—বিশাল, চল্‌ছে সেথা যজ্ঞ-যাগ,
সোম সুধারস হোম-চরুতে বসাও এসে নেব্য ভাগ।
সত্য যেটা ধরবে জোরে, প্রাপ্য যেটা কাড়্‌বে তা,
অপমানের বইলে বোঝা ক্রমাগতই বাড়্‌বে তা!
আত্ম-অবিশ্বাস ভোল' গো, কুণ্ঠ' ভীতি' লজ্জাভার,
সব সঙ্কোচ সরিয়ে দূরে বেরিয়ে দাঁড়াও একটিবার।
'বাক্' 'অপালা' 'খনতী' ও 'বিশ্ববারা' 'ঘূর্ষা' 'লোপা'
এরা তো কেউ ছিল না বোন্ পর্দ্দানসীন খাঁচার পোষা;
'মৈত্রেয়ী' কি 'গার্গী'—তাঁরা ছিলেন না কেউ নিরক্ষর,
বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ বইছে যাদের জ্ঞান-আকর;
জ্যোতিষ-শাস্ত্রে 'খনার বচন' দিচ্ছে আজও পরিচয়,
গণিত শাস্ত্রে 'লীলাবতী'র প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ত নয়।
ঋষির সনে তপোবনে সেদিন যারা গ'ড়্‌তো শ্লোক,

বিশ্ববিদ্যালয় তো তাদের দেয়নি খুলে জ্ঞানের চোখ।
ন্যায়ের শাসন-দণ্ডাঘাতে জাগাও নিজের শক্তিরে,
তুচ্ছ করি নিন্দা খ্যাতি বিরাগ অনুরক্তিরে!
কান পেতে শোন্, শুন্‌তে পাবি উঠ্‌ছে নবযুগের সাড়া,
পর-নির্ভর জীবন ছেড়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়া;
নারীর গরব রাখ্‌তে বজায় বের হ'য়ে আয় কোণ্ থেকে,
ঘুমন্ত সব বোনগুলিকে শয্যা হ'তে তোল ডেকে,
'শক্তি' হ'য়ে শক্তিহীনা দীনার মত যাপ্‌বে কাল?
ফুটবে না কি দৃষ্টি তাদের, টুট্‌বে না কি আঁধারজাল?
গৃহস্থালীর কর্ম্মে শুধু জীবন সে কি ক'র্‌বে ক্ষয়?
বঙ্গবালার কার্য্য কি আর অন্তঃপুরের বাইরে নয়?
রুদ্ধগৃহের গণ্ডী মাঝেই জন্ম থেকে মরণ তার!
ইন্দ্রিয় বা অতীন্দ্রিয়ের ধার্‌বে না সে কোনই ধার?
এই জঘন্য ঘৃন্য হেয় জীবন নিয়ে থাক্‌লে কি সে?
সমাজ তাকে দল্‌বে পায়ে, অবিচারে মার্‌বে পিষে,
একই পিতার অসীম স্নেহে জন্মেছে এই নরনারী,
পুরুষ তবু ঠকিয়ে তাদের প্রভুত্বটাই ক'রছে জারি;
তারা আপন স্বার্থ খুঁজে দিচ্ছে বাধা নারীর পথে;
সকল বাধা চূর্ণ ক'রে এগিয়ে চল বিজয়-রথে।
উড়ুক নারীর জয়ের নিশান আজকে আবার সবার ঘরে,
মর্য্যাদা তার আসুক ফিরে—লুটিয়েছে যা ধূলির পরে;
আনন্দের এই সৃষ্টি ঘিরে আনন্দেরই সিন্ধু বয়,
মধু-বাতাস বইছে সদা, নিখিল আকাশ মধুময়;
নারীর সেথা অনধিকার, প্রাচীর গাঁথা চতুর্দ্দিকে;
এমনি ক'রে কারাগারেই আজীবন কি থাক্‌বে টি'কে?
বাইরে যে আজ আলোর আলো, নারী কি তার অংশী নয়?
ওঠো, জাগো, এগোও নারী, ক'র্‌তে হবে দিগ্বিজয়!

প্রতিবাদের প্রতিবাদ

অধ্যাপক শ্রীসত্যশরণ সিংহ বি-এস্, এম-এ-জি-এ

আমার "অকাল মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ" নামক প্রবন্ধটী পৌষ সংখ্যার ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। মাঘ সংখ্যার ভারতবর্ষে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী উহার পাল্টা জবাব দেন। তাহাতে তিনি আমার প্রবন্ধের বিশেষ কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু ফাল্গুন সংখ্যার ভারতবর্ষে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবি-সম্রাট মহাশয় আমার "অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ" নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন। আমি তাঁহার প্রতিবাদের উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি।

আমি আমার প্রবন্ধে ডাক্তার চার্লসকে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছি, "নিতান্ত অল্প বয়সে স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হইবার প্রধান কারণ বাল্য-বিবাহ।" মহামহোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "অল্প বয়সে স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হইবার প্রধান কারণ বাল্য-বিবাহ, বুঝিলাম না। বিবাহের মন্ত্রপাঠ করা মাত্র সেই মন্ত্রশক্তির বলেই বুঝি কন্যা ঋতুমতী হইল?" "প্রধান কারণ বাল্য বিবাহ" বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হই নাই। তাহার পর আরও উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছি, "বিবাহ দ্বারা বালিকা যে অস্বাভাবিক অবস্থায় নিপতিত হয়, তাহাতেই তাহারা অল্প বয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে।" "বুঝিলাম না" কথার উত্তর ঐখানে; এবং পরেও দিচ্ছি। তাহার পর পরলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, এম্-ডি, সি-আই-ই মহোদয়ের মত উদ্ধৃত করি, "অল্প বয়সে বিবাহের জন্যই স্ত্রীলোক ঋতুমতী হয়।" আমি বলিয়াছি, "এমনও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, স্বামী শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছেন। সরলা বালিকা স্বামী সন্নিধানে যাইতে অনিচ্ছুক। তখন তাহার দিদি বা বৌদিদি বা কোন প্রবীণা ভীতা, ক্রন্দননিরতা বালিকা স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক স্বামী সন্নিধানে প্রেরণ করে।... এরূপ বাল্য-বিবাহে যে নারীর "নারীত্ব" দেখা দেয় নাই, তাহার নারীত্ব শীঘ্র ঘটাইবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়।" উহা হইতে, বিবাহের মন্ত্রপাঠ করা মাত্র সেই মন্ত্র-শক্তির বলেই নারী ঋতুমতী হইল বলা বোঝায় না।

আমি বলিয়াছি যে, পাঠ্যাবস্থায় বিবাহিত হইলে ছাত্রদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটে। মহামহোপাধ্যায় এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "সিংহ মহাশয়ের মতে পড়া শেষ করিবার পূর্ব্বে বিবাহ দিলে বালকের পড়াশুনা মাটী হয়; সে কেবল পত্নীর চিঠি পাইবার জন্য মেসে পড়িয়া দিন-রাত চিন্তা করে। বুঝিলাম। এ জন্য সমস্ত পরীক্ষার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বালকের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। সিংহ মহাশয় বলিতে পারেন কি—পরীক্ষার শেষ হইবে কত দিনে? এম্-এ দেওয়ার পরেও যে অনেক ছেলে ডাক্তারি শিখিতে যায়, ওকালতি দিতে যায়, এঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে যায়। আবার পি-আর-এস আছে, রিসার্চ্চ আছে। জন্মভরিয়াও যে পরীক্ষা শেষ হয় না....."আমি যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে কি এই বুঝায় যে, যাবতীয় ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পাশ করুক; অর্থাৎ পি-আর-এস্ হউক বা শেষ পরীক্ষা দিয়ে তার পর বিবাহ করুক? পণ্ডিতরাজ যে ইহার ভাবার্থ ধরিতে পারেন নাই, এজন্য দুঃখিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "এম্-এ দেওয়ার পরেও যে অনেক ছেলে ডাক্তারি শিখিতে, এঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে যায়। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিষয়ের উত্তর দিবেন যে, বাস্তবিক অনেক ছেলে এম্-এ দেওয়ার পর ওখানে পড়িতে যায় কি না। (বরং ৬' চারিজন এম্-এস্সি, এম্-বি বা এম্-এস্ সি, বি-ই হয়।) তিনি যদি শুধু ওকালতি কলেজের নাম করিতেন, তাহাতে কোন গোল থাকিত না। যাহা বলিতে হইবে, তাহার figures চোখের সাম্নে নিয়ে তর্ক করা উচিত। এমনি করে "অনেক" বলে পাঠকের চোখে ধাঁধা দেওয়া ভাল নহে। (আমি মেয়েদের বেলায় ১৬'র কমে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে বলিয়াছি। সেইরূপ ছেলেদের একটা বয়স নির্দ্দিষ্ট না করে দেওয়াতেই এত গোল হয়েছে।)

পণ্ডিতরাজ লিখিয়াছেন, "সিংহ মহাশয়ের যত

আপত্তি - বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ সকল ধর্ম্ম-পুস্তকেই যৌবন-বিবাহের সমর্থন আছে, বাল্য-বিবাহের নিষেধ আছে।" আমি বলিয়াছি, "ভারতের প্রকৃত গৌরবের দিনে হিন্দুশাস্ত্রে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল।" ("বাল্য-বিবাহের যে নিষেধ আছে" তাহা আমি কোথাও বলি নাই।) এই বলিয়া ক হইতে ছ অবধি যাহার মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও ব্যাখ্যা আছে, তাহা শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসুমল্লিকের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহা যে উদ্ধৃত, তাহাও পণ্ডিতরাজ দেখিতে পান নাই। পাঠক-পাঠিকারা দেখিবেন, পৌষ সংখ্যার ভারতবর্ষে ৪৯ পৃষ্ঠার ছ'এর নীচে quotation বন্ধ করা আছে, আর (১৭) নং রেফারেন্স্ দেওয়া আছে, এবং উহা কোথা হইতে উদ্ধৃত তাহা ঐ ঘরের ফুটনোটে দেওয়া হইয়াছে। আমার প্রবন্ধের অন্য ঘরে রহিয়াছে, তাহাতে ক'র আগে quotation দেওয়া আছে, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, ভারতবর্ষে ঘেটী ছাপা হইয়াছে, তাহাতে ক'র আগে quotation দেওয়া হয়, তাহা অবশ্য ছাপাইবার ভুল। তা যাহাই হউক, ক হইতে ছ অবধি পাঠ করিলে, কেহই পণ্ডিতরাজের মত রূপ সিদ্ধান্তে আসিবেন না যে, প্রবোধবাবু (যাঁহার কথাকে আমি উদ্ধৃত করিয়াছি) যৌবন-বিবাহই প্রচলিত ছিল, আর বাল্য-বিবাহের নিষেধ আছে—দেখাইয়াছেন। পণ্ডিত-রাজ তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার ভুল ধরিয়াছেন, (ভুল আছে স্বীকার করি) কিন্তু প্রবোধবাবু ইহাতে বলেন নাই যে, বাল্য বিবাহ আদৌ ছিল না। প্রবোধবাবু পৌরাণিক যুগের অবস্থা বলতে গিয়ে বরং বলেছেন, "কিন্তু এই পৌরাণিক যুগে নিয়মের কঠোরতা ভীষণাকারে ধারণ করিল। বাল্য-বিবাহ সমর্থন বিধান বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং ইহা সমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িল।.....কিন্তু এই যুগেও বাল্য বিবাহের কুফল দেখিয়া অস্ত্র-চিকিৎসাবিশারদ সুশ্রুত জলদ্ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন....." হইতে ৬'র ঘরে। পৌরাণিক যুগে বাল্য বিবাহের নিষেধ আছে বলা হল?

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকাতে এত যে প্রতিবাদ চলিতেছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ঢেউ কোন দিকে চলেছে। শুধু ইংরেজিভাষাপন্ন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজই যে যৌবন-বিবাহ সমর্থন করে তাহাও নহে। তাঁহাদের পিছনে অইংরেজি ভাষাপন্ন লোকও আছে।

আজকাল Legislative Assemblyতে বাল্যবিবাহের কুফল দেখাইয়া মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়াইবার আলোচনা চলিতেছে। সেদিন মাননীয় মিঃ এলেন Legislative Assemblyতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, পণ্ডিতরাজের সমালোচনার উত্তরের উপসংহার করিলাম:—

"Mr. Allen adduced from Mr. Martin's latest Census Report, evidence at once scientific and statistical of the evils, attributable to current practices. Mr. Martin himself, said Mr. Allen quoted Lankester, who on purely physiological grounds, considered that the advancement of the age to sixteen would have an immeasurably beneficial effect both on India's womans-hood and the country's children and its general physique. In Calcutta and in Bombay child-birh in 1921, entailed death for 25 mothers out of every 1,000-as compared with less than 4 per 1000 in England. Fortyseven thousand Indians died in the war and 660,000 Englishmen, and they were all proud of their heroic sacrifice. But what did the death of 25 Indian mothers per 1,000 entail for India? A saving of only 10 per thousand would mean three million, and of 20 per thousand between six and seven million lives saved every year. Not all this sacrifice was due to early marriage, but much of it was; and he thought the time had come to grapple with the evil."*

* The Statesman, March 1, 1924.

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ

অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার সেন গুপ্ত এম-আই-এম-ই

"আমি তোমার, তুমি আমার", না "আমিই তুমি, তুমিই আমি?" কি উত্তর দিব? উত্তর দিবে কে? দুইটী বস্তু—"আমি" ও "তুমি" লইয়াই বিচার। আমিই বা কে, আর তুমিই বা কে?

যদি বলি, আমি শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক ভাগবতরত্ন, তাহা হইলেও কথাটা ঠিক হইল না। কারণ, আমার নাম বা উপাধি আমি নই। ওগুলি যাহাই হউক না কেন, "আমি" নই, ওগুলি "আমার"। এই রকম অনেক বস্তুই আমার আছে। আমার দেহ, আমার হাত, আমার পা, আমার চোখ, আমার কাণ, আমার মন, আমার প্রাণ, ইত্যাদি। এগুলি সবই আমার। এরা কেহ "আমি" নই। তবে, আমি কে? আমি অমুকের পুত্র, অমুকের পৌত্র, অমুকের স্বামী, অমুকের পিতা, অমুকের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলেও বস্তুতঃ "আমি" সেগুলি হইতে ভিন্ন পদার্থ। তবে, আমি কে?

অপর পক্ষে, "তুমি"ই বা কে? আমিও যেমন আমাকে বলিয়া বুঝাইতে পারিতেছি না, তুমিও কি তাই? কেহ বলেন, তুমি ভগবান, জগদীশ্বর, অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত। কেহ বলেন, তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, কি এই রকম একটা কিছু। কেহ বলেন, বিচার ক'রে ক'রে, নেতি নেতি ক'রে বুঝে দেখ, তার পর ধারণায় আনতে পারবে যে, "আমি" ও "তুমি" কি বস্তু! কেহ বলেন, বিচারের দ্বারা "তুমি" ও "আমি"র মীমাংসা হইবে না। তাঁহারা বলেন, বিচার যখন "তুমি" ও "আমি" লইয়া, তখন তুমিও আছ, আমিও আছি। আর "তুমি" "আমি" যখন আছি, তখন তোমারও কিছু না কিছু আছে, আমারও কিছু না কিছু আছে। কয়েকটী সহজবোধ্য উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টীর আলোচনা করা যাউক।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ প্রভৃতি এক একটী সংখ্যা। গণিত-রাজ্যে ইহাদেরই বংশধরগণ বংশরক্ষা করিতেছে। ইহাদের আদি উৎপত্তির বিচার করিতে করিতে, শেষে দেখি যে, ১ হইতেই সকলের উৎপত্তি। ১কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে? তোমার আগে কি কেহ ছিল না?" দেখিলাম, ১ও অনেকগুলির

সমষ্টি। ১ এরও অর্দ্ধেক আছে, তাহারও অর্দ্ধেক $\frac{1}{4}$ আছে, তাহারও অর্দ্ধেক, তাহারও অর্দ্ধেক, এইরূপ অংশ বিভাগ করিতে করিতে শেষ ত' পাই না। ফিরিয়া আসিলাম ১এর কাছে। এখান হইতে ঊর্দ্ধপথে দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাই, ১এর দ্বিগুণ ২, তাহার দ্বিগুণ ৪, তাহার দ্বিগুণ, তাহার দ্বিগুণ, এইরূপ বাড়াইতে বাড়াইতে শেষ ত পাই না। ১ এর নিম্নে বা উর্দ্ধে, যে দিকেই যাই না কেন, বিচার করিতে করিতে এক অনন্ত অসীম বস্তুর সন্ধানে ছুটিতে থাকি।

একটী কেন্দ্র-বিন্দু সকল দিকে সমান বিস্তৃতি ছড়াইতে ছড়াইতে, যেমন পরিধির পর পরিধি বেষ্টিত হইয়া যত বড় একটী বৃত্ত বা গোলকই হউক না কেন, তাহার অভ্যন্তরে নির্দ্দিষ্ট স্বস্থানটীতে অবস্থান করিতে পারে, অথবা, সকলের বড় পরিধি-ক্ষেত্রটী সঙ্কুচিত হইতে হইতে, ক্রমে যেমন কেন্দ্র বিন্দুটীতে আসিয়া লীন হয়, সেইরূপ কেন্দ্র-বিন্দুটীকেও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে, একটী অতি ক্ষুদ্র পরিধি বেষ্টিত ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্র একটী কেন্দ্র-বিন্দুর বৃত্ত বলিয়াই মনে হইবে। পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্র-বিন্দুটী যেন সংখ্যা গণনার ১ এর মত। বৃত্তটী কেন্দ্রবিন্দু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু কেন্দ্রেরও কেন্দ্র-বিন্দু আছে।

চোখে দেখিতে পাই বা না পাই, একটী বৃত্তের কেন্দ্র স্থলে কেন্দ্র-বিন্দু চিহ্নিত করা থাকুক বা না থাকুক, যখন বৃত্ত আছে, তখন কেন্দ্র আছে, তা' সে স্থূল চক্ষুর গোচরেই থাকুক, অথবা অগোচরেই থাকুক। বৃত্তের পরিধির অস্তিত্ব জানিতে পারিলেই, কলে হউক, কৌশলে হউক, উহার স্থানটী অবগত হইয়া, সেখানে একটী কেন্দ্র-বিন্দু প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। উৎপত্তিস্থল একটী "সাকার" কেন্দ্র-বিন্দুই হউক, অথবা বায়ুপূর্ণ একটী বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থ "নিরাকার" কেন্দ্র-বিন্দুই হউক, একটীর পরিচয়ে আর একটীর তথ্য অবগত হইতে পারি। পরিধি থাকিলেই যেমন কেন্দ্রকেও থাকিতে হইবে, সে পরিধি অনাদি, অনন্ত, অব্যক্তই হউক, আর ক্ষুদ্রাতিতম, ধারণার অতীত, অণিমারও আদি বস্তু নিরাকার কেন্দ্র-বিন্দুই হউক, পরিধি বলিতে পারে যে, আমি আর কিছু নই, কেবল রাশি রাশি কেন্দ্রের সমষ্টি মাত্র। আবার কেন্দ্রও পরিধিকে বলিতে পারে যে, আমি যতক্ষণ সাকার ততক্ষণ আমিও তোমার মত একটী পরিধি, কিন্তু সব ভুলিয়া, এমন কি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া, একটুখানি চিনি অনেকখানি জলে গলিয়া যাওয়ার মত, যদি আমার একটী নিরাকার কেন্দ্রত্ব অনুভব করিতে পার, তাহা হইলে পরিধিই কেন্দ্র হউক, অথবা কেন্দ্রই পরিধি হউক, দেখিবে যে, সাকার কেন্দ্র-বিন্দুটী বড় হইতে হইতে শেষে অনন্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া, স্থূল দৃষ্টির অন্তরালে অনন্তের মাঝে অনন্তময়ের চরণ স্পর্শ করিয়া, তোমার অজ্ঞাতসারে তোমারই স্থূল দৃষ্টির সম্মুখে আবার একটী অতি ক্ষুদ্র বিন্দুরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

অপর একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। একটী পুষ্করিণীর জলে একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া, তরঙ্গ-বলয়গুলি যেমন পুষ্করিণীর চারি ধারে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ, বায়ুসমুদ্রে শব্দরূপ একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেও, তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সেগুলি বলয়াকারে পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রভেদ এই যে, জলের উপর তরঙ্গগুলি স্থূল দৃষ্টির সাহায্যে দেখিতে পাই, কিন্তু বায়ু-সমুদ্রে শব্দের তরঙ্গগুলি স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোধগম্য হয় না। এখানে একটী শব্দ করিলাম, তুমি শুনিলে, আমি শুনিলাম, ৫ হাত, ১০ হাত, হয় ত ২,০০০।১০,০০০ হাত দূরের লোক শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, অল্প হউক, অধিক হউক, সে শব্দ শুনিতে পাইল। কিন্তু ক্রমেই সে শব্দের তরঙ্গটী অনন্তের পানে ছুটিতে ছুটিতে, তোমার আমার সকলেরই নিকট হইতে দূরে—বহু দূরে চলিয়া গেল। কোথায় তা কে জানে! কিন্তু সত্যই কি সে একেবারে চিরজন্মের মত চলিয়া গেল, আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না? পুষ্করিণীর জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গের সৃজন করিলাম; কিন্তু সেগুলি পুষ্করিণীর পাড়ে লাগিয়া লাগিয়া কি শেষে চিরকালের মত মিলাইয়া গেল, আর তাহাদের সন্ধান পাইব না? একটী শুক্রবিন্দু জীব-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া মনুষ্য-মূর্ত্তিতে বাড়িতে বাড়িতে শিশু হইতে যুবা, যুবা হইতে প্রৌঢ়, প্রৌঢ় হইতে বৃদ্ধ হইয়া শেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহা কি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না?

তারবিহীন তাড়িৎবার্ত্তাবহের বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, এক স্থানে উৎপাদিত একটী ধ্বনি দূরে,

বহু দূরে শ্রুত হইতেছে। কলিকাতায় কেল্লার বসিয়া কল টিপিয়া 'টরে-টক্কা' শব্দ উৎপাদন করিলাম, সে শব্দগুলি জাপান, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশের বিজ্ঞান-মন্দিরগুলিতে, সমুদ্রের উপর জাহাজে জাহাজে শ্রুত হইতে লাগিল। সাধারণ তাড়িৎবার্ত্তাবহের যন্ত্র-কৌশলের ন্যায়, যেখানে ধ্বনি উৎপন্ন হইতেছে ও যেখানে উহা শ্রুত হইতেছে, এই দুইটী স্থান তার অথবা অন্য কোন স্থূল পদার্থের সূত্র দ্বারা বাঞ্ছিতঃ যুক্ত করা না থাকা সত্ত্বেও, শব্দগুলি অনন্তের মাঝে মিলাইয়া গিয়া, তোমার আমার মনে ধ্বংসের ছবি আঁকিয়া দিয়া, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতেছে। শব্দগুলি লক্ষ লক্ষ লোকের কাণের পাশ দিয়া, সূর্য্যকিরণের রশ্মিমালার ন্যায়, নিঃশব্দে ছুটীতে লাগিল,—সূর্য্যকিরণের রশ্মিগুলি যেমন অল্পে অল্পে শীতলতা পাইতে পাইতে দূরে, বহু দূরে বিস্তৃত হইতে থাকে, সেইরূপ শব্দগুলিও মৃদু হইতে মৃদুতর, তার পর মৃদুতম, তার পর সূক্ষ্মে অতি সূক্ষ্মে বিলীন হইয়া গেল,—কতকদূর পর্য্যন্ত শব্দগুলি শোনা গেল, কিন্তু তার পর আর শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রুত হওয়ার সম্ভাবনা রহিল না। তুমি আমি প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ লোকের কাণের পার্শ্ব দিয়া শব্দের তরঙ্গগুলি ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। সেগুলি যে সত্যই আমাদের কাণের পাশ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, তাহারও কোনও অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতেছি না। কিন্তু সত্যই কি সেগুলি চির-জীবনের মত অন্তর্হিত হইয়া যায়? না, যদি একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে তারবিহীন তাড়িৎবার্ত্তাবহের যন্ত্রকৌশলের দ্বারা শব্দগুলি স্থূল হইতে সূক্ষ্মে পরিণত হইয়া পুনরায় স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইত না!

প্রত্যক্ষই দেখিতেছি যে, ধ্বনিগুলি শূন্যে মিলাইয়া গিয়া, তোমার আমার নিকট অশ্রুত থাকিলেও, পুনরায় স্থূলদেহ ধারণ করিতেছে। শব্দের আবার স্থূলদেহ কি? কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, তোমার আমার পরিচয় যেমন নিজ নিজ রূপ বিশিষ্ট দেহখানি দ্বারা দিয়া থাকি, আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলে স্মরণমাত্রেই যেমন আমি তোমার মানসপটে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকি, সেইরূপ শব্দগুলিও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রুত হওয়া গেলেই তাহাদের স্থূলত্ব অনুভব করিয়া থাকি। বাঘ ডাকিতেছে অথবা মেঘের গর্জ্জন, ভেক ডাকিতেছে অথবা শিশুর ক্রন্দন, তাহা আমাদের কর্ণকুহরে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ রূপে প্রকটিত হয়। সেই "শুনতে-পাওয়া" শব্দগুলির স্থূলদেহ কি বস্তু, তাহা এইরূপে ধারণায় আনিতে পারি।

তারবিহীন তাড়িৎ-বার্ত্তাবহে এক প্রান্তে উৎপন্ন একটী শব্দ অপর প্রান্তে শ্রুত হওয়া যায়—তাহার কারণ, দুইটী স্থানেই সমগুণ সম্পন্ন দুইটী যন্ত্র রক্ষিত আছে। একটী যন্ত্র হইতে একটী ধ্বনি "আমি" আছি বলিয়া যেই জন্মগ্রহণ করিল, অমনি পরমুহূর্ত্তেই তোমাকে আমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া যাহারা তাহাকে চাহিতেছে, যাহাদের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিতেছে, সেইদিকে সে, একটী স্থানে একটী রূপে নয়, কিন্তু এক হইয়াও, বৃন্দাবনে সহস্র সহস্র গোপিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার ন্যায়, একই সময়ে অনন্ত স্থানে প্রকাশিত হইতে লাগিল। যেখানে প্রকাশিত হইল না, সেখানে ব্যাপ্ত হইয়া রহিল। যখন একটী যন্ত্র আর একটী যন্ত্রের সন্ধান পায়, তখন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যখন ইচ্ছা দেওয়া নেওয়া চলে। এইরূপ, ব্যাপ্তির ভিতর থেকে আর একটী যন্ত্র গজিয়ে উঠুক, সেও দেওয়া নেওয়া করিতে থাকিবে। এই প্রকার সমগুণসম্পন্ন যন্ত্র যেখানে যেখানে রক্ষিত আছে, সেই সেই স্থানেই শব্দগুলি শ্রুত হওয়া যায়। সেইরূপ, আমি এখানে বসিয়া বাক্যালাপ করিতেছি, তুমি আমেরিকায় বসিয়া উহা শুনিতে চাও, আমার ন্যায় সমগুণসম্পন্ন হও, শুনিতে পাইবে। বুদ্ধদেব বহু বৎসর পূর্ব্বে বায়ু-সমুদ্রে যে সকল বাক্যরূপ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গমালা ভাসাইয়া দিয়া গিয়াছেন, সেগুলি ধরিতে চাও ধর না, বুদ্ধদেবের ন্যায় সমগুণসম্পন্ন হও, বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে। এক বুদ্ধ, এক কৃষ্ণ, এক গৌরাঙ্গ, অনন্ত ক্ষেত্রে বিরাজ করিতে থাকিবে।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে বুঝিতে পারা যায় যে, স্থূল অর্থাৎ সাকার, সূক্ষ্ম অর্থাৎ নিরাকারে পরিণত হইয়া, পুনরায় স্থূলত্ব বা সাকারত্ব ধারণ করে। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের আলোচনা করিলেও ইহাই অনুভূত হয় যে, অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদের ও দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের অবস্থান্তর মাত্র। ভক্ত যতক্ষণ ভগবান হইতে নিজেকে পৃথক মনে করেন, ততক্ষণ ভক্ত ও ভগবান উভয়েরই দ্বৈতাবস্থা, এবং যে অবস্থায় ভক্ত ভগবানের ধ্যানে বিভোর হইয়া, আপনার বলিতে যাহা কিছু সকলই ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া, আপনার পার্থিব অস্তিত্ব ভুলিয়া যান, কেন্দ্র যেমন পরিধির সৃষ্টি করিয়া পরিধিবেষ্টিত ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে তথা ক্ষেত্রের সমুদায় স্থানটীতেই স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, ভক্ত ও ভগবানের তখনকার অবস্থাই অদ্বৈতাবস্থা। অদ্বৈতাবস্থায় অদ্বৈতবাদীর "তুমি" ও "আমি"র বিচার করিবার কেহই থাকে না, জিজ্ঞাস্য ও জিজ্ঞাসু এক হইয়া যায়।

বিশ্বামিত্র-মেনকা *

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

-প্রেরিত অপ্সরা কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ ব্যাপার
া শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী একখানি চিত্র অঙ্কন
য়াছেন। গাধী-নন্দন বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের
াদ পুরাণ-প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং উহা বাঙ্গলার হিন্দু
রই সুবিদিত। ব্রহ্মবলের নিকট বাহুবলের পরাজয়
র্শনের জন্যই হয় ত বা পুরাণকার ঘটনাটির অবতারণা
রিয়া থাকিবেন; কিন্তু আমরা হিন্দু মাত্রেই রামায়ণ-
ভারতাদি পুরাণের কথা বেদবাক্যের ন্যায় সত্য বলিয়া
শ্বাস করি; এবং সেই সকল পুরাণ-লিখিত বহু ব্যাপার
বলম্বনে বহু কাল হইতে বহু কাব্য নাটক লিখিত হইয়া
াসিতেছে, এবং ইদানীং বহু আলেখ্য অঙ্কিত হইতেছে।
প্সরা দ্বারা বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার তপো-
ঙ্গার্থ দেবগণের চেষ্টার চিত্র আজ প্রথম অঙ্কিত হয়
াই,—দক্ষিণ-ভারতের স্বনামধন্য শিল্পী রাজা রবি বর্ম্মা
র্ত্তৃক আর একখানি চিত্র অনেক দিন পূর্ব্বে দেখিয়াছি।
এক সময়ে উহার রঙীন্ ছাপা চিত্র হয় ত বাঙ্গলার ঘরে-
রে ছিল। সে চিত্রখানিতে শিল্পী উগ্রতপা বিশ্বামিত্র
ষির তপোমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইবার ঘটনা দেখাইয়াছেন।
সুরেন্দ্রনাথের কল্পনা যেন একটু বিভিন্ন পথে গিয়াছে।
রবি বর্ম্মার চিত্রে অপ্সরা বিজয়িনী,—সুরেন্দ্রনাথের কল্পনায়
ষির যোগবল তখন পর্য্যন্তও জয়যুক্তই রহিয়াছে।
চিত্র দর্শনান্তে দর্শকের চিত্তবৃত্তি যদি বিবেচনার বিষয় হয়,
মানুষের অন্তর্নিহিত সৎবৃত্তিনিচয়কে জাগ্রত করা যদি
শিল্পের একতম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমার বিবেচনায়
রবি বর্ম্মার "বিশ্বামিত্র-মেনকার" কল্পনা অপেক্ষা বর্ত্তমান
আলেখ্যের শিল্পীর কল্পনা উন্নততর। এ চিত্রে ঋষি
তপোমার্গ হইতে স্খলিত হইয়া পশ্চাত্তাপজনিত মনো-
বেদনায় হস্ত দ্বারা বদন আবৃত করিয়া দণ্ডায়মান নহেন।
ইহাতে মনোভবের প্রভাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই।
সুন্দরী, স্বর্ব্বেশ্যা মেনকার হাবভাব-কটাক্ষের কোন ক্রিয়াই
তপোনিবিষ্ট ঋষির চিত্তে প্রতিফলিত হইতে পারে নাই।
নাসাগ্রে-ন্যস্ত-দৃষ্টি, যোগাসনে সমাসীন, ধ্যানস্তিমিত-লোচন
ঋষি আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন; স্থির-যৌবনা মেনকার সর্ব্বপ্রচেষ্টা
পরাভূত; তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ঋষির অগোচর।

এই ঋষির তপোভঙ্গের প্রয়াস দেবগণ একাধিকবার
করিয়াছেন। একদা রম্ভা ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ঋষির
তপশ্চরণের বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য ইঁহার সন্নিধানে উপস্থিত
হইয়াছিলেন। সফলকাম হওয়া দূরের কথা, ঋষিকোপানলে
রম্ভা অযুত বৎসর ধরিয়া পাষাণী হইয়াছিলেন। এতাদৃশ
তপঃবীর্য্য-সম্পন্ন ক্রোধন ঋষির তপোভঙ্গের জন্য মেনকা
যখন আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন ঋষির ক্রোধ-ভয়-ভীতা
মেনকা দেবরাজের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন
যে, আদেশ প্রত্যাহৃত হউক, কিম্বা অপর কাহারও প্রতি
তপোবিঘ্ন ঘটাইবার ভার অর্পিত হউক,—মেনকা কর্ত্তৃক
কার্য্যোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা বিরল। ঋষির কঠোর
তপশ্চরণে দেবলোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে,—সুতরাং ইন্দ্র
নির্ব্বন্ধ সহকারে বারম্বার মেনকাকেই অনুরোধ করিতে
লাগিলেন। গত্যন্তরবিহীনা অপ্সরা তখন প্রার্থনা

* 'ভারতবর্ষে'র বর্ত্তমান সংখ্যার প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী মহাশয়ের 'বিশ্বামিত্র-মেনকা' চিত্র-দর্শনে লিখিত।

জানাইলেন যে, যথাকালে যেন পবনদেবতা তাঁহার অঙ্গাবরণ সূক্ষ্ম চেলাঞ্চল অপসারিত করেন, তপোবনে যেন অকাল-বসন্তোদয় হয়, বনবিহারী বিহঙ্গ সারঙ্গ সকলে যেন নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই দেবকার্য্যে মেনকার সহায়তা করে—অর্থাৎ উগ্রতপস্বী ঋষির যোগভঙ্গ সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। মহাভারতে মেনকা কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের উপক্রম ভাগ এইরূপেই লিখিত। সুতরাং আলেখ্যে সেই ঋষিকে অঙ্কিত করিতে হইলে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তপঃজ্যোতিঃ, স্তিমিত নেত্রের তারকায় সমাধির স্থৈর্য্য এবং সম্মুখে সমানীত সর্ব্বপ্রকার কামনার প্রতি একান্ত ঔদাসীন্য অঙ্কিত করিতে হইবে। আমার বিবেচনায় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ তাহাতে বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

মহাভারতের বর্ণনার অনুরূপ করিয়া এই চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে, মেনকাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা করিয়া অঙ্কন করিতে হইত। পবন-সঞ্চালিত পরিধেয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যখন লগ্না মেনকা দ্রুত পাদক্ষেপে চলিয়াছেন, সেই সময়ে ঋষির দৃষ্টিপথে তিনি পতিত হন,—ইহাই মহাভারতের বর্ণনা। শিল্পী তাহা না করিয়া যেরূপে মেনকাকে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শালীনতা-জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, অথচ চিত্রের মাধুর্য্য অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই। মেনকা বাম স্কন্ধের উড্ডীয়মান চেলাঞ্চল-প্রান্ত তাঁহার গ্রীবা দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া অঙ্গ হইতে এককালীন স্খলিত হইতে দেন নাই—ইহা দ্বারা শিল্পী স্ত্রীজনোচিত লজ্জাশীলতা অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। বস্ত্র যথাস্থানে ধরিয়া রাখিবার উৎকট চেষ্টা নাই, অতি সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে, ইহাই স্বাভাবিক এবং শিল্পীর তুলিকা সেই স্বভাবকে সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। চিত্রপটে বিশ্বামিত্র স্থাণুর ন্যায় অচল, মেনকার পদদ্বয়ে শিল্পী লীলায়িত মৃদুগতি সন্নিবেশিত করিয়া, তাঁহার পবন-বিতড়িত পরিধেয়ের পশ্চাদ্ধাবন ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন,—ইহা শিল্পীর তুলিকা-সঞ্চালনের দক্ষতার পরিচায়ক।

স্বর্গের অপ্সরাগণ চিরযৌবনা। তাহাদের যৌবন-সুলভ রূপ-মাধুরী এবং অঙ্গসৌষ্ঠব চিরস্থায়ী—ইহাই পুরাণ প্রসিদ্ধি। ইহাদের মধ্যেও উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা সুন্দরী-প্রধানা ও অক্ষুণ্ণ-যৌবনা। পুরাণ-বর্ণনা অবিকৃত রাখিতে হইলে হয় ত মেনকাকে ষোড়শী করিয়া আঁকিতে হইত, কিন্তু শিল্পী স্বীয় কল্পনার সহায়তায় মেনকার আননে সমাগত-প্রায় প্রৌঢ়ত্বের অনুপম শ্রী আঁকিয়া দিয়াছেন। মর্ত্তই হউক বা স্বর্গই হউক, নিসর্গের নিয়ম-পরিচালিত হইতেই হইবে—ইহাই শিল্পীর বর্ণিকা-স্পর্শে প্রকটিত হইয়াছে।

শিল্প বিষয়ে আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ। সঙ্গীত-শা অনেকের জানা না থাকিতে পারে; কিন্তু সুমধুর সঙ্গী শ্রবণ করিলে তাহার মাধুর্য্য অনুভব করা স্বাভাবিক আমারও তদ্রূপ সুরেন্দ্রনাথের এই চিত্রখানি ভা লাগিয়াছে। ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই অনধিকারী হইয়া মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইল তাহাই কোনরূপে প্রকা করিবার চেষ্টা করিলাম। অভিজ্ঞগণ আমার এ ধৃষ্টত মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। কাব্য রচনা অপেক্ষাও আমার নিকট চিত্রাঙ্কন কঠিন বলিয়া মনে হয়। এই কঠিন বিষয়ে যে যতটুকু সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহাই আদরের সামগ্রী। পুরাকালে হয় ত আমাদের দেশে চিত্রবিদ্যা বহু উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল,—কালবশে তাহার অনেক নিদর্শন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ, গগণেন্দ্র, শ্রীমান্ যামিনীপ্রকাশ আমাদের দেশের গৌরব। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের যুবকগণ উৎসাহের সহিত কলাবিদ্যার অনুশীলন করিলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে,—সেই আশায় দেশের যুবকগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা যেন লেখনী অপেক্ষা তুলিকাকে হেয় মনে না করেন, এবং শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ভগীরথ যেমন কঠোর তপস্যা দ্বারা শিব-জটানিস্যন্দিনী মন্দাকিনীধারাকে ভূতলে আনয়ন করিয়া ভস্মাবশিষ্ট সগর-সন্তানের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি ধ্যান-পরায়ণ হইয়া তোমার অন্তরের অন্তঃসলিলা ভাবধারাকে তোমার তুলিকা-নিস্যন্দিত বর্ণবিন্দুনিষেকে পরিপুষ্ট করিয়া তোল,—বাঙ্গলার অধুনা-ঊষর হৃদয়-ক্ষেত্রের উপর দিয়া সেই সঞ্জীবন--রস-ধারার তরঙ্গ-ভঙ্গ অবাধ নৃত্যলীলায় বহিয়া যাউক।

দারজিলিংয়ের আশে-পাশে

(দৃশ্যাবলী)

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র মজুমদার

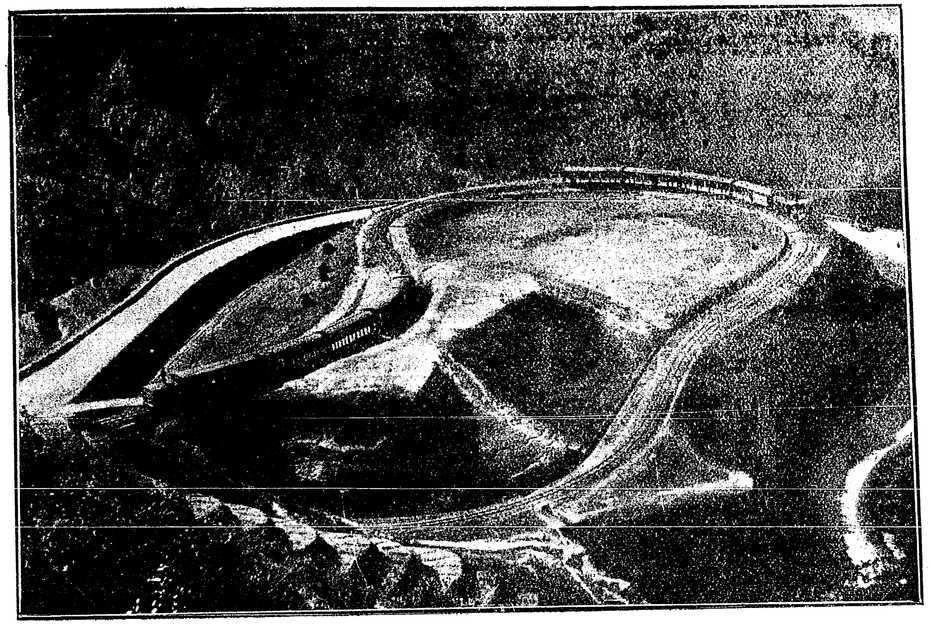

বাতাসিয়া লুপ—দারজিলিংয়ের পথে

সেভোকের দিকে তিস্তানদী

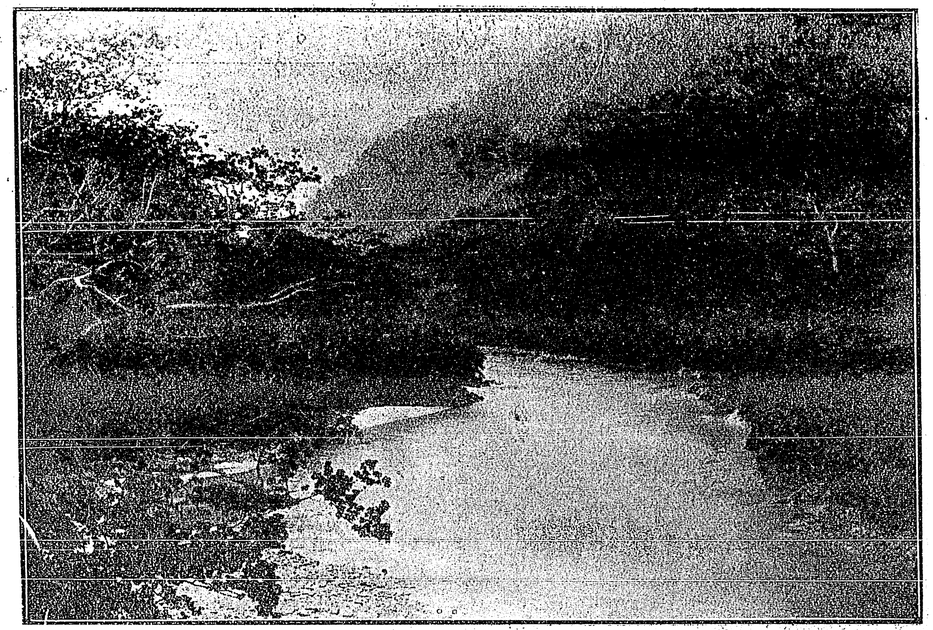

কালিম্‌পংয়ের দিকে তিস্তানদী

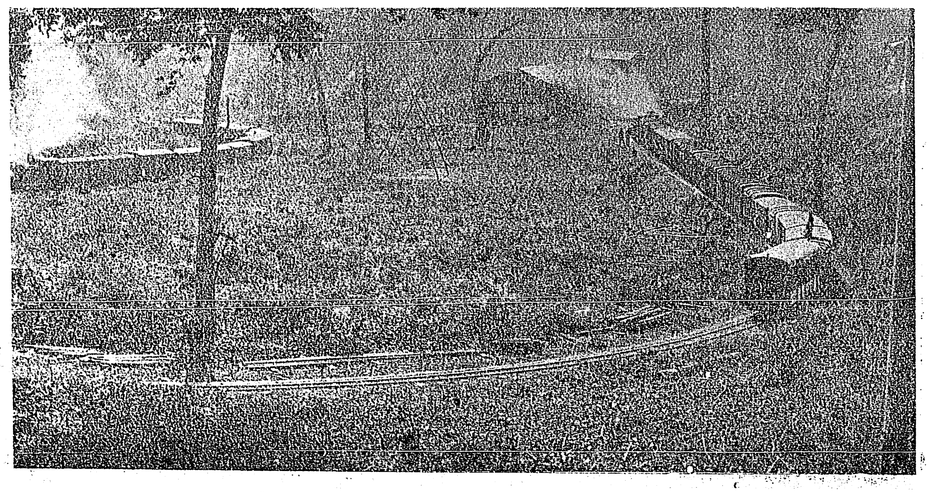

রায়াং লুপ—তিস্তা শাখা রেলপথে

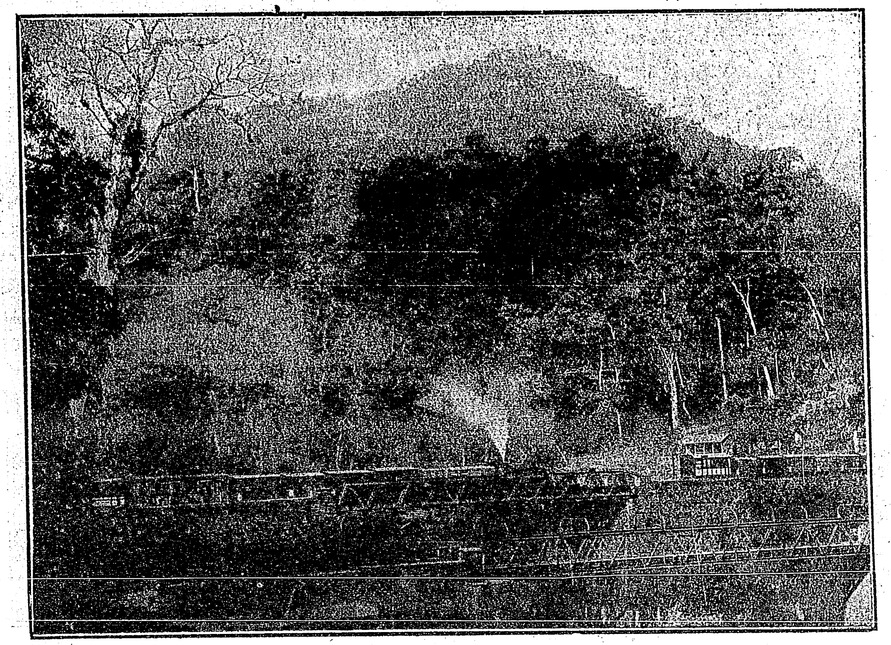

কালীঝোরা

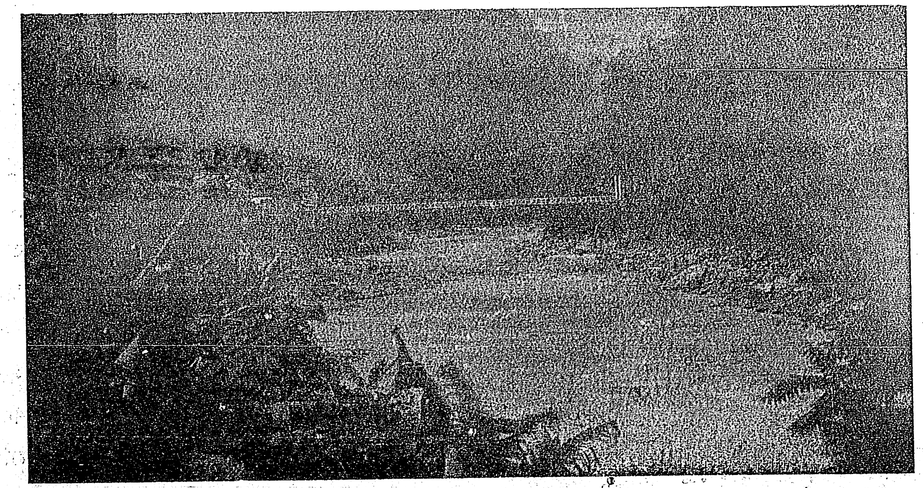

তিস্তানদীর উপর ঝোলা-সেতু

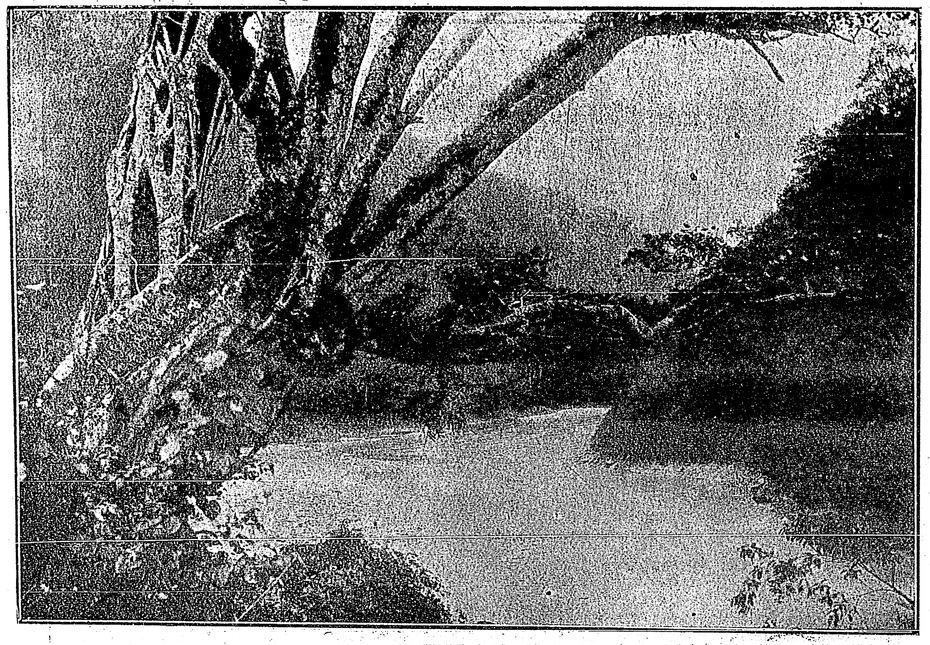

রায়াংয়ের নিকট তিস্তানদী [বন এবং টস্‌, কর্ত্তৃক গৃহীত]

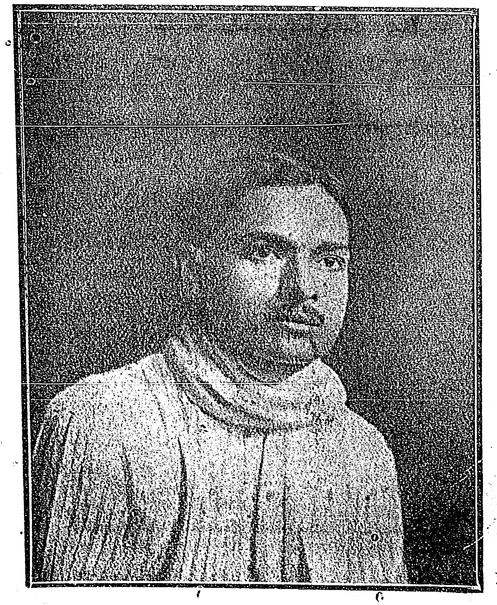

ভাস্কর শ্রীমতিমোহন দত্তগুপ্ত

নবীন ভাস্কর শ্রীমতিমোহন দত্তগুপ্ত

এই সঙ্গে যে কয়েকখানি চিত্র প্রদত্ত হইল, সেগুলি নবীন ভাস্কর শ্রীযুক্ত মতিমোহন দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রস্তর ও প্লাষ্টারে নির্ম্মিত। শ্রীযুক্ত মতিমোহন নবীন যুবক। বাল্যাবধিই তাঁহার ভাস্কর্য্যের দিকে ঝোঁক ছিল; বার-তের বৎসর বয়সেই তিনি ভাল ভাল ছবি আঁকিতে পারিতেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া তিনি জুবিলি আর্ট স্কুলে প্রবিষ্ট হন। কিছুদিন পরেই তিনি ছবি আঁকিবার পথ ত্যাগ করিয়া ভাস্কর্য্যে মনোনিবেশ করেন; এই সঙ্গে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলিই তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন। এক্ষণে তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে আর্কিওলজিক্যাল বিভাগে মডেলারের কার্য্য করিতেছেন। আমরা এই নবীন ভাস্করের উন্নতি প্রার্থনা করি।

পরলোকগত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

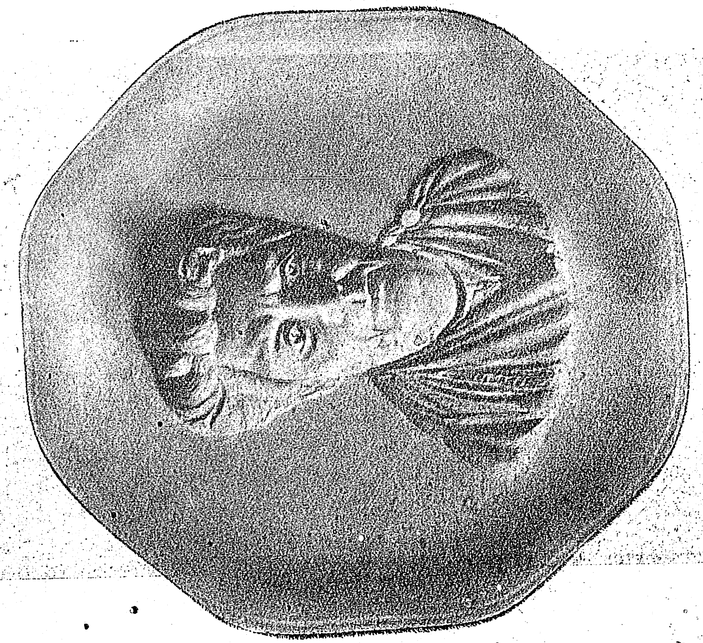

ভগিনী নিবেদিতা

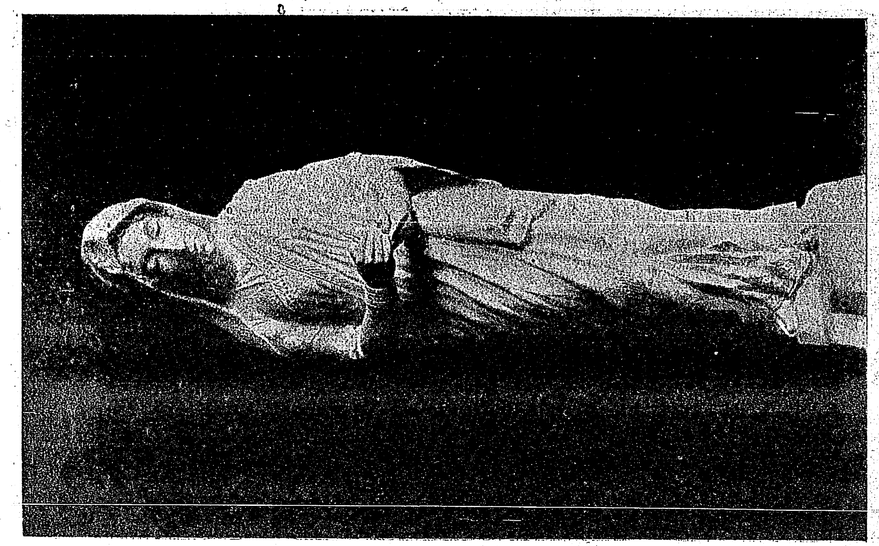

সাঁঝের বাতি

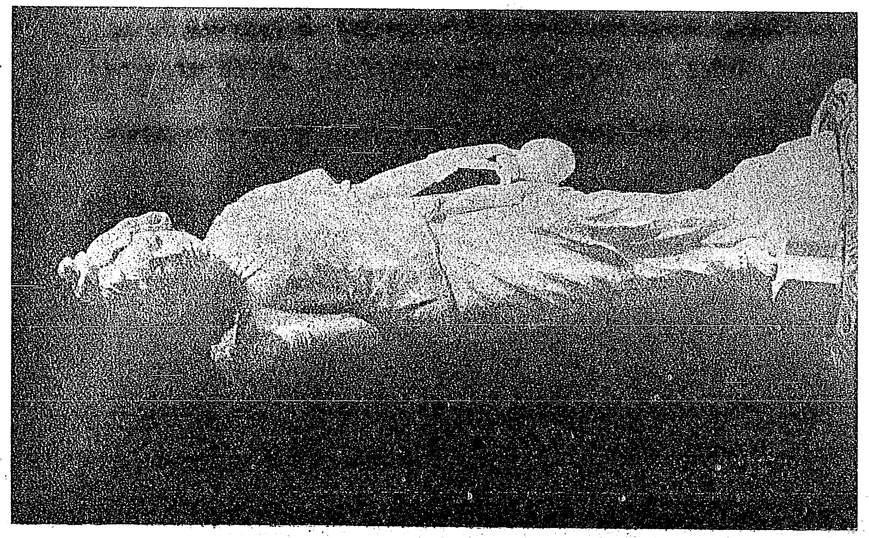

পূজার্থিনী

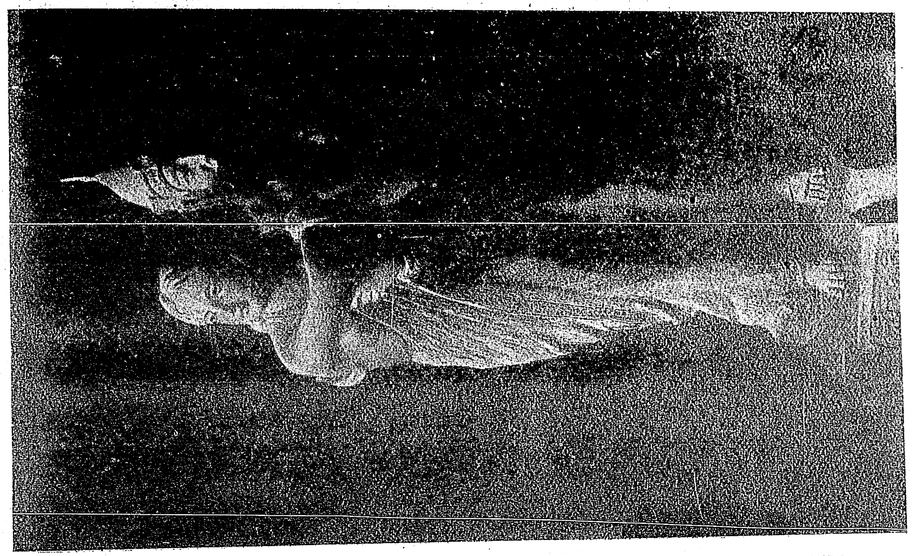

শচী ও রুদ্রপীড়

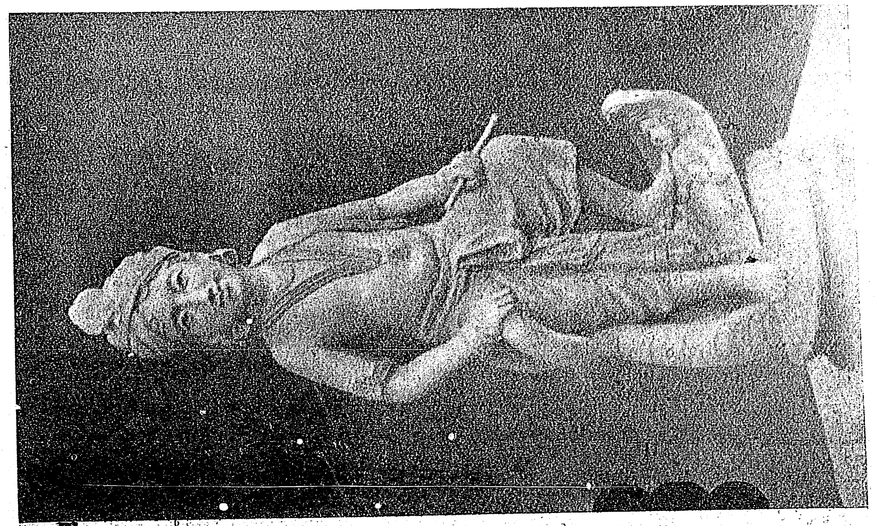

কালীয় দমন

উষা ও দিবা

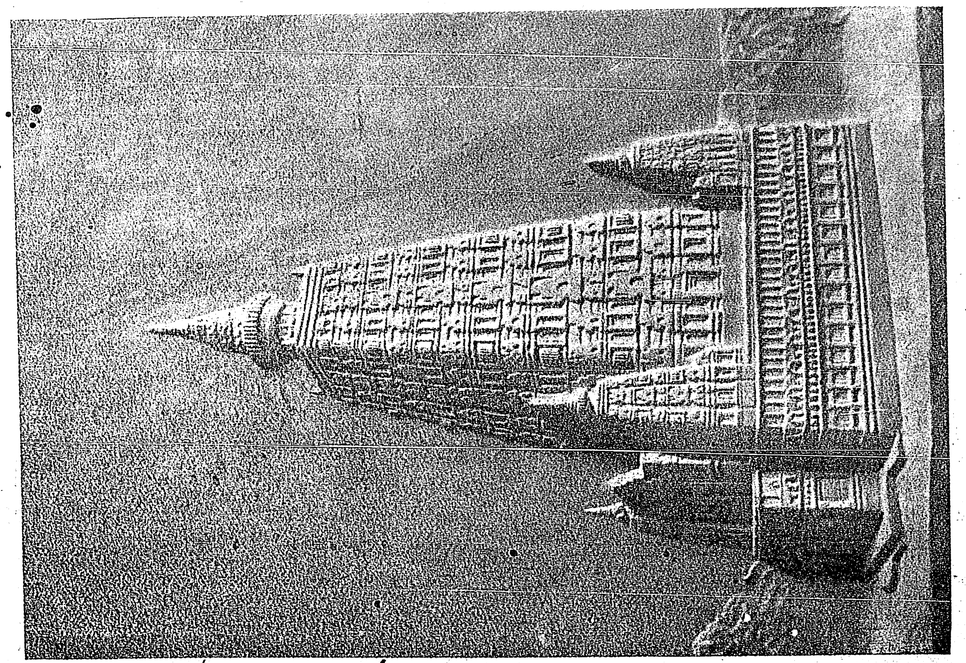

বুদ্ধগয়া মন্দির

অমলা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১৪)

অফিসের ছুটির পর হরমোহন পুনরায় প্রমথর হোটেলের উদ্দেশে চলিলেন। সহকর্ম্মচারিদের নিকট একশত টাকা ধারের জন্য চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হওয়ার পর, তাঁহার মনে সেদিনের আত্মমর্য্যাদা অথবা আত্মাভিমানের জন্য কোনও বালাই আর ছিল না। কিস্তির টাকা যথাসময়ে না পাইলে বণিকলাল যে মূর্ত্তি ধারণ করিবে, তাহা কল্পনা করিয়া হরমোহন স্থির করিলেন যে, আজ যে প্রকারেই হউক, প্রমথকে গৃহে লইয়া যাইবেন; এবং সে কার্য্য একান্ত করিতে না পারিলে, অগত্যা যে কার্য্য করিবেন, মনের নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়া লুকাইয়া তাহাও এক প্রকার স্থির করিয়া লইলেন।

পথে যাইতে যাইতে যাচনা সম্বন্ধে একটা পুরাতন শ্লোক মনে পড়িয়া গেল—

বেপথুর্মলিনং বক্ত্রং দীনবাক্ গদ্‌গদস্বরঃ।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচনে॥

কিন্তু স্বভাবের উপর অভাবের উৎপীড়ন এমনই প্রবল যে, উপরিউক্ত শ্লোকটি মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে, হরমোহন প্রমথর হোটেলের দিকেই উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

হোটেলের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। চক্রবর্ত্তীকে নমস্কার করিয়া হরমোহন প্রমথর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রমথর আকস্মিক হোটেল-ত্যাগের সহিত হরমোহনের গত কল্যকার আগমনের কোন প্রকার যোগ ছিল মনে করিয়া, হরমোহনের প্রতি চক্রবর্ত্তী বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। রুক্ষস্বরে বলিল, "তিনি এখান থেকে উঠে গেছেন।"

বিস্মিত হইয়া হরমোহন বলিলেন, "উঠে গেছেন? একেবারে না কি?"

"একেবারে কি দুবারে তা বলতে পারিনে মশায়; উঠে গেছেন তাই জানি!"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেছেন বলতে পারেন?"

উত্তর দিতে গিয়া সহসা চক্রবর্ত্তীর উভয় দন্তপঙ্‌ক্তি বাহির হইয়া পড়িল। আনন্দ, বিস্ময় অথবা ক্রোধ—যে কোনও মানসিক উত্তেজনার কালে এ ব্যাপার ঘটিত।

"কোথায় গেছেন আপনিই ত' তা জানেন মশায়! আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

বারম্বার এরূপ দুর্ব্বিনীত উত্তরে হরমোহন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "রসিকতা করবার জন্যে জিজ্ঞাসা করছি! সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ঠাণ্ডা হবার জন্যে আপনাকে খুঁজে বার করেছি কি না? তাই!"

হরমোহন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া পুনরায় চক্রবর্ত্তীর দন্তোচ্ছ্বাস হইল,—এবার কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন উত্তেজনায়। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "রাগ করবেন না মশায়; নানান্ লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার বাক্যি একটু তিরিক্ষি হয়ে গেছে। চাটুয্যে মশায় কোথায় গেছেন, তা বলে যান নি; বোধ হয় বাড়ীই গিয়ে থাকবেন।"

হরমোহনেরও মনে হইল, পুনরায় অসুস্থ হইয়া প্রমথ বাড়ী গিয়াই থাকিবে; বলিলেন, "আজ সকালে কি তার জ্বর ছিল?"

"দেহে ত' কাঁচ লাগিয়ে দেখি নি, কেমন করে বলব বলুন?" সঙ্গে সঙ্গে নিমেষের জন্য বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত একবার দন্ত-স্ফুরণ হইয়া গেল।

চক্রবর্ত্তীর প্রতি অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, এবং মনে মনে তাহাকে অভিসম্পাত দিয়া, হরমোহন পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে যাইতে যাইতে এক একবার মনে হইতে লাগিল, প্রমথ যদি তাঁহারই গৃহে গিয়া থাকে। কিন্তু অতটা আশা করিতে সম্পূর্ণ সাহস হইতেছিল না।

গৃহে পৌঁছিয়া প্রমথকে দেখিবামাত্র হরমোহনের মন হইতে সমস্ত চিন্তারাশি অপসৃত হইয়া গেল। তিনি যে

প্রমথর হোটেল হইয়া আসিতেছেন সে কথা লুকাইলেন; কিন্তু প্রমথকে দেখিয়া মনের অধীর আনন্দ লুকাইবার কোনও চেষ্টা করিলেন না।

অদূরে দাঁড়াইয়া অমলা পিতার এই পরিপুষ্ট প্রসন্নতার অন্তর্নিহিত কঙ্কাল-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল! এই মাত্রাতিরিক্ত অভিনিবেশ ও আতিথেয়তার মূলে, এক পক্ষের কতখানি উপায়বিহীনতা এবং অপর পক্ষের কতখানি যথেচ্ছাচারিতার শক্তি রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া সে একটা অননুভূতপূর্ব্ব অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। অপরিমেয় অধিকার লইয়া তাহাদের গৃহে আজ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও, প্রমথ অধিকার পরিচালনার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে না দেখিয়া, অমলা কিছুমাত্র আশ্বাস পাইল না। কোষ-নিবদ্ধ তরবারি যে কোনও মুহূর্ত্তে কোষ হইতে বাহির হইয়া সংহার করিতে পারে, তাহা সে জানিত। প্রমথর অস্ত্রের একদিকে ছুরী এবং অপর দিকে চামর; এবং এই অদ্ভুত অস্ত্র সে এমন ক্ষিপ্রতার সহিত পরিচালনা করিতে জানে যে, কখন্ যে সে ছুরী চালায় এবং কখন্ যে সে চামর চুলায়, তাহা বুঝিতেই পারা যায় না!

প্রমথ কোন্ ঘরে থাকিবে তাহা লইয়া সন্ধ্যার পর বিবাদ বাধিয়া গেল। প্রভাবতী দ্বিতলের একটা ঘর পরিষ্কার করিয়া প্রমথর থাকিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন; কিন্তু প্রমথ তাহাতে সজোরে আপত্তি করিয়া বসিল।

সে বলিল, "অত হাঙ্গামা করবার কোন প্রয়োজন নেই মাসিমা, আমি বাইরের ঘরে থাক্‌ব। রাস্তার ধারে ঘর, সে আমার বেশ সুবিধা হবে।"

কথাটা যে সর্ব্বৈব উপেক্ষনীয়, সেই ভাবে প্রভাবতী ও হরমোহন হাসিতে লাগিলেন; এমন কি, অমলারও মনে হইল যে, সকলে দ্বিতলে থাকিয়া একমাত্র প্রমথ নীচে শয়ন করিলে ব্যাপারটা একটু দৃষ্টি-কটু হইবে।

হরমোহন কহিলেন, "ওপরে চারখানা ঘর থাক্‌তে তোমার নীচে থাকবার কোনই কারণ নেই।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "সেই জন্যেই আমাকে নীচে থাকতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত। ওপরে ঘরের যদি অভাব থাক্‌ত, তাহলে আমাকে নীচে থাকতে দিতে ইতস্ততঃ করতে পারতেন। কিন্তু সে অসুবিধে যখন একেবারেই নেই, তখন বুঝতে পারছেন, নীচে থাকাটাই আমি বেশী রকম সুবিধা মনে করছি।"

হরমোহন ও প্রভাবতী এ বিষয়ে অনেক জিদ্ করিলেন; কিন্তু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি প্রমথর এমন প্রচুর পরিমাণে ছিল যে, অবশেষে বাহিরের ঘরেই তাহার শয়নের ও থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইল।

পর দিন অমলা একটু সহজ ভদ্রতা করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "কাল রাত্রে গরমে হয় ত খুব কষ্ট হয়েছিল? বাইরের ঘরে হাওয়া তেমন আসে না ত; ওপরের ঘরেই থাকলে হোত।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "মেস থেকে ত বাড়ীতে টেনে এনেছ, আরও কাছে নিয়ে যেতে সাহস হয় তোমার?"

প্রমথর কথা শুনিয়া অমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিল, "ভয়ই বা কেন হবে, তুমি ত' আর ভূত নও প্রমথদাদা!" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

প্রমথ এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিল, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভূত হলে ত ভয়ের কথা ছিল না অমলা,—আমি তোমার ভবিষ্যৎ, সেই জন্যেই যে ভয়!"

অমলা মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিন্তু আমার ত' ভয় হবার কথা নয় প্রমথদাদা? মার কাছে তুমি কড়ার করে রেখেছ যে, ভবিষ্যতে আমার একটা বড় রকমের ভাল করবে!"

প্রমথ তাহার কৌশল মত কণ্ঠস্বরটা সহসা গাঢ় করিয়া লইয়া বলিল, "তোমার ভাল করি, কি আমার ভাল করি, তার ঠিক কি? ভবিষ্যৎটা এমন অনিশ্চিত যে, তার ওপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই!"

অমলা কিন্তু পূর্ব্বের মত শান্তকণ্ঠে বলিল, "বিশ্বাস না করলেই হোল। আমি যে বিশ্বাস করব, তা তোমাকে কে বললে?"

"অতটা শক্ত হতে পারবে?"

"এমন বেশী কিছু শক্তির দরকার হবে কি? আমার ত' মনে হয় এমনি সহজভাবে থাকলেই চলবে।"

বিস্মিতনেত্রে ক্ষণকাল অমলার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া প্রমথ বলিল, "তা থাক্‌তে পারবে?"

তরল মিষ্ট-হাস্যের সহিত অমলা বলিল, "মনে ত হয়, পারব!"

এ কথার কোন উত্তর প্রমথর মুখ দিয়া বাহির হইল না; মনে মনে বলিল, 'তা যদি পার, তাহলে বুঝব তোমারই সঙ্গে খেলাটা সেরা খেলা হোল!'

* * * * *

কথাগুলা কিছু অস্পষ্ট ভাবে হইলেও, অমলার বক্তব্যটা মোটামুটি বুঝিতে প্রমথ ভুল করিল না। তাহার সহিত একটা সংঘর্ষ অনুমান করিয়া অমলা যে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রমথ বুঝিল; এবং অমলার কথোপকথন করিবার সহজ ভঙ্গী দেখিয়া এ কথাও সে বুঝিল যে, অমলাকে পরাজিত করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে না। বিদ্যুৎ-প্রবাহ বাধা পাওয়ায় সূক্ষ্ম তার যেমন দীপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি প্রমথর মন সম্ভাবিত বাধার কল্পনায় জ্বলিয়া উঠিল। দুর্লভ মনে হইবামাত্র লোভের মাত্রা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল!

কিন্তু লাভ করিবার একটা কৌশল হইতেছে, লোভটাকে যথাসম্ভব লুকাইয়া রাখা। মাছ-তরকারীর বাজারের দর-দস্তুর করিবার ফন্দি মানসিক বাজারের কেনা-বেচার ব্যাপারে অনেক সময়ই প্রয়োগ করা চলে। তদনুসারে, প্রমথ তাহার আগ্রহকে একেবারে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই সে গৃহের বাহিরে কাটাইতে লাগিল; এবং যতটুকু সময় গৃহে থাকে, বাহিরের ঘরে তাহার নানাপ্রকার হিসাব-পত্র লইয়াই ব্যস্ত থাকে। প্রতি দিন অন্ততঃ দুই তিনবার করিয়া অমলার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় বটে, কিন্তু প্রতিবারই কোন-না-কোন কারণে অমলার তাহার কাছে যাইবার প্রয়োজন হয় বলিয়া। সাক্ষাৎ হইলে কথাবার্ত্তা যাহা হয় তাহাও অত্যন্ত মামুলী ধরণের।

অমলা বলে, "প্রমথদাদা, আর নাইতে দেরী করলে অসুখ করবে।"

কাগজ-পত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রমথ বলে, "এই উঠলাম বলে, আমার তেলটা বারাণ্ডায় রেখে দাও।"

আহারের সময়ে অমলা বলে, "রামভদ্দর ঠাকুরের চেয়ে এ বাড়ীর রান্না ভাল, তা ত তোমার খাওয়া দেখে একটুও বোঝা যায় না প্রমথদাদা?"

প্রমথ হাসিয়া বলে, "সেটা বুঝতে হলে মেসের খাওয়াটাও তোমার দেখা দরকার ছিল।"

সকালে চা হস্তে অমলা আসিয়া দাঁড়াইলে, প্রমথ অন্যমনস্ক ভাবে তাহার হস্ত হইতে চায়ের বাটি লইয়া ধীরে ধীরে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখে; এবং বৈকালে জলখাবারের রেকাব লইয়া প্রবেশ করিলে, প্রমথ হয় ত বলে, "মাসিমার কাছে রেখে দাওগে অমলা, দরকার যখন হবে চেয়ে নোব।"

এই ভাবে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর এক দিন সকালে জানা গেল যে, প্রমথ পুনরায় অসুস্থ হইয়াছে।

হরমোহন আসিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে তোমার প্রমথ?"

প্রমথ একটা ফিকা আসমানী রংএর আলোয়ানে পদদ্বয় আবৃত করিয়া শয্যার উপর বসিয়া ছিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "বিশেষ কিছু নয়; কাল রাত্রে বোধ হয় একটু জ্বর হয়েছিল, আর হাঁটু দুটোয় একটু বেদনা হয়েছে। বোধ হয় বাতের মত কিছু হবে।"

প্রভাবতী চিন্তিত স্বরে বলিলেন, "ওমা এত অসুখ, আর বলছ বিশেষ কিছু নয়? থার্ম্মোমিটার লাগিয়ে জ্বর আছে কি না দেখ।"

হরমোহন কহিলেন, "এ অসুখটা হোল শুধু তোমার জেদের জন্যে প্রমথ। একতলার ঘরে শুয়ে বাত টেনে আনলে!"

প্রমথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, তার জন্যে নয়, আমার একটু বাতের ধাতই আছে।" তাহার পর কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কেন, এ ঘর ত' তেমন কিছু ঠাণ্ডা নয়, বেশ খট্‌খটে।"

"আচ্ছা বেশ, খট্‌খটে ঘর খট্‌খটেই থাকুক, তুমি এখনি ওপরে চল।"

অদূরে অমলা দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার দিকে চাহিয়া হরমোহন বলিলেন, "অমল, দক্ষিণ দিকের ঘরটা প্রমথর জন্যে পরিষ্কার করিয়ে ফেল।"

প্রমথ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, না, এখন পরিষ্কার করাবার দরকার নেই। পায়ে যে রকম ব্যথা, সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে যেতেও পারব না। ব্যথা একটু কমলে, পরে যেমন হয় করলেই হবে।"

কিন্তু পর দিন প্রমথকে দেখিতে আসিয়া ডাক্তারও

যখন একতলার ঘরে থাকায় আপত্তি করিলেন, তখন হরমোহন আর কোন আপত্তিই শুনিলেন না, জোর করিয়া প্রমথকে উপরে লইয়া গেলেন।

অমলা বলিল, "পা-টাকে খোঁড়া না করে আগে ওপরে এলেই ভাল হত।"

প্রমথ হাসিয়া বলিল, "অনেক সময়ে খোঁড়া পায়ে এমন সব দুর্গম যায়গায় যাওয়া যায়, যেখান ভাল পায়ে যাওয়া যায় না। পা থাকতে ত আর লোকের কাঁধে ওঠা চলে না!"

অমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু ওপরের ঘর কোন দিনই ত' তোমার পক্ষে দুর্গম ছিল না।"

"না থাকলেও, ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়ার আরও একটু সুগম হ'ল না কি?" বলিয়া প্রমথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

প্রসঙ্গটাকে প্রমথ জটিল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া অমলা প্রসঙ্গান্তরে গমন করিল। তৎপরে, তাহাতেও অব্যাহতি না পাইয়া, অগত্যা কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

প্রমথকে আসিবার জন্য চিঠি লিখিবার পর, অমলা মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল সত্য, তথাপি, ব্যাঘ্রের পিঞ্জর হইতে ব্যাঘ্রকে নিজের পিঞ্জরে আসিতে দেখিয়া খেলোয়াড় যেমন প্রথমটা ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠে, তেমনি কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রমথ আসার পর তাহাকে দেখিয়া অমলা ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তৎপরে তাহার মন হইতে সে উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। আজ প্রমথকে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া অমলা পুনরায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। একবার মনে হইল, প্রভাবতীকে সব কথা খুলিয়া বলে। কিন্তু অভিযোগের কারণ তখন পর্য্যন্ত এমন কাল্পনিক ছিল যে, অভিযোগ করিবার যথোপযুক্ত ভাষা অমলা খুঁজিয়া পাইল না। তাহা ছাড়া মনে হইল যে, অর্থ দ্বারা পিতাকে এবং আশা দিয়া মাতাকে প্রমথ এমন প্রবল ভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিনা অনুসন্ধানেই নামঞ্জুর হইয়া যাইবে।

(১৫)

রোগ হইতে মুক্ত হওয়ার কয়েক দিন পরে প্রমথ কোনও বিশেষ কার্য্যে কাশী যাত্রা করিল।

রওয়ানা হইবার কিছু পূর্ব্বে অমলার হস্তে একটা চাবির রিং দিয়া প্রমথ বলিল, "আমার ট্রঙ্ক আর ক্যাশ বাক্সর চাবী দুটো তোমার কাছে রইল অমলা। "ফিরে এসে নোব।"

অমলা একটু ইতস্ততঃ করিল বলিল, "তোমার সঙ্গেই রাখ না কেন প্রমথ দাদা?"

প্রমথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "সঙ্গে রেখে ত' কোনো লাভ নেই, যখন বাক্স দুটোই সঙ্গে রাখছিনে। লাভের মধ্যে শুধু হারিয়ে আসবার একটা ভয় আছে। তা ছাড়া একটা কারণে চাবীটা তোমার কাছে থাকাই দরকার।"

উৎসুক নেত্রে প্রমথর দিকে চাহিয়া অমলা বলিল "কি কারণে?"

একখানা মণিঅর্ডারের ফরম্ অমলার হস্তে দিয়া প্রমথ বলিল, "এ ফরম্টায় সবই ভরা আছে। কাশী পৌঁছে আমি যদি তোমাকে চিঠি লিখে জানাই, তা হলে ক্যাশ বাক্স থেকে দুশো টাকা বার করে, মেশো মশাইকে দিয়ে আসছে সোমবারে মণিঅর্ডারটা করিয়ে দিয়ো। আর আমার চিঠি যদি না পাও, তা হলে বুঝবে যে, আর মণি-অর্ডার করবার দরকারই হবে না।"

অমলা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "এ তুমি তা হলে বাবাকেই দিয়ে যাও না প্রমথদাদা?"

প্রমথ ব্যস্তভাবে কহিল, "না, না, মণিঅর্ডার করতে হবে, কি হবে না, তার যখন ঠিক নেই, তখন আগে থাকতে মেশো মশায়কে ফরমাস করে যাওয়া ঠিক হবে না। তা ছাড়া তোমার পক্ষে এটুকু ভার নিতে আপত্তির কারণ কি হচ্ছে?"

এমন স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে আপত্তির কারণ কি হইতেছে তাহা বলা চলে না; অগত্যা অমলাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

প্রমথ বলিল, "ক্যাশবাক্সে দুশোর চেয়ে অনেক বেশী টাকা আছে; যদি দরকার মনে কর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখো।"

অমলা বলিল, "মার লোহার সিন্দুকে রাখিয়ে দোব।"

প্রমথ স্মিতমুখে বলিল, "তা যা হয় কোরো, তবে লোহার সিন্দুকে রাখবার মত অত টাকা নেই।"

গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে প্রমথ প্রভাবতীকে প্রণাম করিলে, প্রভাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক দিনে ফিরে আসছ বাবা?"

প্রমথ বলিল, "সম্ভবতঃ সাত আট দিনের মধ্যে।"

কিন্তু সাত আট দিনের দ্বিগুণ সময় কাটিয়া গেল তথাপি প্রমথ ফিরিল না।

পরবর্ত্তী কিস্তির তারিখ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাণিক-লাল যথানিয়মে প্রত্যহ তাগাদায় আসিয়া হরমোহনকে নিপীড়িত করিতেছে, এবং হরমোহন প্রমথর ওজুহাতে একদিন একদিন করিয়া তিন চার দিন সময় লইয়াছেন; এমন সময়ে হরমোহনের জবাবী তারের উত্তরে কাশী হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রমথ কয়েক দিন হইল কার্য্যোপলক্ষে জৌনপুর গিয়াছে!

তার পাঠ করিয়া হরমোহন অর্দ্ধভুক্ত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার পর মাণিকলাল আসিয়া টেলিগ্রামের সংবাদ শুনিয়া যে মূর্ত্তি ধরিবে, তাহা কল্পনা করিয়া আর তাঁহার খানাহারে প্রবৃত্তি রহিল না।

শঙ্কিত বিষণ্ণ মুখে প্রভাবতী বলিলেন, "এত ভাবনা চিন্তের ওপর এ রকম করে খাওয়া বন্ধ হলে শরীর থাকবে কি করে?"

চলিয়া যাইতে যাইতে প্রভাবতীর কথায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হরমোহন উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "না থাকলেই যে বেঁচে যাই! এ রকম চিন্তার আগুনে দিবারাত্র পুড়ে মরার চেয়ে চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া ঢের ভাল! কিন্তু তোমার সে ভাবনা নেই,—থাকবে, আরও তাজা হয়ে এ শরীর থাকবে! এ আগুনে-পোড়া মাটির ফলে পোকা লাগবার কোনো ভয় নেই!"

দুঃখার্দ্র নেত্রে প্রভাবতী বলিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে এ সব কথা বলছ কি করে? আমাদের কথাও ত' তোমার ভাবা উচিত!"

হরমোহন উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের কথা ভেবে ভেবেই ত পাগল হতে বসেছি! এবার তোমাদের কথা না ভুললে আর গতি নেই! আমার মত হতভাগা, যারা স্ত্রী পুত্র পালন করতে পারে না, তাদের মৃত্যু হলেই স্ত্রীপুত্রের মঙ্গল হয়! এর ওপর সমস্ত দিন ধরে কি শাস্তি ভোগ করতে হয় তা জান? যে টাকার জন্যে এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি,—অফিসে পাঁচ ছ ঘণ্টা হাজার হাজার সেই টাকা রোজ আমার হাত দিয়ে আনাগোনা করে! পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে এমন সময়ে নদীর তীরে ঢেউ গুণতে বসিয়ে দিলে যে অবস্থা হয়, আমার ঠিক সেই অবস্থা! এক এক সময়ে বেশী দামের নোটগুলা আঁকড়ে ধরে পাগলের মত তাদের দিকে চেয়ে থাকি! ইচ্ছে হয় দু চারখানা চুরী করে নিয়ে পালিয়ে আসি! আজ মনে করছি তবিল ভেঙ্গে কিছু টাকা নিয়ে আসব। তার পর যা হয় হবে! কিছু বিশ্বাস নেই! ঋণে যাকে ধরেছে সে সব করতে পারে, মরতেও পারে, মারতেও পারে!"

হরমোহনের সুদীর্ঘ বিলাপ শুনিতে শুনিতে অমলার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইতেছিল! এ কয়েক দিন নিরন্তর তাহার মনের মধ্যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের যে ভীষণ ঝটিকা বহিয়াছে, তাহার সংবাদ শুধু সেই জানে! প্রমথর দুইশত টাকার মণিঅর্ডার করিতে হয় নাই; তাহা ছাড়া আরও অনেক টাকা তাহার বাক্সে আছে, এ কথা প্রমথ নিজেই তাহাকে বলিয়া গিয়াছে। চাবী তাহার নিজের হাতে; ইচ্ছামাত্র বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া লইয়া সে পিতাকে বিপন্মুক্ত করিতে পারে। অবস্থা হিসাবে এ টাকা লওয়া চুরী নহে, জুয়াচুরী নহে এবং হয় ত আরও অনেক কিছুই নহে; কিন্তু প্রমথর স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে টাকা লওয়া যে কতখানি প্রমথর নিকট পরাজয় স্বীকার করা, কতখানি তাহার অধীন হইয়া পড়া, তাহা মনে করিয়া অমলা নিজেকে এ পর্য্যন্ত কঠিন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার পিতার মুখে এরূপ ভীষণ কথা শুনিয়া আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না।

"বাবা!"

হরমোহন কোন কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে অমলার দিকে চাহিলেন।

"বাবা, আমার গয়নাগুলো কি এমনই দরকারি জিনিস যে, তুমি তবিল থেকে টাকা নিয়ে আসবে অথচ সে গুলায় হাত দেবে না?" অমলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া প্রভাবতীও বলিলেন, "তা-ই না হয় এখন কর; একটা কোন গহনা রেখে শ' খানেক টাকা নিয়ে এস, তার পর সুবিধা মত টাকাটা শোধ দিয়ে ছাড়িয়ে আন্‌লেই হবে।"

প্রভাবতীর কথা শুনিয়া হরমোহন হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "সে সুবিধা আর এ জন্মে হবে না, যা আজ যাবে তা চিরকালের মতই যাবে।"

গহনা লইতে হরমোহন অস্বীকৃত হইতেছেন মনে করিয়া অমলা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তা যাবে না বাবা, প্রমথ দাদা এসে জানতে পারলেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসবেন।"

কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া হরমোহনের মনে প্রমথর প্রতি অপরিমিত ক্রোধ সঞ্চিত হইয়া ছিল; অমলার কথায় সহসা তাহা জ্বলিয়া উঠিল।

"তা কিছুতেই হবে না! গয়না বিক্রী হয়ে যাবে তাও ভাল; কিন্তু প্রমথ রাস্কেলের টাকায় তোমার গয়না ছাড়ান হবে না! তার কাছ থেকে মাসে মাসে কিস্তির টাকা নেওয়াতেই ত' সে দিন আপত্তি করছিলে, আর এরি মধ্যে তার টাকায় ছাড়ান গহনা গায়ে দিতে তোমার প্রবৃত্তি হচ্ছে?"

প্রচ্ছন্ন অপমানের গ্লানিতে অমলার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল! একবার ইচ্ছা হইল, বলে, প্রবৃত্তি তাহার আরও অনেক বিষয়েই হয় না; কিন্তু পিতার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা স্মরণ করিয়া সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "না, আমার একটুও প্রবৃত্তি হচ্ছে না বাবা! তুমি গহনা বাঁধা না রেখে একেবারে বিক্রী করে টাকা নিয়ে এস। তাতে টাকাও বেশী পাওয়া যাবে, সুদও লাগবে না। তার পর যখন সুবিধা হবে নতুন করে গড়িয়ে দিয়ো।"

ক্রোধের গতি অনেক সময়েই যুক্তি ও সংযমের লৌহ-বর্ম্ম দিয়া চলে না। তাই, অমলার এই নির্বিরোধ উত্তরের পরও হরমোহন উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "প্রমথর সঙ্গে আমার তেমন কোনও সম্পর্কই নেই! মাসে মাসে গোটা কতক টাকার জন্যে আমি তাকে বাড়ীর ভেতরে স্থান দিতে পারব না, তা আমার যত অসুবিধা হোক না কেন! সে এবার এলেই তাকে যেন তার আগের ব্যবস্থা করতে বলা হয়!" বলিয়া হরমোহন সবেগে আচমন করিতে প্রস্থান করিলেন।

এই সম্পূর্ণ বিপরীত অভিযোগের কথা শুনিয়া প্রভাবতী বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রমথকে গৃহে আনিবার জন্য স্বয়ং এত উদ্যোগী হইয়া ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া, এখন অন্যের প্রতি তদ্বিষয়ে এরূপ দোষারোপ করিবার অর্থ ও অভিপ্রায় কি, তাহা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

অমলার মনে বিস্মিত বা দুঃখিত হইবার মত অবসর ছিল না; সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মা, তুমি আমার পুষ্পহারটা বাবাকে দিয়ে এস। বাবা এখনি অফিস চলে যাবেন।"

অমলাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে প্রভাবতী বলিলেন, "তুই মনে কিছু করিস নে অমল; জানিস ত' কি রকম অবুঝ লোক!"

"কিছু মনে করব না মা! তুমি আর দেরী কোরো না, হারটা দিয়ে এস।"

সান্ত্বনা অনেক সময়ে মূল দুঃখকে জাগাইয়া তুলে এবং বাড়াইয়া দেয়। প্রভাবতীর 'কিছু মনে করিস নে' বলার পরে অমলা যতটা মনে করিতে লাগিল, পূর্ব্বে সে ঠিক ততটা মনে করে নাই। হরমোহনের উচ্চারিত বাক্যের অন্তরাল হইতে যে কথাটা অনুচ্চারিত থাকিয়াও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার একটা দিক অমলার মনে একটা অপরিমেয় লজ্জা ও হীনতার গ্লানি জাগাইয়া তুলিল; কিন্তু অপর দিক হইতে সে এই ভাবিয়া একটু আশ্বাস লাভ করিল যে, কোন কোন বিষয়ে প্রমথর নিকট হইতে টাকা লওয়া হীনতাজনক সে কথা তাহার পিতার এখনও কোন কোন সময়ে মনে হয়।

অফিসের তবিল ভাঙ্গিয়া টাকা আনার চেয়ে কন্যার অলঙ্কার বাঁধা রাখিয়া টাকা আনা শ্রেয়, এ কথা মনে মনে স্বীকার করিয়া হরমোহন পুষ্পহারটা সন্তর্পণে বুক পকেটে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অফিসের ছুটির পর টাকার পরিবর্ত্তে পুষ্পহারটি লইয়াই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

অদূরে অমলা দাঁড়াইয়া ছিল; হরমোহন তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "আমাকে অতটা কষ্ট দিয়ে আর অপমানিত করিয়ে তুমি কি খুব আনন্দ পাচ্ছিলে?"

ভারতবর্ষ

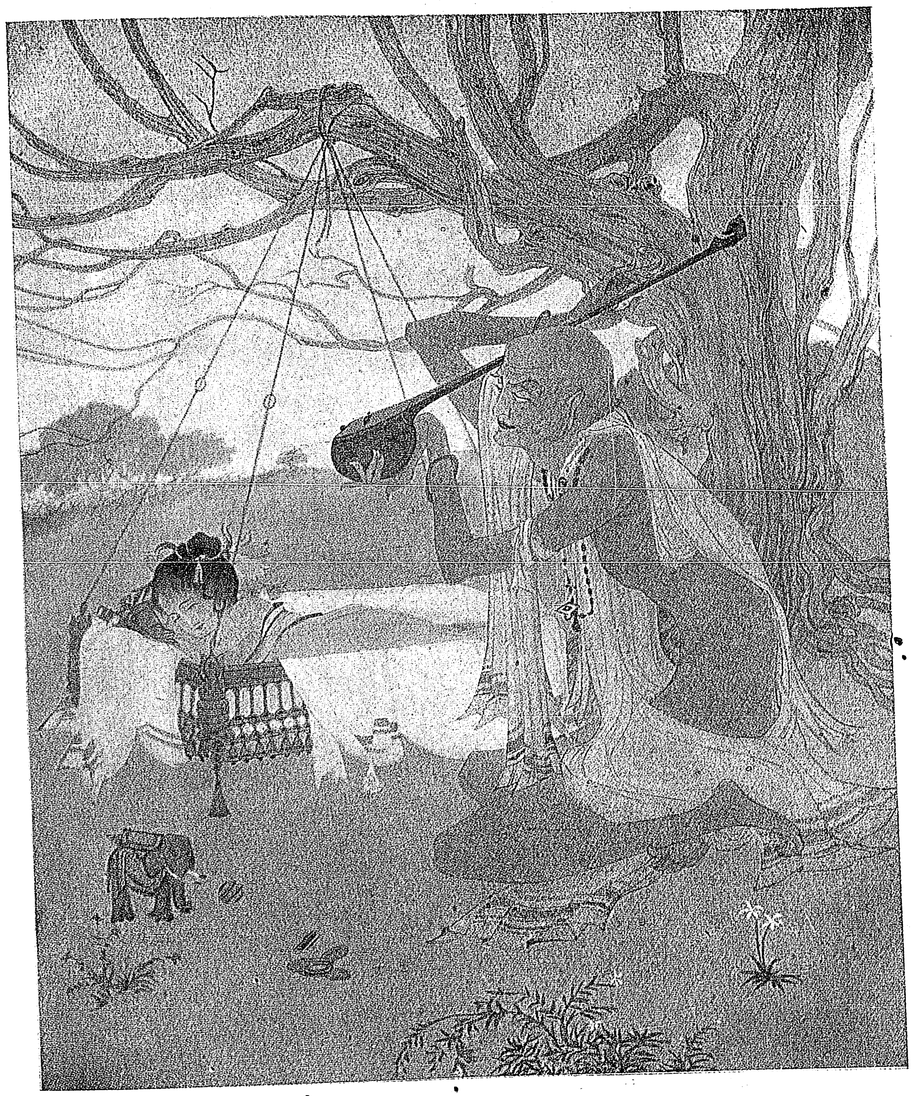

সঙ্গীতের বিকাশ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদর রহমান চঘ্‌তাই

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

হরমোহনের কথায় বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া অমলা বলিল, "এ তুমি কেন বলছ বাবা ?"

"তোমার কাছে প্রমথর টাকা রয়েছে, আর টাকার জন্যে মাণিকলাল রোজ আমাকে অপমান করে যাচ্ছে, তা তুমি বসে বসে দেখছ ?"

হরমোহনের কথা শুনিয়া অমলার মুখ শুকাইয়া গেল ! ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে কহিল, "প্রমথ দাদার টাকা ত' আমার কাছে নেই বাবা ! তাঁর ক্যাশবাক্সই আমার কাছে রয়েছে।"

"ক্যাশবাক্সের চাবী কার কাছে আছে ?"

"চাবী আমার কাছেই আছে।"

"বাক্সয় টাকা আছে ?"

"আছে।"

"কত ?"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অমলা বলিল, "ঠিক জানিনে, বোধ হয় আড়াই শ, তিন শ হবে।"

"এ সব কথা আমাকে জানাও নি কেন ? তুমি কি মনে কর, তুমি প্রমথর আপনার লোক, আর আমি পর ?"

আরক্ত মুখে অমলা বলিল, "তা নয় বাবা, আমি মনে করেছিলাম যে, প্রমথদাদার বিনা অনুমতিতে আমরা তাঁর ক্যাশবাক্সর টাকায় হাত দিতে পারি নে। তাই তোমাকে ক্যাশবাক্সর কথা বলি নি।"

হরমোহন পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া অমলার হস্তে দিয়া বলিলেন, "অফিসে গিয়ে প্রমথর এই চিঠি পেলাম। চিঠিখানা পড়ে বিচার করে দেখ যে, এখন তার টাকায় হাত দেবার অনুমতি পাওয়া গেছে কি না !"

ব্যথিত করুণ দৃষ্টিতে হরমোহনের দিকে চাহিয়া অমলা বলিল, "তুমি থাক্‌তে আমি কি বিচার করব বাবা ? তুমি মুখ হাত ধুয়ে জল খেয়ে নাও, তার পর আমি বাক্স আর চাবী এনে দিচ্ছি।" বলিয়া প্রমথর চিঠিখানা হরমোহনকে প্রত্যর্পণ করিল।

"চিঠিখানা একবার পড়ে নিলেই ত' ভাল হোত ?"

অমলা তাহার আর্দ্রকরুণ নেত্র উত্তোলন করিয়া বলিল, "কোন দরকার নেই বাবা !"

হরমোহন চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া ফেলিলেন ; কন্যার সকাতর মূর্ত্তি দেখিয়া আর কোনও কথা বলিলেন না।

প্রমথর ক্যাশবাক্স খোলা হইলে হরমোহন মোট টাকা কত আছে অমলাকে দেখিতে বলিলেন।

অমলা টাকা ও নোট হিসাব করিয়া দেখিয়া বলিল, পাঁচ শ সাতচল্লিশ টাকা বার আনা।"

নোট ও টাকার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হরমোহন বলিলেন, "আচ্ছা, আমাকে দেড় শ' টাকা দিয়ে বাক্সটা বন্ধ করে রেখে দাও।"

"তোমার যা দরকার হয়, তুমিই নাও না বাবা ?"

"না, তোমার জিম্মায় যখন রয়েছে, তখন তোমার হাত দিয়ে নেওয়াই ভাল।"

আর কোনও কথা না বলিয়া অমলা দেড় শত টাকা বাহির করিয়া হরমোহনের সম্মুখে স্থাপিত করিল।

প্রভাবতী ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "পঁচাত্তর টাকা করে মাসে মাসে নাও, তাই নিলেই ত' হোত।"

হরমোহন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোমরা কি মনে কর শুধু মাণিকলালকে ঠাণ্ডা করলেই আমার সব ঠাণ্ডা হোল ? এ মাসে লাইফ্ ইন্সিওরের সুদ দিতে হয়েছে, সে কথা মনে আছে ? বাকি খরচ চলবে কি করে ? আসচে মাসে না হয় প্রমথর কাছ থেকে পঁচাত্তর টাকা নোব না, সেই ভেবেই দেড় শ' টাকা নিলাম।"

আগামী মাসে প্রমথর নিকট হইতে পঁচাত্তর টাকা না লইলে কি প্রকারে চলিবে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রভাবতীর সাহস হইল না, এবং অমলার প্রবৃত্তি হইল না।

"বাবা !"

অমলার বদ্ধ-গভীর স্বরে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিয়া হরমোহন বলিলেন, "কি ?"

"আমার একটা অনুরোধ রাখবে বাবা ?"

"কি অনুরোধ ?"

"প্রমথদাদার চিঠি না এলে পুষ্পহারটা রেখেই ত' টাকা আন্‌তে হোত। তা' প্রমথদাদার বাক্সেই হারটা রেখে দিইনে ?"

অমলার কথা শুনিয়া একটা আসন্ন বিবাদ আশঙ্কা করিয়া প্রভাবতী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন ; হরমোহন কিন্তু শান্তভাবে এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা মন্দ নয় ; বেশী টাকা যখন নিলাম, তখন তার বদলে একটা কিছু

রেখে দিলে দেখ্‌তে শুন্‌তে ভালই হয়। কিন্তু সে যদি এসে হারটা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে চায়?"

অমলা দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল, "কখনই ফেরৎ নোব না! যত দিন না তুমি টাকা শোধ দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে, তত দিন ও হার স্পর্শ করব না!"

হরমোহন সচিন্ত হইয়া কহিলেন, "ছাড়িয়ে ত' আমি নোবই; কিন্তু ফেরৎ দেবার জন্যে সে যদি পীড়াপীড়ি করে, তা হলে ফেরৎ না নেওয়াটাও অভদ্রতা হবে। ও বেলা আমি প্রমথর উপর রেগে উঠেছিলাম বটে, কিন্তু এখন দেখছি ব্যবহারে সে আপনার, সে-ই যথার্থ আপনার!" তাহার পর প্রভাবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চিঠিটা কি রকম লিখেছে একবার পড়ে দেখো!" এবং তৎপরে অমলার দিকে ঈষৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "ও বেলা প্রমথর বিষয়ে আমাদের যে সব কথা হয়েছিল, তার একটি বাক্য যেন তার কাণে না যায়! শুনলে তার মনে ভারী কষ্ট হবে!"

ও বেলা যতটা ব্যথা পাইয়াছিল, তাহার দশগুণ ব্যথায় ব্যথিত হইয়া অমলা তাহার নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। দারিদ্র্য রোগে পীড়িত হইয়া তাহার সবল পিতা কিরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহার দুই চক্ষু বিদীর্ণ হইয়া অশ্রু নামিয়া আসিল। একটা অন্ধকারাবৃত ভবিষ্যতের কল্পনায় শঙ্কিত হইয়া, সে নিজের মনের মধ্যে সর্ব্বপ্রদেশ হইতে শক্তি সঞ্চিত করিয়া, নিজেকে দৃঢ় ও সবল করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; এবং মনে মনে বারম্বার বলিতে লাগিল, হে সর্ব্বশক্তিমান, তোমার অসীম শক্তির একটি কণা এই দুর্ব্বল নারী হৃদয়ে নিহিত করে, তাকে লোহার মত শক্ত আর পাথরের মত কঠিন করে দাও! বাইরের যত শক্তি, যত আঘাত তার দেহে লেগে যেন ব্যর্থ হয়ে যায়!

কয়েক দিন পরে প্রমথ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বাক্য খুলিয়া তন্মধ্য হইতে অমলার হারটি বাহির করিয়া সে স্মিতমুখে অমলাকে বলিল, "অমলা, আমার বাক্সটি তোমার হাতে পড়ে অত্যাশ্চর্য্য ম্যাজিক-শক্তি লাভ করেছে! যে জিনিস তার মধ্যে রেখে যাই নি, সে জিনিসও তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি!"

অমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "শুধু তাই নয়; আবার উল্টো ম্যাজিক-শক্তিও লাভ করেছে! যে জিনিস তার মধ্যে রেখে গেছলেন, সে জিনিস তার মধ্যে আর খুঁজে পাবেন না!"

দেড়শত টাকা লওয়ার ও পুষ্পহার রাখার কথা ইতিপূর্ব্বেই হরমোহনের নিকট হইতে প্রমথ শুনিয়াছিল। সে সহাস্যমুখে কহিল, "অত হিসাব-করা ম্যাজিক আমার পছন্দ নয়। লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ম্যাজিকটাই আমি বেশী পছন্দ করি। অতএব এই অকারণ লাভের জিনিসটি থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাই। তুমি এটা তোমার বাক্সে তুলে রেখে দাও।" বলিয়া অমলার সম্মুখে হারটা প্রমথ স্থাপন করিল।

কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া, অমলা শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে বলিল, "পছন্দ অপছন্দ ত আমারও আছে। অতএব এই অযথা লাভের জিনিসটা আমার বাক্সে তুলে রাখা ত' দূরের কথা, আমি স্পর্শ পর্য্যন্ত করব না। তুমি ওটা যেখান থেকে বার করেছ, সেখানেই তুলে রাখ।"

অমলার বাক্য শুনিয়া ও আকৃতি দেখিয়া প্রমথ বুঝিল যে, পরিহাসের পথ দিয়া এ ব্যাপারের মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে। তখন স্পষ্টভাবে রীতিমত বাদানুবাদ আরম্ভ হইল।

অর্দ্ধঘণ্টাকাল বৃথা তর্ক ও বিতণ্ডার পর প্রমথ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমার টাকা যথেচ্ছা ব্যয় করবার অধিকার তোমার যদি না থাকে ত' আমার টাকা নিয়ে মহাজনী করবার অধিকারই বা তুমি কোথা থেকে পাচ্ছ? গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার দেওয়ার অধিকার কি তোমায় আমি দিয়ে গেছলাম? আত্ম-সম্মানের অনেক কথা তুমি বলছিলে অমলা; কিন্তু সে আত্ম-সম্মান ত আমারও থাকতে পারে? স্ত্রীলোকের গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার দেওয়ার অভ্যাস আমার আছে, এ কি তুমি জান?"

অমলা এ অভিযোগের কোন উত্তর না পাইয়া করযোড়ে বলিল, "আমি যদি অন্যায় করে থাকি প্রমথদাদা, তাহলে তুমি দয়া করে আমাকে ক্ষমা কোরো—কিন্তু আমার একান্ত মিনতি, আমার এ অনুরোধটা তুমি রাখ!"

প্রমথ রুষ্টমুখে বলিল, "অনুরোধ নয় অমলা, অত্যাচার! জুলুম! আত্ম-সম্মান, আত্ম-মর্য্যাদা, এ সব বড় বড় জিনিসের জ্ঞান তোমার খুব আছে দেখছি; কিন্তু শিষ্টাচারের জ্ঞানটা আরও একটু থাকলে বোধ হয় ভাল হোত! হার দিয়ে টাকা শোধ করা যায় বটে, কিন্তু হার দিয়ে টাকার ওপরের আর কোনও জিনিস শোধ করা যায় না। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে এর বেশী আর কি বলব!"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রমথ বলিল, "আচ্ছা, তোমার হার আমার কাছেই রইল, কিন্তু মনে মনে আমার কাছে এই অঙ্গীকার করে যাও অমলা, যে, যখনই বুঝতে পারবে যে, এই হারের ব্যাপার নিয়ে আমার প্রতি গভীর অত্যাচার করেছ, তখনই আমার কাছ থেকে হার চেয়ে নিয়ে যাবে। তখনও যেন আত্ম-প্রবঞ্চনা করে আত্ম-সম্মানের দোহাই দিয়ো না। আত্ম-প্রবঞ্চনার চেয়ে খারাপ জিনিস আর নেই!—আচ্ছা, এখন তা হলে এস।"

অমলা একমুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। ব্যাধেরও জন্য বিহঙ্গিনী সময়ে সময়ে দুঃখিত হয়! (ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

ধর্ম্ম ও জীবন *

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

সাধারণতঃ আমাদের কেমন একটা সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে, ধর্ম্মের নামেই আমরা শিহরিয়া উঠি। কারণ, ধর্ম্মের সহিত সর্ব্বত্যাগী বৈরাগ্যের এমন একটা অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, ধর্ম্মের নামেই আমাদের মনে পড়ে হিমালয়ের একটা নিভৃত গুহা এবং সেখানকার নির্জ্জনতার মাঝে হঠযোগ-সাধন। তাই আমাদের মত যাঁহারা একটু স্থূলবুদ্ধি-সম্পন্ন, তাঁহারা ধর্ম্ম জিনিসটাকে যোগী সন্ন্যাসীদের উপর সঁপিয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিবার চেষ্টা করেন। হয় ত তাঁহারা মনে করেন, যখন "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং", তখন গুহাবাসীরাই উহা লইয়া মাথা ঘামান। কিন্তু সাধারণ মানুষেরও যে এইরূপ হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকা চলে না, তাহার হাতে হাতে প্রমাণ হইয়া যায় তখনই, যখন জীবনের বন্ধুর পথে কোনওখানে আসিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা খাইতে হয়। মস্তিষ্ক যখন একটু উষ্ণ থাকে, যখন জগৎটা কেবলই কাব্য মনে হয়, তখন হয় ত মনে হইবে, এই ত বেশ আছি—ঐ পর্ব্বত, নদ নদী, গাছ, গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, ক্ষেত্র, পশু-পক্ষী, মনুষ্য—সমস্ত পৃথিবী কেমন সুমধুর সুকোমল ছায়ামিশ্রিত সোণার রঙ্গে রঞ্জিত। দূরে, উপরে, আকাশে কিছু ঘন ছায়া যেন রাঙ্গা মুখের উপর কৃষ্ণ কেশরাশি—যেন অনুরাগোৎফুল্ল প্রেমময়ীর বদনে সুমধুর গভীর বিরহ রেখা। জীবনের এই কাব্যই ত বেশ, তার মাঝখানে ধর্ম্মের এই বালাই কেন? কিন্তু হঠাৎ এক দিন এই কাব্যোদ্যানের দুই একটী সুন্দর ফুলের দল যখন খসিয়া পড়ে, তখনই চমক ভাঙ্গিয়া যায়—তবে ত শুকাইলে সবই খসিয়া পড়ে। তখন মনে হয়—এ জগৎ রহস্যময়; অমনি জগৎ ভুলিয়া জগদ্বন্ধুর ধ্যানে বসিতে হয়। তখনই জীবনের মাঝে ধর্ম্মভাবের অভিষেক হইয়া যায়।

ধর্ম্মের সহিত জীবনের একটা মধুর সম্বন্ধ, অনেকটা বন্ধুর প্রেম-বন্ধনের মত। এটা খুব সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে, যদি আমরা ধর্ম্মের ধাতুগত অর্থের দিকে লক্ষ্য করি। কারণ, ধর্ম্মের সাধারণ অর্থ, ধারণ করা; অর্থাৎ দুষ্প্রবৃত্তি, পাপবাসনা প্রভৃতি অরাতিগুলির হাত হইতে যাহা জীবনকে ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম। অবশ্য ধর্ম্মের সহিত একটা যোগরূঢ় অর্থের সম্বন্ধ আছে, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। তবে আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক বা ব্রহ্মলোকে গমন করিবার জন্য যে অষ্টবিধ যোগসাধনার প্রথার উল্লেখ আছে, জীবনে ধর্ম্মের সেই সব সাধনার ক্ষেত্র বড় অল্প বলিয়া, ধর্ম্মের "ধারণ করা"—অর্থই অধিকাংশের জীবনে প্রযুজ্য হিসাবে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। মোট কথা, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বন্ধুর ও সঙ্কটময় পথে যাহা শুভাকাঙ্ক্ষী পরিচালকের মত কাজ করে, অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজিতে guardian angel বলে, সেই অর্থেই আমরা এখানে ধর্ম্মের ব্যবহার করিব। এই ধর্ম্মই জীবনের সহিত এক অগণ্ড বন্ধনে বদ্ধ। সুতরাং জীবন ছাড়া যেমন ধর্ম্ম নাই, তেমনই ধর্ম্ম ছাড়াও জীবন দাঁড়াইতে পারে না। ইহাই ব্যবহারিক ধর্ম্ম।

* বঙ্গীয় সৎসঙ্গ সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত।

এই ব্যবহারিক ধর্ম্মের তিনটী বিভাগ—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি বা প্রেম। এই তিনটী স্তরই সাংসারিক জীবনের ধর্ম্ম। ইহাদের নিজেদের মধ্যেও একটা সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ এই যে, জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্ম তাহার সাধন। আবার—কর্ম্মের লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবানের সৃষ্ট জীবে প্রেম। তত্ত্বজ্ঞান কি না পরাবিদ্যা,—যে বিদ্যা দ্বারা সেই অবিনাশী সত্যস্বরূপকে জানা যায়। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে সেই জ্ঞান লাভ হয় না। গীতাও এই কথাই বলিয়াছেন—"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে, তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।" ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর নাই। যোগসিদ্ধ পুরুষ কালক্রমে সেই জ্ঞান আপনাতে লাভ করেন। জ্ঞান লক্ষ্য, কর্ম্ম সোপান। কি উপায়ে এই জ্ঞান লাভ হইতে পারে? "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ" অর্থাৎ যিনি শ্রদ্ধাবান্, নিষ্ঠাবান্ ও সংযতেন্দ্রিয় তিনিই এই জ্ঞান লাভ করেন। তাঁহাকে তৎপর কি না ভগবদ্ভক্ত হইতে হইবে; কারণ, ভক্তি বিনা জ্ঞানের কোনও সার্থকতা নাই। তাই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

এই জ্ঞান কি এবং জ্ঞানীই বা কে? সকল কাজের মাঝে ঈশ্বরে মতি অক্ষুণ্ণ রাখার নামই জ্ঞান। আর যিনি সমাধিযোগে ঈশ্বরে স্থিরবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনিই জ্ঞানী। গীতার ভাষায় তাঁহাকে স্থিতধী বলা হইয়াছে। এই তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ বলিয়াছেন—

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
ঈশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি।

অর্থাৎ জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, অপর ব্রহ্ম হইতে মহান্, প্রতি শরীরে বর্ত্তমান্, সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন, সমুদায় জগতের একমাত্র ব্যাপক সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সাধকগণ অমর হন। ঈশোপনিষদের ভাষায় তত্ত্বজ্ঞানের মূল কথা এই বলা যাইতে পারে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥

জগতে যাহা কিছু প্রপঞ্চভুক্ত চঞ্চল, সেই সমুদায়ই পরমেশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত। ব্রহ্মের এই জ্ঞান লাভ করিয়া বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে; এবং এই ত্যাগের দ্বারা পরমাত্মাকে সম্ভোগ কর। কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না। এই জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, গীতার ভাষায় তিনিই স্থিতধী। তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।"

সফল কামনা বিষয় বাসনা
ত্যজে সব তুচ্ছ গণি,
আপনি আপনে রহে তুষ্ট মনে
স্থির বুদ্ধি সিদ্ধ মুনি।
দুঃখে নহে ক্লিষ্ট, নহে সুখে হৃষ্ট,
স্পৃহাশূন্য নিরময়,
কামনাবিহীন, ভয় ক্রোধহীন,
স্থিরবুদ্ধি তারে কয়।
স্নেহশূন্য ভবে আত্মপর সবে
শুভাশুভ নির্ব্বিশেষ।
নাহি অতি হর্ষ, না হয় বিমর্ষ,
কারো না রাখে বিদ্বেষ।
কূর্ম্ম যথা নিজ অঙ্গ
কোষ মধ্যে করে সংহরণ,
তেমতি বিষয় হতে
ইন্দ্রিয় সংহরে প্রাজ্ঞ একজন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনাসক্ত ভাবে কাল কাটাইতে হইলে এই জ্ঞানের প্রয়োজন। সংসারে থাকিয়াও এই জ্ঞান লাভ করা যায় এবং তাহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব। এই জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের যোগ সাধনেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ান্ অকর্ম্মণঃ"—কর্ম্ম তুমি নিয়ত কর; কারণ, অকর্ম্ম হইতে কর্ম্ম শ্রেয়ঃ—ইহাই গীতার উপদেশ। তবে সে কর্ম্ম কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে করিতে হইবে। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।" কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার; কিন্তু ফলে কোন অধিকার নাই। ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিও না, কিংবা কর্ম্মত্যাগে আসক্ত হইও না। কারণ সকাম কর্ম্ম যেমন দোষের, কর্ম্মত্যাগও সেইরূপই দোষের। সাধারণতঃ কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। আমি চাই আর না চাই, ভাল হউক মন্দ হউক, আমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্ম যখন করিতেই হইবে, তখন তাহা নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে নির্লিপ্ত ভাবে ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠান করাই বিধেয়। এইরূপ কর্ম্মসাধনই ধর্ম্মের অঙ্গ। তবে এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিবার অন্তরায় হইয়া পড়ে আমাদের দুর্দ্ধর্ষ কামনা, বলবতী প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়াই লোকে পাপাচরণ করে। কামনাই জ্ঞানীদিগের চিরশত্রু, ইহা দুষ্পূর, ইহা সন্তাপহেতু। এই নিষ্কাম কর্ম্মসাধনার উপায় কি? গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

"আমাতে রাখিলে চিত্ত, প্রসাদে আমার
এ ঘোর সংসার দুর্গ সুখে হবে পার।"

তাহা হইলে দেখা গেল, কর্ম্ম করিতেই হইবে; এবং তাহা করিতে হবে ঈশ্বরে মতি রাখিয়া নিষ্কাম ভাবে। ইহাই গীতার কর্ম্মযোগ এবং রাজর্ষির লক্ষণ। সংসারে থাকিয়াও যাঁহার আসক্তি নাই, যিনি দেশের হিতের জন্য ভগবানে মতি রাখিয়া নির্লিপ্ত ভাবে কার্য্য করেন, তাঁহার অপেক্ষা বড় সন্ন্যাসী আর কেহ নাই। সংসার ভিন্ন আর কোনও আশ্রমে এই ধর্ম্মসাধন সম্ভব নয়। ভোগের মধ্যে থাকিয়া যে ত্যাগ, তাহাই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ। সেই জন্যই পুরাণে রাজর্ষিকে শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী বলা হইয়াছে। এই নিষ্কাম কর্ম্মই উপনিষদের "কর্ম্ম ব্রহ্ম"।

ধর্ম্মের এই যে দুই বিভাগের কথা বলা হইল—জ্ঞান ও কর্ম্ম—ইহাদের পরেই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ভক্তি বা প্রেম। এই ভক্তি বা প্রেম ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং নিষ্কাম কর্ম্মও অসম্ভব। জীবনের সকল অবস্থাতেই এই ভক্তিই মানুষকে ধন্য করে,—ইহাই জীবনকে আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দের পর বলিয়াছিলেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।"

হে জগদীশ, আমি তোমার নিকট ধন চাহি না, জন চাহি না, মনোহর কবিতা চাহি না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। মানুষ জীবনে চায়, এই শুদ্ধা ভক্তি বা প্রেম। মানুষের এই দেহ-মন প্রাণ-প্রতিষ্ঠানত্রয়ের মধ্যে অহোরাত্র যে যুদ্ধ চলিতেছে, সে যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য মানুষ চায় প্রেম। কারণ, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" বাঙ্গলার বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই প্রেমধর্ম্ম সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছিল বলিয়াই বাঙ্গলার জীবন এক সময়ে এত মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। তাই প্রেম পাগল চণ্ডীদাস একদিন গাহিয়াছিলেন—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।
আঁখির নিমেষে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয় পরশরতন
গলায় গাঁথিয়া পরি।"

এই প্রেমই জীবনে রূপান্তর আনিয়া দেয়; গৃহীকে রাজর্ষি করিয়া তোলে। ইহা বিচারের বিষয় নহে, অনুভূতির বস্তু; আমাদের সকলের জীবনেই এইরূপ রূপান্তর ঘটিতে পারে। যাঁহারা ধর্ম্ম অর্থে শুধু religion বোঝেন, তাঁহাদের কাছে এই প্রেমের ব্যাখ্যায় কোনও সার্থকতা নাই। এই প্রেম আত্মার রসভোগের কথা, প্রাণের মণি-কোঠায় যে রূপ ধরা রহিয়াছে, তাহারই সম্ভোগ। সত্য তখনই সুন্দর হয়, যখন তাহার এই বহিরাবরণের ভিতর ছাগাইয়া সে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত ভাবকে বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়। মানবপ্রকৃতির গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশের যে প্রাণের খেলা, তাহাই যখন সে প্রকাশ করে, তখনই সে রূপের সৃষ্টি হয়। বিশ্বের অনন্ত রহস্যময় ঘরের দুয়ার যাহা সাধারণ জ্ঞানে সাদা চোখে বন্ধ থাকে,—মানবের সেই ভিতরের কথা, কাম কামনার অতীত যে মাধুর্য্য, সেই আত্মার রসভোগের যে সাধনা, মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির আত্মায় আত্মায় সম্ভোগ,—প্রেম সেই রুদ্ধ দুয়ারের চাবি। এই প্রেমসাধনায় সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

"ষড় দর্শনে পেলেম না আগম নিগম তত্ত্বসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥"

জীবনে যদি এই প্রেমের বিন্দুমাত্র উন্মেষ না হয়, তবে সকল ভোগই নিরর্থক। এ সেই—"পিতল কি কাটারি কামে না আওল, উপরকি চকমকি সার।" জীবনকে এই প্রেমের ছাঁচে ঢালিয়া দিলে তবেই জীবনের সত্য রূপটী ধরা দেয়।

এই যে বৃহৎ প্রেম, স্রষ্টার সহিত প্রাণে প্রাণে মাখামাখি, অন্তরে অন্তরে কোলাকুলি, ইহারই খণ্ডমূর্ত্তি সৃষ্ট জীবে প্রেম। এই মূর্ত্তিই বৈষ্ণবের জীবে দয়া—দরিদ্র-নারায়ণের পূজা। ইহাই প্রেমধর্ম্মের একটী অত্যাশ্চর্য্য বিকাশ। এই প্রেমেই মানুষ ধন্য হয়। এই জীবে প্রেমের কথা এক দিন স্বামী বিবেকানন্দের মুখে কি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল—"যে যে ভগবানের সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের গরীব গুরবো—পাপী কোটী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত—তাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হবে, তাদের ভিতর তিনি আসবেন।" এই প্রেমসাধনার জন্য মানুষকে প্রস্তুত হইতে হয়। সেইজন্যই প্রয়োজন জ্ঞান এবং তাহার উপায় নিষ্কাম কর্ম্ম। প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে যে ধর্ম্মের সম্বন্ধ, ইহা তাহাই। ইহাতে সংসার ত্যাগের কথা নাই, আছে স্বার্থ ত্যাগের কথা। ইহাতে উচ্চ নীচ ভেদ নাই, আছে বিশ্বপ্রেমের কথা। ইহাই ভারতের বিশিষ্ট ধর্ম্ম; ইহাই সংসারী ও গৃহীর জীবনের দৈনন্দিন ধর্ম্ম। জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম ভক্তি—ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গের সমাবেশ এইখানে। এই কথাই স্বামী বিবেকানন্দ এক দিন আবেগপূরিত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন—

"হে ভারত, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিয়ো না তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত,—ভুলিয়ো না তোমার সমাজ—সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিয়ো না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও 'মরমী' কবিতা

শ্রীগোপাল হালদার বি-এ

সাহিত্য যে সৌন্দর্য্যের একটি স্তর, এ কথা স্বীকার করতে বিশেষ বড় কারো আপত্তি নেই। কেন না, সাহিত্যকে যাঁরা Criticism of Life হিসাবে দেখেন,—যদিও criticism বা সমালোচনা শব্দটির প্রয়োগ এ স্থলে বড় সুন্দর নয়,—তাঁরা সাহিত্যকে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির একটি পন্থা বলে মেনে নিতে কুণ্ঠিত হবেন না।—আর সৌন্দর্য্য ত জীবন-গতিরই চিহ্ন, তারি প্রতি পদক্ষেপে ফুটে উঠে। জীবনের লীলা-চঞ্চল গতির মধ্যেই ত সে সৌন্দর্য্য মূর্ত্ত, যাকে তুলিকার রেখা-সম্পাতে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে শিল্পীর স্বপ্ন, শব্দের মন্ত্র-ধ্বনির মধ্যে যাকে বাঁধা হচ্ছে সাহিত্যিকের সাধনা। তাই জীবন যেখানে সত্যসত্যই প্রকাশিত হয়, সৌন্দর্য্যও সেখানে জন্মলাভ করে।

জীবনকে সৌন্দর্য্যের লীলা-ভূমি থেকে দেখা ও প্রকাশ করাই হচ্ছে সাহিত্যিকের সাধনা। পৃথিবীর যত-সব কবি ও যত-সব শিল্পী সবাই এই পবিত্র মাতৃভূমিটুকুর সন্ধান লাভ করেছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন সৌন্দর্য্য-পন্থার পথিক, তাঁদের সবারই ছিল এই অলৌকিক ত্রি-নয়ন, যার প্রসাদে মানব-জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য তাঁদের প্রত্যক্ষ হয়ে উঠ্‌ত, রমণীয় হয়ে ফুটত। সৌন্দর্য্যানুভূতির রসে তাঁরা জীবনকে রসিয়ে তুলতেন।—কেন না, তার বাইরের জীবনকে—Lifeকে বিকশিত ও প্রকাশিত করার যতই না চেষ্টা করা যাক্, সে চেষ্টা সাহিত্যের দিক থেকে ফলবতী হবে না;—বিজ্ঞান তাকে ভালো বলতে পারে, দর্শন তাকে অভিনন্দন করতে পারে, থিয়োলজি তাকে সানন্দে আলিঙ্গন করতে পারে।

সৌন্দর্য্যের পায়ের নৈবেদ্যই সাহিত্য। সৌন্দর্য্যানুভূতিই সমস্ত সাহিত্যিকের 'অন্তরধন'। শিল্পী এর সাথে যত না 'থিওরির' খাদ মেশান, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সৌন্দর্য্যোপাসকের দিক থেকে জীবনকে দেখছেন, ও প্রকাশিত করছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি শিল্পীই থাকবেন। কিন্তু, যদি কোনো অশুভ মুহূর্ত্তে তাঁর দিব্য দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়,—যেমন তিনি যদি শাস্ত্রকারের শস্ত্রাঘাতে জীবনকে গড়ে-পিটে সুসমঞ্জস করে তুলতে চান,—সে মুহূর্ত্তে তিনি শিল্পীর সমাজ থেকে খসে পড়বেন।

কিন্তু সৌন্দর্য্যানুভূতি নামক কোনো অখণ্ড বিশুদ্ধ বৃত্তি মানব-হৃদয়ে থাকলেও, সে ভাব-ধারা অন্তরের অদৃশ্য দেশের নানা-দিককার নানা আন্দোলনে আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ছে। যেমন কারো সৌন্দর্য্যানুভূতির চালক তার চিত্ত, কারো বা প্রাণ, কারো বা মন। অর্থাৎ চিত্ত যাঁর সৌন্দর্য্যানুভূতিকে অভিভূত করতে পেরেছে, তাঁর দৃষ্টিতে জীবনের সে দিকটাই সুন্দর ঠেক্‌বে এবং তাঁর সৃষ্টিতেও ঠিক্ সে দিকটাই ফুট্‌বে, যে দিকটা চিত্ত-লোকের প্রিয়। ঠিক তেমনি প্রাণ ও মন যাঁদের জহুরী-চোখের উপর রেখাপাত করেছে, তাঁদের পাতায় সে সৌন্দর্য্যেরই সমাবেশ হবে, যে সৌন্দর্য্য হৃদয়াবেগ বা বুদ্ধির কাম্য।

চিত্ত মানব-হৃদয়ের সেই চঞ্চল, উদ্বেল দিকটা, যেখানে পশুবৃত্তি শেষ করেও মানব প্রাণীমাত্রেরই স্তরে রয়ে গেছে, অথচ যা পশু-জীবনের নগ্নতা ও বীভৎসতাকে এড়িয়ে চল্‌ছে।—বিশ্লেষণ করলে বোধ হয় হৃদয়ের এদিকটাকে অনেকাংশে Sensationএর গণ্ডীতেই বদ্ধ দেখতে পাওয়া যাবে।—'ফ্লেশ্' এখানে অবিরত আপনার অপরাজেয় দাবী জানাচ্ছে, অথচ সে দাবী মেটাতে গিয়ে মানুষ একেবারে কুৎসিত অসুন্দর হয়েও উঠ্‌ছে না। চিত্তের তরলতায় ভেসে-যাওয়া শিল্প-সাধনা অনেকটা দৈহিক সৌন্দর্য্যেরই স্তর; তাই সেখানকার সুন্দর শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ নয়, সে অনেকাংশে সঙ্কুচিত ও অশোভন। বিদ্যাপতির অধিকাংশ কবিতাই এই চিত্ত-চপলতার সঙ্গীত; দেহ সেখানে বার-বার এমনি বৃহৎ হয়ে উঠ্‌ছে যে, তারি ছায়ায় সৌন্দর্য্য-বোধ কোন্ সময় মলিন বিশুষ্ক হয়ে ঝরে পড়ে যায়। এই চিত্ত-দোলায় দোলা-খাওয়া কবির গান—

"মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥"

ছাড়িয়ে যায় না। বৈষ্ণব-কবিতায় যে অতীন্দ্রিয় মধুর রসের আস্বাদন আমরা পেয়ে থাকি, কবির স্থূল দৃষ্টি সব সময়েই তার নাগাল পায়নি! তাই সেখানকার মধুর-রস অনেক সময়ে চিত্ত-চাঞ্চল্যে চপল, অতীন্দ্রিয় রসে স্নিগ্ধ নয়। সংস্কৃত কবিতায় যেখানেই আদিরসের বর্ণনা আছে, সেখানে,—এবং যেখানে—প্রয়োজন নেই, সেখানেও নায়ক-নায়িকার দেহের বর্ণনায় এমনিতর চপলতার খেলা খুব বেশী দেখা যায়। একমাত্র কালিদাসই বোধ হয় এই tickling the senses এর সীমা স্নায়বিক সম্মোহনের প্রভাব এড়িয়ে সুদূর আকাশের দিকে মাথা তুলতে পেরেছেন।—অবিশ্যি তখনকার বিদগ্ধজনের আধুনিক কালের সুধী-সমাজের মত মানব-জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের খোঁজ জানা ছিল না। অথবা এ-সব কবিতা হয় ত ইংলণ্ডের Restoration Comediesএর মত কোনো এক সামাজিক লঘু-চিত্ততার দিনের ইতিহাস।

কিন্তু চিত্ত মানুষের সৌন্দর্য্যানুভূতিকে চিরকালের তরে বন্দী বা বিফল করতে পারে না। যখনি শুনি

"চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

তখনি বুঝিতে পারি যে চপলতার সীমা ডিঙিয়ে গেলুম বলে। তার পর

"আহিরিণী গোয়ালিনী মুঞি কোন্ ছার।
পরাণ নিছিয়া দিই চরণে তোমার॥"

অথবা,—

"তোমার চরণে আমার পরাণে,
লাগিল প্রেমের ফাঁসী—"

শুনতেই মনে হয়, এ ত ইন্দ্রিয়-লোকের পরপারের কথা। এখানে প্রাণ এসে ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছে—Sensation এখানে Emotionalized হয়ে গেছে; ইন্দ্রিয়জ রূপ-বোধ হৃদয়াবেগের দ্বারা হিল্লোলিত হয়ে উঠ্‌ছে। এখানে দেহই প্রথম নয়, প্রধান নয়;—এখানে হিয়া-দুরু-দুরুর অভাব নেই, অন্তর-ব্যথারও অপ্রতুল নেই;—এখানে অস্থিরতা আছে, উদ্দামতা-ও আছে;—কিন্তু নেই রুগ্ন-চিত্তের চপলতা, নেই দেহ-লোকের আবিলতা। অন্তরের সীমানায় পৌঁছলে আর আঁখি দিয়ে বাহিরকে দেখার প্রয়োজন থাকে না, সেখানে হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে দেখা। তাই, প্রাণ যাঁদের সৌন্দর্য্য-বোধকে চালিত করে, তাঁদের কাছে বাইরের সুন্দর অসুন্দর সমানই কথা,—প্রিয়ই একমাত্র সুন্দর। তাই, 'কৃষ্ণকলি তারেই আমি বলি, লোকে বলে কালো'; তার আমি 'দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ'! এখানকারই কথা বিদ্যাপতির

"মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে।"

আর 'ভরা-বাদর' এ ইন্দ্রিয়জ রূপের পূজারীরও প্রাণের কোন্ তারটি যে ছুঁয়ে গেছে—তা' বুঝি 'শূন্য মন্দির মোরের' বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসের থেকেই।—দেহ-লোকের বিভ্রমতার কথা নিমেষের তরে বিদ্যাপতি ভুলে গেছেন।

হৃদয়-লোকের মন্থনে যে অমৃত উঠেছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতায় আমরা তাই পান করে থাকি। অধিকাংশ কবিতাই কবির প্রাণের আবেগে ছাপিয়ে দেওয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। পোপের মত কবিদের বাদ দিলে আমরা বলতে পারি, হৃদয়াবেগই সমস্ত কবিতার মূল, প্রাণের আবেগের ধূপ পুড়িয়েই সরস্বতীর অর্চ্চনা চলে। প্রাণের শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ, এবং বিশেষ করে শেলি;—শেলি পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধে যাঁর জন্ম, কম্পমান ইথর-সমুদ্র ঠেলে যিনি চলেছেন সীমাহারা অনন্ত-লোকের পানে;—'unbodied joy'র মত;—যাঁর প্রতি কথাটিতে প্রাণের আবেগ, প্রাণের আকুলতা, প্রাণের আক্ষেপ ও বিফলতা চরম সুন্দর হয়ে ঝরে পড়ছে;—অথচ যাঁর দৃষ্টি ছিল আকাশের কোন্ এক অনির্দ্দেশ্য দীপ্ত কোণে আবদ্ধ, যেখানে ফেনিল প্রাণ-সমুদ্রের আকুলি-বিকুলি শান্ত, সুসংযত, সুবিন্যস্ত হয়ে দুল্‌ছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে এ-লোকের অগ্রণী বলতে পারা যায় না, সত্য; কিন্তু লুসি-বিষয়ক কবিতাগুলি যে প্রাণের আবেগে অনুপ্রাণিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর নিজের মতেও "all good poetry is the spontaneons over-flow of powerful feelings." কীট্‌স্ ছিলেন নিখুঁত সৌন্দর্য্যের উপাসক,—সে সৌন্দর্য্য পঙ্কজেই থাকুক, বা পারিজাতেই থাকুক,—তাকে ধরতেই ছিল তাঁর সকল চেষ্টা—'pursued the principle of Beauty in all things'—তাই এক দিকে যদি তাঁর ক্রন্দন আছে 'oh for a life of sensations rather than of thoughts!' অন্য দিকে তেমনি আছে এক বৃহৎ স্বপ্ন-মণ্ডিত সত্যের বাণী,—Beauty is truth'—সমস্ত ঋষি এবং কবির শেষ কথা—'রসো বৈ সঃ।' এই সৌন্দর্য্য-পিপাসাই তাঁকে বহুক্ষেত্রে চিত্ত-বিভ্রমতার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

প্রাণের দেশের ওপারেও আর এক দেশ আছে, যেখানে মানুষ শুধুমাত্র আবেগের তাড়ায় চলে না,—সেখানকার প্রতি পদক্ষেপে মানুষ সতর্ক, বহু বিবেচনা ও বহু বিচার সেখানে তার স্বভাব। সে মনের অধিকারভুক্ত। তাই মনের প্রভাবে যাদের সৌন্দর্য্য-পিপাসা চালিত হচ্ছে, তাঁরা না চলেন বাইরেকার চাকচিক্যের মোহে, না চলেন অন্তরের অন্ধ-আবেগের টানে। তাঁরা বুদ্ধি ও নীতি-জ্ঞানের জাল বুনে জীবন-নদীতে সৌন্দর্য্যের শিকারে ফেরেন। ইন্দ্রিয়-জাত বা অন্তর-জাত কোনো রিণিকি-ঝিনিকিতে তাঁদের সৌন্দর্য্য-তিয়াষা তৃপ্ত হয় না। তাঁরা চান্ বুদ্ধি যাকে সুন্দর বলে, জ্ঞান যাকে রমণীয় বলে। তাই, এরূপ লোকের কাছে যে সৌন্দর্য্য কমনীয় ও রমণীয়, তাই রমণীয়। কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তির খেলার ক্ষেত্র খুব প্রসারিত নয়। মানুষ তার মনের নির্ব্বাচিত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে নাটো, উপন্যাসে, গল্পে, প্রবন্ধে। কবি মাত্রেরই হৃদয়ের অনুভূতির দিকটা বেশী প্রবল থাকে; বুদ্ধির, নীতির, যুক্তি-তর্কের ওপারে তাদের সীমানা,—কাজেই তাদের সাহিত্যে মনের উদ্দেশ বড় একটা মিলে না। কেন না, সৌন্দর্য্যকে moralisation-এর গঙ্গাজলে পবিত্র করে নিতে গেলে অনেক সময়ই বেরোয়, হয় 'বৈরাগ্য-বারিধি' নয় দাদার 'চৌপদী'। তবে যাঁরা সৌন্দর্য্যের অন্তরলক্ষ্মীর সন্ধান পেয়েছেন, তাঁরা বুদ্ধির বা নীতির কঠোরতাকেও একটি সবল ও সুস্থ সৌন্দর্য্যে সাজিয়ে তুলিতে পারেন।—ওয়ার্ডসওয়ার্থের অনেক কবিতায় এমনিতর সোনার ফসল ফলেছে। কিন্তু সে পথ যে সুগম নয় Ecclesiastical Sonnetsএর মত শত শত কবিতাই তার প্রমাণ। ব্রাউনিঙকে Abt Vogler Pippa Passes, Paracelsus আদির কবি হিসাবে আমরা টেনিসনের চেয়ে কোনো অংশেই ছোট মনে করিনে; কিন্তু মনো-রাজ্যের সমস্ত অলি-গলির নিখুঁত বর্ণনা পাঠের পরেও কি আমাদের প্রাণে তাঁর ছন্দ-সুষমা-হীনতা ও পদ-লালিত্যাভাবের জন্য একটা নৈরাশ্যজনিত ব্যথা জাগে না? আসলে, এসব কবিরা সৌন্দর্য্য-পথের পথিক হলেও তত্ত্বের পরে শ্রদ্ধাশীল; তাঁরা কবি হলেও উঁচুদরের নীতিবিদ্, এবং কতকাংশে তাপস-পদের উপর লুব্ধ। তাঁদের কাছে Goodই Beautiful, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে morality অনেক সময় Good রূপে দেখা দিয়েছে। তাই, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে মাঝে মাঝে শুধুমাত্র একজন moralist নীতিজ্ঞ বলে ঠেকে, ব্রাউনিঙ্‌কে মাঝে মাঝে শুধুমাত্র একজন theologian-তত্ত্বজ্ঞ বলে মনে হয়।

মানুষের সৌন্দর্য্যানুভূতির এই তিনটী ভাবধারাই কোথাও কম কোথাও বেশী করে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেছে। অধিকাংশ কবির চিত্তাকাশেই হয় ত সৌন্দর্য্যের যে চিত্রটি উদ্ভাসিত হয়, তার মধ্যে এক দিকে যেমনি আছে প্রাণের সুষমা, তেমনি হয় ত পাওয়া

যাবে চিত্তের তরলোচ্ছলতা, এমন কি তারি সাথে সাথে আবার বুদ্ধির সুসংযত বিন্যাস।

কিন্তু দেহ মন প্রাণ সমস্ত ছাড়িয়ে, সমস্ত পরাস্ত করেও, মানব হৃদয়ের গহনতম তলে নিবিড়তম এক চৈতন্য জাগ্‌ছে, যেখানকার ছায়ামাত্র পরশেও সমস্ত নগণ্যতা বিভবান্বিত হয়ে উঠে, যেখানকার কণামাত্র ক্ষীণ রশ্মি-রেখা গভীরতম আঁধারকে এমনি দীপ্ত করে তোলে যে, তার কাছে চিত্তের আকাঙ্ক্ষা-মাখা, প্রাণের অনুভূতি-রাঙা, মনের ভাবনা-পুষ্ট সমস্ত সৌন্দর্য্য মলিন বিশুষ্ক হয়ে যায়। ইহাকে চৈতন্য বলতে পারা যায়, আত্মা বলতে পারা যায়, এবং হয় ত এ লোকের সে অপূর্ব্ব রসেরই উপযুক্ত নাম 'আনন্দং'। ইংরেজীতে একেই Soul বলে, Ego বলে। যে ভাগ্যবান্ সৌন্দর্য্য-সাধক অন্তর্নিহিত এই অফুরন্ত উৎসের সন্ধান পেয়েছেন, তিনি সৌন্দর্য্যের অন্তর-লক্ষ্মীকে করায়ত্ত করতে পারবেন। কেন না, এ জগতে যা কিছু তুচ্ছ আছে, সে magic wandএর স্পর্শ মাত্র তা মহীয়ান্, রঙীন ও চিরন্তন হয়ে উঠবে। প্রতিদিনকার জীবনে যে বিরসতা দেখে তাঁর সৌন্দর্য্যানুভূতি ব্যথিত হয়েছে, তিনি দেখবেন সে আর বিরস নেই; কেন না 'রসো বৈ সঃ' তে সমস্ত পৃথিবী সিক্ত। যে নিরানন্দতা তাঁকে এখন পীড়া দিচ্ছে, নিমেষের আলোক সম্পাতে তিনি দেখ্‌বেন যে তা আনন্দেরি প্রকাশ;—কেন না, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দাং সম্প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি।' জীবনের যে অসম ও ছন্দহারা গতি তাঁর সৌন্দর্য্য-বোধকে আহত করেছে, কবি মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখলেন, সে এক অনির্ব্বচনীয় ছন্দের মধ্যে, এক অপরূপ সুসঙ্গতির মধ্যে সমাপ্তি লাভ করেছে; কেন না, 'ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি।'—তাই ত বৈষ্ণব কবি বলেন,—

"সূর্য্য নাচে চন্দ্র নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা গোরা॥"

অথবা,—

"হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ।
কি আনন্দ কি আনন্দ কি আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ।"

নিমেষের তরে যে কবি এরূপ দিব্য দৃষ্টির প্রসাদ লাভ করেছেন, তিনিই দেখতে পাবেন, সমস্ত খণ্ড এক অখণ্ডের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করেছে, ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত রিক্ততা এক পূর্ণতারি সমুদ্রে লীন হয়ে গেছে। তাই বোধ হয় Infernoর পরে Pongatorio এসেছে, Paradise Lost এর কবি Paradise Regained লিখ্‌তে বসলেন, Faust এর প্রথম ভাগ লিখেই গ্যয়টে ক্ষান্ত হলেন না, এবং Hamlet ও King Lear আদির সুমহান্ বিষাদের মধ্যে সেক্স-পীয়রের শিল্পী-জীবন অবসান লাভ না করে The Tempest এর করুণ, শান্তি ও স্নিগ্ধতার অপেক্ষায় বসে রইল। এমনিতর বিশ্বের অন্তস্তলের সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের কবিতার সম্বন্ধে এমার্সন লিখেছেন,—"their speech shall be lyrical, and sweet, and universal like the rising of the wind" দান্তে, মিল্টন, সেক্সপীয়র ও গ্যয়টের সম্বন্ধে এ কথাগুলো যে পুরোপুরী প্রযোজ্য তাতে তিলমাত্র সন্দেহের কারণ নেই।

কিন্তু, 'Our faith comes in moments' যে নিবিড়তম চৈতন্য জেগে উঠে ক্ষণে ক্ষণে, আর নিঃশেষও হয়ে যায় ক্ষণপরে। তাই, এই ক্ষণেকের দিব্যানুভূতিকে যাঁরা স্মৃতির মধ্য থেকে টেনে টেনে বাইরে এনে কাব্যে ও শিল্পে ফুটিয়ে তুলতে যান, তাঁদের অনেকেই উৎসাহের মোহে তাঁর আসল প্রাণটুকুকে হারিয়ে ফেলেন। সেই অযাচিত অপূর্ব্ব প্রেরণাকে ক্ষণেকের অবসানে শেষ না করে তাঁরা দীর্ঘজীবনব্যাপী স্থায়ী করতে যেয়ে তাকে স্বতোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্র থেকে নামিয়ে দেন, এই বোধ হয় Paradise Lost, Faust এর দ্বিতীয় খণ্ড এবং আমাদের দেশে 'প্রভাস' প্রভৃতির জন্মের, এবং তুলনায় কথঞ্চিৎ শিল্প-চাতুর্য্যের অভাবের কারণ।

সেই ক্ষণিকের উদ্ভাসের মধ্যে একদিকে যেমন চিরন্তন কালের বিশালতা এসে জড় হতে পারে, আর দিকে অবশ্য সে ক্ষণিক তেমনি করে আপনাকে চিরন্তনের বিশালতার মধ্যে প্রসারিত করেও দিতে পারে,—

'Can crowd eternity into an hour,
Or Stretch an hour to Eternity.'

কিন্তু এ কথা ঠিক যে মুহূর্ত্তের উদ্ভাসাবশেষে শুধুমাত্র তার পরিত্যক্ত রেখাটুকুকে সম্বল করে যাঁরা বহুদিনের চেষ্টায় সে Revelationকে মূর্ত্ত ও পরিস্ফুট করে তুলতে চান্, তাঁদের চেষ্টা সাধারণতঃ ব্যর্থই হয়। কেন না, এমনিতর Revelationএর ভাষা একদিকে যেমনি আয়তনে ক্ষুদ্র হতে বাধ্য, অপর দিকে তেমনি তাকে সঙ্গীতের মাধুর্য্যে ভরপুর হতেই হবে।—তাই সেখানকার কবিতা হয় হবে Lyric—গীতি কবিতা অথবা Mystical-'মরমী,' নয় Symbolic বা রূপক। কেন না, সেখানকার কবিরা প্রতি নিমেষেই জান্‌ছেন যে, সে অনির্ব্বচনীয় রসাবেশকে সম্পূর্ণ ভাষা দেওয়া যায় না, সে ক্ষণিকের মধ্যে চিরস্থায়ী স্বপ্নকে পরিপূর্ণ প্রকাশ দেওয়া অসম্ভব। তাই এখানকার গীতি-কবিতা হবে, কার্লাইলের অতুল ভাষায় 'like the infinite in-articulate wailing of forsakey infants.'—অর্থাৎ মরমী কবির কবিতার মর্ত একটি অব্যক্ত কূজন;—যেখানে বলার সাথে না-বলার দিকটার ইঙ্গিত ভেসে উঠে, যা 'অকথিত বাণী' যা 'অগীত গান' তারি আভাষ সমস্ত ধ্বনিত বাণীর মাঝ থেকে রণে উঠে, তারি রেশ সমস্ত গীত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনাকেও ছাপিয়ে দেয়। রূপকের জাল বুনে যাঁরা সেই স্বপ্ন কুহককে মায়াকে ধরতে চান্, তাঁরাও জানেন যে, রূপক তাকে বাঁধতে পারবে না,—রূপকে তার সন্নিহিত হতে পারা যায়, তার একটি অপূর্ণ অথচ সৌন্দর্য্যে ভরপুর আভাষ দেওয়া যায়।—এক কথায় কতকটুকু বলার মধ্যে অনেকখানি না বলাকে প্রচ্ছন্ন রাখাই হচ্ছে এমনিতর সাহিত্যের লক্ষণ। তাই না কল্পনা-লোকের সিংহ-দ্বারটি যাঁদের কাছে অপরিচিত, তাঁরা এ কবিতার বা নাট্যের নাম দেন, হেঁয়ালি। অথচ, এ হেঁয়ালিই একমাত্র সাহিত্য যাহা সর্ব্ব লোকে সর্ব্ব-কালে মানব-জাতির সাধারণ সম্পত্তি;—দেশ-কালের ক্ষুদ্র-বন্ধনের অতীত, এবং সেদিক থেকে দেখলে প্রতি মানবের একান্ত আত্মীয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে, "মানুষ আপনার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখতে পায়—শিল্পীর শিল্পে কবির কাব্যে মানুষের এই জন্যই এত অনুরাগ। এই জন্যই শিল্প-সাহিত্যে ভাব-ব্যঞ্জনার (suggestiveness) এত আদর।" যাঁদের কাব্যে এই ভাব-ব্যঞ্জনার দিকটা সব চেয়ে বেশী খেলা পেয়েছে, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ।—তাঁর প্রতিভার ভাতিতে সাহিত্যাকাশের এমন লুপ্ত কোণটি নেই যা ছেয়ে না-গেছে; কিন্তু যেখানে তিনি অনুপম সে হচ্ছে গীতি কবিতা,—যেখানে স্বল্প ব্যক্তের মধ্যে অপরিমেয় অব্যক্তের বিচিত্র মধুর আভাষ ভেসে উঠে। 'রাজা,' 'ডাকঘর,' 'ফাল্গুনী,' আদি রূপকের স্রষ্টা এবং 'জীবন দেবতা,' 'সোনার তরী' আদি সহস্রাধিক কবিতার মরমী কবি সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীর অন্তঃপুরের অনুসন্ধান পেয়েছেন। ইংরেজী সাহিত্যে কচিৎ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্লেক্ (ভাউহান্, ক্রশ' আদি গুহ্য-পন্থীদের আমরা theological গুহ্য তত্ত্বের অনুসন্ধানী হিসাবে ছেড়ে দিতে পারি), এবং আধুনিক কেল্টিক পুনরুত্থানে এ-ঈ, ঈয়েটস্ আদি 'মরমীরা' এ সৌন্দর্য্যের কথঞ্চিৎ আস্বাদন পেয়েছেন।—অমৃত লোকের আভাষ প্রাণের নিবিড় আবেগের পথ বেয়ে বেয়ে শেলির প্রাণে ঢুকেছিল সন্দেহ নেই,—কিন্তু উদ্দাম চঞ্চল কবির দৃষ্টি সমস্ত আলো-আঁধারের অসংখ্য চিকি-মিকি এড়িয়ে বোধ হয় সে প্রশান্ত শান্তির সীমাকে খুঁজে পায়নি। যদিও সুপ্রসিদ্ধ সমালোচকের মতে শেলিই একমাত্র কবি যাঁর কাছে Sphere-musicটা শুধুই একটা গদ্ ছিল না, ঝরা-পাতার মধ্যে যিনি বসন্তের নব-কিশলয়ের আহ্বান-লিপি দেখেছিলেন, 'If winter comes, can spring be far behind,—এবং যিনি Hymn to Intellectual Beautyতে নিখিল বিশ্বের অন্তঃপুরস্থ সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর স্তুতি গেয়েছেন,—তথাপি তাঁর কবিতা হচ্ছে হতাশার কবিতা, ব্যর্থতার ক্রন্দন, না-পাওয়ার অস্থিরতার চিহ্ন। বরং ওয়ার্ডস-ওয়ার্থে একটা সার্থকতার সৌম্য শান্তি আছে, এবং তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতায় Ziuteru Abbey, Stepping Westward, এবং Prelude ও Excursionএর স্থানে স্থানে সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও সৌন্দর্য্য-উপাসক কবির দৃষ্টিকে মিলিয়েছেন।' এমার্সনের ভাষায় বলতে গেলে এ দুই ইংরেজ কবির সম্বন্ধে বলা চলে, "The tone of Searching is one and the tone of having is another.'

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, কবি ও ঋষির মধ্যে সচরাচর যে সীমা-রেখা টানা হয়, সে যে কত কাল্পনিক ও কত ভ্রমাত্মক, সৌন্দর্য্যের সর্ব্বোচ্চ গ্রাম থেকে যাঁরা জীবনকে যাচাই করেছেন,—যেমন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা রবীন্দ্রনাথ—তাঁদের কবিতার অন্তরতম সত্যটিকে যাঁরা ধরতে পারেন, তাঁদের কাছে তা অজ্ঞাত থাকে না। অপর পক্ষে ঋষিত্বের শ্রেষ্ঠ দান যে কবিত্বের কত নিকট ও কত আপনার 'Consider the lilies of the field; they toil not, neither do they spin. Yet Solomon in all his glory was not arrayed like one of this.' ও তাপস ও কবি কবিরের দোহা, অথবা প্রাচীন ঋষির 'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' ইত্যাদি বাণীই তার প্রমাণ।

বাঙালা ভাষার আজকার দিনে যে মহারথী সগৌরবে জয়-যাত্রায় বেরিয়েছেন, এ খুবই স্বাভাবিক বাঙালার সমস্ত কবি ও সাহিত্যিক সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে তাঁর অনুকরণ করবেন। বাঙালা কবিতায় আজ সময়ে অসময়ে যে 'বিশ্ব-প্রেম ও' 'বিশ্বানুভূতি,' 'লোকোত্তর আহ্লাদ ও 'সর্ব্বানুভূতির কবিতা' এত বেশী পাঠ করা যায়, এটি কি তারি কারণ নয়? কিন্তু এক প্রকাণ্ড প্রতিভা তাঁর জীবন-ব্যাপী সাধনায় যে সুমহান সত্য ও সৌন্দর্য্যকে লাভ করলেন, হাল্‌কা ছন্দে হালকা কথায় তারি অনুকরণে তেমনিতর ভাব ও কল্পনাকে ভাসিয়ে দিলেই 'মরমী' আখ্যা পাওয়া যাবে না,—তাতে মরমী কবিতার উপর সাধারণ লোকের একটি অশ্রদ্ধা জাগানো ছাড়া আর বিশেষ কিছু লাভ হবে না।—যে কবিতা কবির পক্ষে সত্যিকার নয়, তাঁর আপন জীবনের মধ্যে যার কথিত সত্যের উপলব্ধি হয় নি;—সে চিরদিনই বাঁধি বুলি থেকে যায়।—"It is a man's sincerity and depth of vision that makes him a Poet." অধ্যাত্ম্য সাধনার যে সু-উচ্চ রাগিণী ঋষি-কবির বীণায় বেজে উঠেছ, তাকে শুধু উপলব্ধিশূন্য শ্রুতি মধুর ছন্দে ও শব্দে প্রকাশ করতে গেলে সে কবিতাকে অপমানিতই করা হয়।—তাই বলে সত্যিকারের মরমী কবিতার পদ-মর্য্যাদার কোনো হানি হল না;—সে যে সৌন্দর্য্য-লোকের অন্তঃপুরের অন্তর্হিত অন্তর্লক্ষ্মীকে অবগুণ্ঠন-হীন করার একটি অতি সুন্দর ও সুমহান্ প্রয়াস তা অস্বীকার করা চলে না।

দেশ-বিদেশের সভ্যতায় বাংলার দান

শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ গুহ, বি-এ

১

প্রাচীন-যুগ

সিংহলের পুরাবৃত্ত "মহাবংশ" হইতে জানা যায়, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে [খৃঃ পূঃ ৫৪৩] বাংলার রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ সাত শত অনুচর সহ সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত

হন। বিজয়সিংহ ও তাঁহার অনুচরেরা লঙ্কাদ্বীপের অধিবাসীগণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন; এবং বিজয়সিংহ লঙ্কার রাজা হন। তখন হইতে লঙ্কার ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ; বিজয়সিংহের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার বৎসর হইতে লঙ্কার অধিবাসীরা সাল গণনা করিয়া থাকে। আর বিজয়সিংহের বংশ নাম অনুসারে লঙ্কাদ্বীপের নাম হইল "সিংহল"। দেখিতে পাইতেছি, আড়াই হাজার বৎসর আগে লঙ্কায় উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে বৃহত্তর বাংলার (Greater Bengal-এর) সূচনা।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে, "চম্পা" নামে নগরীর পরিচয় পাই। "চম্পা" সেই সময়ের ভারতের উন্নত সহরগুলির মধ্যে একটি। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ "চম্পা"র অবস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, "চম্পা" আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের খুবই নিকটে ছিল; এই "চম্পা" নগরী হইতে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী "কোচিন চায়না"য় গিয়া এক বৃহৎ উপনিবেশ গড়িয়া তোলে; আর সেই উপনিবেশের নাম দেয় তা'দের সেই জন্মভূমি, "চম্পা"র নামানুসারে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক, অধ্যাপক ডাক্তার রিস্ ডেভিড্‌স্ (Prof. Dr. Rhys Davids) তাঁহার "বৌদ্ধ ভারত" ("Buddhist India") নামক গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ এবং সমর্থন করিয়াছেন। এই উপনিবেশ স্থাপনের কাল খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী,—ইহা যে মৌর্য্য-সাম্রাজ্য স্থাপনের (খৃঃ পূঃ ৩২২) পূর্ব্বের ঘটনা, তা'র স্বপক্ষে ঐতিহাসিক যুক্তি আছে।

২

মধ্য-যুগ

খৃষ্টের পরবর্ত্তী সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনা পণ্ডিত-পরিব্রাজক য়ু-আ-ন চুয়াঙ্ (Yuan Chwang) যখন ভারত-ভ্রমণে আসেন, তখন নালন্দা বিহার ও মহাবিদ্যালয় ছিল বৌদ্ধ-জগতের ধর্ম্ম ও শিক্ষা-কেন্দ্র। আর সেই নালন্দা বিহার ও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন মহাস্থবির শীলভদ্র। শীলভদ্রের জন্মস্থান ছিল সমতট, বাংলার পূর্ব্বপ্রান্তে। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্য বৌদ্ধ-জগতের সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁর ছিল কার্য্য-দক্ষতা। নালন্দায় "ভিক্ষু"র সংখ্যাই ছিল সাড়ে তিন হাজার, আমরা I-tsing নামক পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি; আর ছাত্র ও "ভিক্ষু" মিলিয়া সংখ্যা ছিল প্রায় দশহাজার, য়ু-আ-ন চুয়ান (Yuan Chwang) এর বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। শীলভদ্র ছিলেন এত বড় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ,—ইহার মানসিক ও নৈতিক জীবনের পরিচালক।

নালন্দা মহাবিদ্যালয়ে বাঙ্গালী "মহাস্থবির" শান্তরক্ষিতও অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। "ভিক্ষু"-সংঙ্ঘে তাঁর স্থান ছিল অতি উচ্চে।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী পণ্ডিত দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও "বৌদ্ধ" ছাঁচের হিন্দুসভ্যতার প্রচার করেন। তাঁর প্রচার তিব্বতে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। তিব্বতীয়েরা তাঁর প্রতি দেবতার তুল্য সম্মান দেখাইত। এই হাজার বৎসরের ব্যবধানেও সে সম্মানের হ্রাস হয় নাই।

বাংলার ধর্ম্মজীবনের বন্যার ঢেউ চীন, কোরিয়া এমন কি সুদূর জাপানেও পৌঁছিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জাপানের হোরিউজি (Horiuzi) বিহারে একখানা বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; পুস্তকখানার নাম "উষ্ণীষ বিজয় ধারিণী"। জাপানী পুরোহিতগণ বহুদিন ধরিয়া পুঁথিখানাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, এমন কি উহার পূজা করিয়া থাকেন। পুঁথিখানার অক্ষরসমূহের অবিকল ফটো তোলা হইয়াছে। ঐ ফটো দেখিয়া ভাষাবিদ্‌গণের ধারণা এই যে উহা একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বাংলা অক্ষরে লিখিত। ইহা হইতে এক সময়ে জাপানে যে বাংলার ধর্ম্মপ্রচারকগণের বিশেষ প্রভাব ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অধ্যাপক ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "History of Bengali Literature" নামক গ্রন্থে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

শিল্প ও চিত্র-বিদ্যায়ও বাঙ্গালীর বিশেষ দক্ষতা ছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে ধীমান ও তাঁহার পুত্রের শিল্প ও চিত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। নেপালে উহার প্রচার হয়, ও সেখানে উহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। নেপাল হইতে ক্রমে চীন ও অন্যান্য বৌদ্ধ দেশে ছড়াইয়া পড়ে। এখনও ধীমানের শিল্পের বৈশিষ্ট্য ঐ সমস্ত দেশের শিল্পে ও চিত্রে ধরা পড়িতেছে। (Indian Antiquary Vol.IV.,১০১পৃঃ)

চিত্র ও শিল্প সমালোচকেরা যবদ্বীপের (Java) বুরোবুদুর মন্দিরের চিত্রে ও শিল্পে বাংলার কৃতিত্বের পরিচয় পাইতেছেন। তাঁহাদের ধারণা, কলিঙ্গ ও গুজরাটের সঙ্গে বাংলাও যবদ্বীপের সভ্যতা-গঠনে সহায়তা করিয়াছিল। তৎকালীন বাংলার সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্যসূচক অনেক চিত্রাদি যবদ্বীপের মন্দির-গাত্রে ধরা পড়িতেছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার "A History of Indian Shipping and Maritime Activity" নামক গ্রন্থে ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন।

মধ্য-যুগের বাংলায় তাম্রলিপ্ত, সাতগাঁও, চম্পা প্রভৃতি বড় বড় বন্দর ছিল। তাম্রলিপ্ত হইতে চীন ও সন্নিকটস্থ দেশসমূহে অবিরত জাহাজ যাতায়াত করিত। প্রসিদ্ধ চীনা পরিব্রাজক I-tsing তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাম্রলিপ্তের বর্ণনা করিয়াছেন, ও স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তিনি তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজে চড়িয়া চীনে ফিরিয়া যান (I-tsing এর ভ্রমণ কাহিনী, ডাক্তার Taka Kusur অনুবাদ, অধ্যায় ৩৩ এবং ৩৪)। চম্পা হইতে সুবর্ণভূমি বা আধুনিক বার্ম্মা পর্য্যন্ত সমুদ্রপথে বণিকগণ অবিরত যাতায়াত করিত।

পালবংশের রাজত্বকাল (৭৩০—১১৭৫ খৃষ্টাব্দ) বাংলার বিশেষ গৌরবের যুগ; ঐ যুগে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বাংলার প্রভাবের বিস্তার হয়। ঐ যুগের বাংলা সম্বন্ধে সুকবি সুব্রত চক্রবর্ত্তীর কবিতার কএকটি চরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"অবন্তি ভোজগুর্জ্জর কীর বীর্য্যে যাহার নমিত শির,
মাৎস্য ন্যায়ের কণ্টক বেরা উপাড়িল বলে ধরিত্রীর;
কান্যকুব্জ পণ্ডিতারাতি স্থাপিল যে পুনঃ সিংহাসন,
কাশ্মীরে রামস্বামীর ধ্বংস করেছে যাহার পুত্রগণ";
হৈহয় আর রাঠোর ধন্য কন্যা যাহারে করিয়া দান;"

ভারতের ইতিহাস সম্যক্ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, মধ্য-যুগের বাঙ্গালী ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কএক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার তিনখানি শিলালিপি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত বিবরণ আবিষ্কার করিয়াছেন:—

(ক) বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য

লিপিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য গৌড়-দেশের অন্তর্গত রাঢ় প্রদেশের পূর্ব্ব-গ্রাম নামক স্থানের অধিবাসী। সুতরাং তিনি যে বাঙ্গালী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইনি ধর্ম্ম-শম্ভু নামক শিব-গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া বেলাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কাকতীয়-রাজ, মালব-রাজ, চোল-রাজ ও অন্যান্য রাজগণ ইঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কাকতীয়-রাজ গণপতি নিজেকে ইঁহার পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিশ্বেশ্বরের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল; এবং বাংলাদেশের বহুলোক কাকতীয়-রাজ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। ১১৮৩ শকাব্দে (১২৬১ খৃষ্টাব্দে) রাণী রুদ্রদেবী আচার্য্য বিশ্বেশ্বর-শম্ভুকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ মন্দির ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রাম ও ভূমি প্রদান করেন। মন্দির নামক গ্রামে আচার্য্য কর্ত্তৃক একটি শিবমন্দির, মঠ ও অন্নসত্র স্থাপিত হয়। কাকতীয়-রাণীর নিকট তিনি যে ভূমি প্রাপ্ত হন, তার কিয়দংশ ঘাটটি দ্রাবিড় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করেন। অবশিষ্ট অংশ সমান তিন ভাগ করিয়া, এক ভাগ শিবমন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ,—দ্বিতীয় ভাগ মঠ ও ছাত্রগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত এবং তৃতীয় ভাগ একটি মাতৃ-মন্দির, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি অন্নসত্রের ব্যয় বহন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান।

উল্লিখিত মহদনুষ্ঠান ব্যতীত বিশ্বেশ্বর আচার্য্য আরও নানা স্থানে মঠ, শিবলিঙ্গ, অন্নসত্র, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎসমুদায়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূমি দান করিয়াছেলেন।

প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলার এই কর্ম্মবীর, সুদূর দাক্ষিণাত্যে গৌরবময় রাজগুরু-পদে অভিষিক্ত থাকিয়া এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদন করতঃ বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

(খ) ঈশান শিব

প্রাচীন পাঞ্চাল দেশের অন্তর্গত, যুক্ত-প্রদেশস্থ বদাউন নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে আর একজন বাঙ্গালী শিব-সাধকের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাঞ্চালদেশে রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ঈশান শিব নামক গৌড়দেশীয় একজন শিব-সাধক এই বংশের দশম রাজা অমৃতপালের গুরু ও একটি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন।

বিশ্বেশ্বর আচার্য্য ও ঈশান শিবের জীবনী আলোচনা করিলে ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

(গ) গদাধর

আগ্রাজেলার অন্তর্গত বটেশ্বর নামক স্থানে প্রাপ্ত, ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে একটি বাঙ্গালী পরিবারের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়, গৌড়দেশীয় লক্ষ্মীধরের গদাধর নামক এক পুত্র ছিলেন। ইনি কবি ও বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং চান্দিল্ল-রাজ পরমর্দ্দিদেবের সন্ধি-বিগ্রাহিক, নামধেয় সম্মানিত ও ক্ষমতাযুক্ত প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রও একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন।

দেশ-বিদেশের সভ্যতায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার প্রভাবের কতকটা আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে আরও অনেক তথ্য বাহির হইবে।

একাকার

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

এলো-খোঁপা, সরু দুটি বালা
একগাছি প্রাণবাঁধা হার,
রূপ —জিনি' নব মেঘমালা,
বাণী—জিনি' নির্ঝরি ঝঙ্কার;
বড় বড় দুটি কালো চোখ্
ঢল' ঢল' আমারি সোহাগে,
আজি মোর তাই সুধালোক,
আজি মোর তাই প্রাণে জাগে।

বুকে তার লেখা মোর ছবি,
প্রাণে মোর বিছানো শয়ন;
ধন্য আমি ধন্য রে গরবী
করিল যে মোরে সে চয়ন।
"প্রিয়তম, স্পর্শমণি তুমি"
কহে, রাখি' অধরে অধর,
"প্রিয়তমে", কহি স্নেহে চুমি
"তুমি মোর অমিয়-সাগর।"

সঙ্গীতের সংস্কার—প্রকাশভঙ্গী ও ব্যক্তিত্ব

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত)

আমি আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলেছি যে, আমাদের সঙ্গীতের বিকাশ অনুপম ও মহৎ হলেও, তার সংস্কার আজ বড়ই দরকার হয়ে পড়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এ সংস্কারটা মোটের ওপর বাস্তবিকই বাঞ্ছনীয় কি না। কারণ, এ সংশয় মনে স্বতঃই উদয় হতে পারে যে, আমাদের সঙ্গীতের যদি কোনও স্থায়ী আবেদন সত্যই থাকে, তার সংস্কার সাধন কর্ত্তে গেলে তার হানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না। উত্তরে আমি বল্‌ব "আছে নিশ্চয়ই।" এবং আমি আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে, সংস্কার সম্পর্কে কতরকম ভুলভ্রান্তি হতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। সে নিয়ে এখন আর আলোচনা করব না; কেবল আজ এই কথাটি বিশেষ করে বল্‌তে চাই যে, কোন অনুষ্ঠান বা প্রচেষ্টার মধ্যে বিপদ থাক্‌লেই যে সেটি নিন্দনীয়, এ কথা সত্য নয়। তা যদি হত, তবে সনাতন গরুর গাড়ী হ'ত আদর্শ যান, যেহেতু, গরুর গাড়ীর যে কখনও কোনও বিপদাপদ ঘটেছে, এ কথা মান্ধাতার আমল থেকে কেউ কখনও শোনে নি। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমার মনে হয়, রেল বা মোটর গাড়ী যে শ্রেষ্ঠতর বাহন, এ সম্বন্ধে মতভেদের সম্ভাবনা খুব বেশী নেই, যদিও রেল মোটরে বিপদ পদে পদে। বিপদাপদের সম্ভাবনা না থাক্‌লে মনে একটা নিরাপদের ভাব আসে, যেটা স্বাচ্ছন্দ্য দেয়, এ কথা অবশ্য ঠিক্। কিন্তু শুদ্ধ এই যুক্তির বলে এরূপ অবস্থা কিছু একটা চরম বাঞ্ছনীয় অবস্থা বলে গণ্য হতে পারে না—আদর্শ ত নয়ই। তা যদি হতে পারত, তবে বলা চল্‌ত যে গতিশীল নদীর চেয়ে অচল পুষ্করিণী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু, স্রোতে কত রাজ্যেরই না ময়লা টেনে আনে। কিন্তু মানুষের জীবন ও ইতিহাসের অভিজ্ঞতা উল্‌টো সাক্ষ্য দেয়। যাতেই প্রাণশক্তি আছে, তার মধ্যেই বিপদ আছে; কারণ, এ হচ্ছে জীবনের ধর্ম্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এ বিপদ-পূর্ণ প্রাণশক্তিই শ্রেয়ঃ এই জন্য, যে, এর মধ্যেই সৃষ্টির বীজ উপ্ত আছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশ বাস্তবিকই সঙ্গীতরাজ্যে অনুপম, এ কথা আগেই বলেছি; কিন্তু কোনও ভূত গরিমাকে শুধু কোলে করে নিয়ে বসে থাক্‌লে, এ সঙ্গীত আমাদের বরাবর সমান আনন্দ দিতে পারবে না। এ আনন্দের সরসতা বজায় রাখ্‌তে হলে নতুন নতুন সৃষ্টি-কাজ আমাদের কর্ত্তেই হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যা পেয়েছি, তাই কোনও মতে বজায় রেখে দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া একটা আদর্শ হতে পারে না। সে সম্পৎকে আমাদের আরও সমৃদ্ধ করে তুল্‌তে হবে। কারণ জীবন-বিধাতার আমাদের কাছে এইটেই পাওনা।

সৃজন যদি আমাদের কর্ত্তব্য হয়, তবে একটা জিনিষ বড় দরকার। সেটা এই যে, আমাদের সঙ্গীতকে হুবহু গতানুগতিক হয়ে পড়তে দিলে চল্‌বে না। সময় যায় বটে, কিন্তু যাবার সময় আমাদের মনের ওপর একটা ছাপ চিরকালের জন্য এঁকে দিয়ে তবে যায়। হাজারই চেষ্টা করি না কেন, আমরা কখনই ঠিক্ আমাদের পিতৃ-পিতামহদের মত হতে পারব না, আমাদের পরবর্ত্তীদের ঠিক্ আমাদের মতন করে গড়ে তুল্‌তে পারব না। এক কথায় আমাদের মন বস্তুটি অহরহ অল্প অল্প করে বদ্‌লে যাচ্ছে। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ললিতকলার (art) ধারণাও একটু না একটু বদলে যাবেই যাবে, কারণ ললিতকলার স্ফুরণ ত মনেরই উপর নির্ভর করে! সুতরাং সময়ের ও মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গীতকেও কম-বেশি পরিবর্ত্তনে রাজী হতেই হবে, কেন না, সঙ্গীত ললিতকলাদের অন্যতম মাত্র। এই জন্যে সঙ্গীতের প্রকৃতি গতিশীল, স্থিতিশীল নয়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে আমাদের সঙ্গীত আজ বহুদিন যাবৎ প্রায় স্থাণুর

মতই স্থিতিশীল (অর্থাৎ কি না পশ্চাদ্‌গামী) হয়ে রয়েছে—অন্ততঃ ভারতে ইংরাজ-আমলের পর থেকে ত বটেই।

কথাটা বিশদ করে বলি। সঙ্গীতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ধ্রুপদের পর খেয়াল সৃষ্টি হয়েছিল—আমীর খসরু প্রমুখ গুণীদের দ্বারা। কারণ লোকে তখন দেখ্‌ল যে, ধ্রুপদে আর সে রস পাওয়া যাচ্ছে না—বৈচিত্র্য দিয়ে তাকে সরস করে না নিলে। ঠিক্ ঐ কারণেই আরও পরে টপ্পা-ঠুংরির সৃষ্টি। অনেক ওস্তাদ আছেন যাঁরা খেয়ালের নাম শুন্‌লে মারতে উঠেন—কারণ খেয়াল না কি ধ্রুপদকে অপমান করে থাকে। খেয়ালীরা তেম্‌নি টপ্পা, ঠুংরির ওপর খড়্গহস্ত। আমি কিন্তু খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরির বিকাশকে অভিনন্দন না করেই পারি না; ও আগেকার দিনে যে এ রকম নব-সৃষ্টি হত, এ কথা মনে করে আনন্দ পেয়ে থাকি। সেটা এই ভেবে যে, এক দিন ছিল যে দিন আমাদের সঙ্গীত ছিল—জীবন্ত, কেন না, দেখা যাচ্ছে যে, তখন সে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুনকে সৃষ্টি করেছে ও গ্রহণ কর্ত্তে দ্বিধা করে নি। কিন্তু আজ? হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারায় নূতন কিছুর সৃষ্টি যে কত দিন পরে হয় নি, তা আমি ঠিক্ বল্‌তে পারি না; তবে ৫০।৬০ বৎসর যে হয় নি এটা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। আমরা সঙ্গীতকে ললিতকলা হিসেবে ভাবা বহু দিন ছেড়ে দিয়েছি। বর্ত্তমান যুগের নানান্ জটিল স্রোত ও অভিজ্ঞতার আলোয় সঙ্গীতকে নতুন করে বিচার করে দেখা আমরা দরকার মনে করি না।

কিন্তু এরূপ অবস্থা কি বাঞ্ছনীয়? আমি এমন কথা অনেকবার শুনেছি যে, আমাদের সঙ্গীত আজ বহু দিন চরম উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে; সুতরাং আজ Othello's occupation is gone অর্থাৎ আমাদের আজ নতুন কিছু করবার নেই। ভূত গরিমাকে অত্যন্ত বড় করে দেখার ফলে চিত্তবিভ্রম ঘটা যে কত সহজ, এ উক্তিটি তার একটা মস্ত প্রমাণ। এটা অত্যন্ত বাজে কথা, কারণ এ কথা বলাও যা, আর সঙ্গীতের অসীম বিকাশ ও অনন্ত রহস্যের ইঙ্গিতকে (suggestion) অস্বীকার করাও তাই। সময়ের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সঙ্গীতে মানুষের সৌন্দর্য্য-অনুভূতির অভিব্যক্তি একভাবেই কায়েম হয়ে থাক্‌বে—এটা সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়।

এ থেকে এ কথা যেন কেউ মনে না করেন যে, আমি আমাদের classical বা হিন্দুস্থানী * সঙ্গীতের মহত্ত্ব অস্বীকার কর্চ্ছি। আমি আমাদের classical সঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাগী, কারণ আমি মানি যে classical হচ্ছে যা-কিছু "belongs to class of the very best" (Mathew Arnold); এবং আমি আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে classical আখ্যা দিচ্ছি, এতেই প্রমাণ হওয়া উচিত—আমি হিন্দুস্থানীগণকে কি চোখে দেখি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত classical, কেন না, এর মধ্যে একটা স্থায়ী আবেদন আছে, যা সময়ের, সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা, অতিরিক্ত। এরূপ মহনীয় কোনও বিকাশকে শ্রদ্ধা না করা সম্ভব নয়। মহাকাব্য বা মহাসঙ্গীত যখন একবার বিকাশ লাভ করে, তখন তা বহুদিনের জন্যই করে। সুতরাং হিন্দুস্থানী গানের ধারার সঙ্গে আমার কোনও বিবাদই থাক্‌তে পারে না। আমি কেবল বল্‌তে চাই এই কথা যে, সে ধারা মূলতঃ বজায় রাখা বাঞ্ছনীয় হলেও, তার অভিব্যক্তিকে এক অপরিবর্ত্তনীয় রূপ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অর্থাৎ তার প্রকাশকে বিচিত্র করা ও ভঙ্গীকে বহুধা করার স্বাধীনতা গায়ককে দেওয়া দরকার। কোনও জীবন্ত শিল্পেরই (art) স্বরূপ বা কাঠাম অপরিবর্ত্তনীয় হওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া নতুন সুরের সঙ্গীতেরও উদ্ভাবন হওয়া উচিত, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য নয়, বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধতর করার জন্য। অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পাশাপাশি এরূপ সঙ্গীত বিরাজ করা সঙ্গীতের বৈচিত্র্যের জন্য দরকার। অপিচ আমাদের রাগরাগিণীগুলির রূপকে বজায় রাখা দরকার। কেবল তার চাল বা প্রকাশভঙ্গীর জন্য যেন একটা অনড় একঘেয়ে কাঠাম তৈরী করে দেওয়া না হয়, যার বাইরে যাওয়া একেবারেই চলবে না। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে রাগরাগিণী-

* দক্ষিণী কর্ণাটী সঙ্গীতও classical সঙ্গীত। তবে উত্তরের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত মুসলমান cultureএর সংস্পর্শে এসে ভারি সুন্দর বিকাশ লাভ করেছে, যেটা কর্ণাটী সঙ্গীতের ভাগ্যে ঘটেনি। (কারণ দক্ষিণে মুসলমান প্রভাব কখনই খুব বেশি শিকড় নেয়নি) সুতরাং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকেই আমি ভারতীয় সঙ্গীতের চরম অভিব্যক্তি বলে মনে করার দরুণ classical ভারতীয় সঙ্গীত বলতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতই বোঝাতে চাই।

গুলির প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠাও সম্ভবপর হয় না, নূতন সৃষ্টির পথও পরিষ্কার হয় না।

কথাটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। আগে একরকম সগমক ধ্রুপদ গাওয়া হত। সে রকম চালের (style) ধ্রুপদ আজ উঠে গেছে বললেই হয়। এখন সমগ্র ভারতবর্ষে বোধ হয় মাত্র চার পাঁচ জন ওস্তাদ আছেন, যাঁরা সে চালের একটা ধারণা দিতে পারেন। কাজেই আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ সঙ্গীতানুরাগীদেরই এ চালের ধারণা নেই; যেহেতু তাঁরা এ চালের ধ্রুপদ শোন্‌বার বড় একটা সুযোগ পান নি। এঁদের মৃত্যুর পর এ চালের ধ্রুপদ একেবারেই লুপ্ত হবে। এরূপ চালের ধ্রুপদ আজ মুমূর্ষু কেন, প্রশ্নটি স্বতঃই মনে উদয় হয়। বর্ত্তমান সময়ে দুজন মাত্র মুসলমান ধ্রুপদী—এঁরা দুই ভাই—এই চালের গানে শ্রেষ্ঠ। তাঁদের মধ্যে একজনের গান আমি গুজরাতে শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম। শোন্‌বামাত্র পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়েছিলাম। সেটা এই যে, এ সঙ্গীতকে ধরে বেঁধে বজায় রাখা হয়েচে। আমাদের মন আজ এতই বদ্‌লে গেছে যে, এরূপ বিশুদ্ধ ও মিষ্টত্বহীন ওস্তাদীতে তা ভরে ওঠে না। কাজেই এরূপ ভাবে কোনও চালের সঙ্গীতকে বজায় রাখা অনেকটা জীবনহীন দেহকে বজায় রাখ্‌বার চেষ্টার মতনই নিষ্ফল। প্রত্যেক আর্টের বিকাশেরই এরূপ স্ফুরণ ও পতন হয়। আবার নূতন শিল্পীর দরকার হয়, যে পুরাতনের ভগ্নমন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে নূতন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার সময় এসেছে, কারণ আমাদের সময়ের সঙ্গীতকলাকে decadent (অধোগামী) বলা যেতে পারে। এখন তাতে নতুন করে প্রাণ সঞ্চারের সময় এসেছে, যাকে ললিতকলায় বলে renaissance।

এজন্য চাই প্রাণহীন তানালাপের বর্জ্জন—তা সে তানালাপ যতই বিস্ময়কর হোক্ না কেন। আরও চাই অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করা—অর্থাৎ যে স্বর-বৈচিত্র্য বা ভঙ্গীতে আমাদের হৃদয় সাড়া না দেয়, তাকে বর্জ্জন করা। তাই বলে আমি তান বিস্তারের (improvisation) বা স্বরে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের বিরোধী নই—কারণ ঐটেই আমাদের সঙ্গীতের আসল ধারা। আসল কথা হচ্ছে, সঙ্গীতকে নিয়ে নূতন করে অনুভব কর্ত্তে হবে ও বিচার কর্ত্তে হবে ও নূতন করে তার মূল্য ধার্য্য কর্ত্তে হবে। তা ছাড়া সঙ্গীতকে বিশ্লেষণ করে দেখার অভ্যাস কর্ত্তে হবে। এবং সব চেয়ে বেশি দরকার সঙ্গীতে নতুন কোনও আইডিয়া বা প্রেরণার দিকে মুখ না ফিরিয়ে তাকে অভিনন্দন কর্ত্তে ও তার ন্যায্য দাম দিতে শেখা। ওস্তাদরা ঠিক এই নূতনত্বকে আমল দেবারই বিরোধী। কাজে কাজেই তাদের কারুকার্য্যে বিস্ময়কর উপাদান যথেষ্ট থাক্‌লেও সজীবতা ও নূতন বৈচিত্র্যের অভাব আমাদের মনকে বড়ই শ্রান্ত করে তোলে।

আমাদের সঙ্গীতে নূতন চাল বা ভঙ্গীর আমদানী কর্ত্তে হলে, আমাদের মনকে একদেশদর্শী করে রাখ্‌লে চল্‌বে না। সঙ্গীতে নূতন কোনও হাওয়া বইলে তার ন্যায্য দাম দিতে শেখা দরকার, ও তাতে কিছু সত্যকার সৌন্দর্য্য আছে কি না নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে দেখার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশের ওস্তাদরা তাঁদের অত্যন্ত সনাতন চাল হতে সামান্য বিভিন্ন কোনও চাল দেখলেও, সেটা যে খারাপ, তা অতি সহজে সিদ্ধান্ত করে বসে থাকেন। খেয়ালের নিন্দায় ধ্রুপদী পঞ্চমুখ হয়ে বসেন, টপ্পাঠুংরির নিন্দায় খেয়ালী বাগ্মিতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে ছাড়েন না, ও ধ্রুপদ-খেয়াল-টপ্পার অন্তর্গত নয় এমন কোনও সুরের বিরুদ্ধে এই কয় সম্প্রদায়ই তাঁদের শত মতভেদ জলাঞ্জলি দিয়ে একতার মহিমা প্রচারার্থে আগুন হয়ে ওঠেন। নূতন কিছু যে শুধু তার নূতনত্বের জন্যই অনুচিত ও অশোভন, এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধ নেই। একটা উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্যটা আরও একটু বিশদ করে তোলার চেষ্টা করব। একজন শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক গায়কের সঙ্গে একটু নিকট সংস্পর্শেই আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ইনি একজন অতি মধুর গায়ক ও এঁর গানের চালও (style) সম্পূর্ণ মৌলিক, অন্ততঃ আমি ত প্রায় সারা ভারত ঘুরে এঁর অনুরূপ চাল শুনিনি। এঁর খেয়াল সাধারণতঃ অতি মধুর হয়ে থাকে; কারণ ইনি তাঁর খেয়ালে টপ্পার ছোট ছোট কারুকার্য্য বড় সুন্দর শোভন ভাবে গ্রথিত করেন। কিন্তু ঠিক্ এই জন্যই—অর্থাৎ যেটা তাঁর একটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় মৌলিকতা, সেইজন্যই—ওস্তাদরা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট নন। তাঁরা বলেন, এঁর গান মিষ্ট বটে কিন্তু "খেয়াল" নয়।

অথচ প্রকৃত কলাবিৎ (artist) হিসাবে তাঁর স্থান বোধ হয় আজ আমাদের দেশের কোনও কলবিৎএরই নীচে নয়, এবং এত বড় কথাটা আমি প্রায় সারা ভারত ঘুরে শ্রেষ্ঠ গায়কদের গান শুনেই বল্‌ছি।

সঙ্গীতের কোনও নূতন ভঙ্গী বা চালের মধ্যে সত্যকার সৌন্দর্য্য থাক্‌লেও আমাদের ওস্তাদরা যে উপলব্ধি কর্ত্তে অক্ষম—যেমন পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে—এটা সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই কাছে আক্ষেপের বিষয় হওয়া উচিত। কারণ কোনও কিছুর বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই মানুষ সেই বিষয়ের উন্নতির আশা করে থাকে—এবং এ আশা করাটা কিছু অসঙ্গতও নয়। তাই সঙ্গত আশায় নিরাশ হতে হলে মানুষ ক্ষুব্ধ না হয়েই পারে না। কিন্তু সে যাই হোক, মানুষ যে গোঁড়ামিতে কতদূর অন্ধ হতে পারে ও ইচ্ছে করে কতখানি সত্য রস হতে বঞ্চিত হতে পারে, এ উদাহরণটি তার একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত। সনাতন কিছুর মূল্য অনেক স্থলেই যথেষ্ট থাকে সত্য, কিন্তু তাই বলে যা কিছু আধুনিক তাই যে অসার, এ কথা শুধু অসত্য নয়, অশ্রদ্ধেয়। কেন না, এটা কি সম্ভবপর যে কেবল কোনও বিগত যুগে মানুষ একবার মাত্র স্রষ্টার সিংহাসনে বস্‌তে পেরেছিল—যখন শিল্পকলায় নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা তাদের আয়ত্তাধীন ছিল—কিন্তু তার পর থেকে মানুষ আর কখনও সে প্রতিভার অধিকারী হতেই পারে না? ভূত গরিমাকে এ রকম ভাবে বড় করে দেখার প্রবৃত্তি শুধু ভারতের একচেটে নয়, য়ুরোপেও যথেষ্ট আছে। তবে সেখানে এ প্রবৃত্তিটি আমাদের দেশের মত প্রবল নয়; কারণ, সেখানে লোকে ললিতকলা সম্বন্ধে একটু ভাবে ব'লে বোঝে যে, প্রতিভা কোনও এক বিশেষ যুগের একচেটে হতে পারে না। এ কথা বলাও যা, আর মানুষকে অপমান করাও তাই। তাই আমি এ কথা কোনও মতেই বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না যে, আমাদের সঙ্গীত আর কখনই তানসেন সদারঙ্গ প্রভৃতির সময়ের মত উচ্চ বিকাশ লাভ কর্ত্তে পারবে না। তাছাড়া আমি এ কথাও মনে কর্ত্তে অক্ষম যে, বর্ত্তমানকে ছোট করে দেখা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একান্ত নিরাশ হওয়াই হচ্ছে ভূত মহিমাকে সম্যক্ উপলব্ধি করার একমাত্র উপায়।

সঙ্গীতে নূতন ভঙ্গী বা চালের (style) আমদানীকে অভিনন্দন করার আরও একটা মস্ত বড় কারণ আছে। সেটা এই যে, যে কোনও ললিতকলার প্রকাশভঙ্গী ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। একজন বড় শিল্পী তাঁর সঙ্গীতে নিজেকে ঢেলে দিতে সক্ষম হন বলেই তিনি বড়। এবং মানুষের স্বরূপটির অনেকখানিই তার প্রকাশ-ভঙ্গীতে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। অন্ততঃ এটা আমাদের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ রকমই খাটে, যদিও পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধেও যে একেবারে খাটে না এমন নয়। কারণ আমাদের সঙ্গীতে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মতন অপরের রচনাই হুবহু গেয়ে যেতে হয় না, গায়কের বা বাদকের স্বাধীন সৃষ্টির ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি। সে যাই হোক্, আপাততঃ আমাদের সঙ্গীতের সম্পর্কে এটা বোধ হয় বলা চলে যে, তাতে প্রকাশভঙ্গীর দাম অন্যান্য ললিতকলার প্রকাশভঙ্গীর দামের চেয়ে কম ত নয়ই, বরং বেশি। কারণ, সঙ্গীতে শিল্পী নিজেকে যে চিনিয়ে দেয় সেটা প্রত্যক্ষ। সাহিত্য স্থাপত্য বা চিত্রকলায় তা নয়। কারণ এ সব শিল্পের রস গ্রহণ কর্ত্তে হলে শিল্পীকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার দরকার হয় না। কিন্তু সঙ্গীতে কলাবিৎ শুধু তাঁর স্বর ভঙ্গীতে নয়, তাঁর প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়ে নিজেকে ফুট করে তোলেন বলে তাঁর সমগ্র প্রকাশভঙ্গী এত জীবন্ত। গুণী তাঁর ব্যক্তিত্ব সঙ্গীতের মধ্যে যতই ঢেলে দিতে পারবেন, তাঁর গানের রসও ততই উজ্জ্বল ও মধুর হয়ে ধরা দেবে, ও তাঁতে তৃপ্তিও ততই বেশি মিল্‌বে। কাজেই যদি কোন গায়কের স্বীয় ব্যক্তিত্ব তার নিজের গানে সম্যক্ মূর্ত্ত করে তুল্‌তে হয়, তাহলে তাকে তার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর বিকাশ করার মতই স্বাধীনতা দেওয়া যাবে, ততই ভাল হবে। আমাদের ওস্তাদের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, তাঁর কাছে এ কথাটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের ওস্তাদরা ছাত্রের পক্ষে মাছি-মারা নকলের কিরূপ পক্ষপাতী, এ কথা যিনি জানেন, আমার বক্তব্যটি বুঝতে বোধ হয় তাঁর কষ্ট হবে না। সঙ্গীতের উচ্চতর বাণী সম্বন্ধে এ সব ওস্তাদদের কোনও ধারণাই নেই। কাজেই তারা বোঝে না যে সঙ্গীতকার কিছু কেরাণী নয়, যে সে মাত্র হুবহু নকলে কোনও সার্থকতা বোধ করবে। তারা জানে না যে সঙ্গীতের উদ্দেশ্য নিজেকে প্রকাশ করা, অপরের কৃতিত্বের ফটোগ্রাফ জাহির করা নয়। অথচ শিক্ষক ছাত্রকে ভাল

ও মন্দ style এর তফাৎ কোথায় তা বুঝিয়ে দিতে বাধ্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতে ভাল style-এর মূল্য সম্বন্ধেও তাকে যথেষ্ট সচেতন করে দেওয়া তাঁর কর্ত্তব্য। কিন্তু ছাত্র যাতে তার নিজস্ব কোনও style বা প্রকাশভঙ্গী খুঁজে বাহির কর্ত্তে সক্ষম হয়, সে বিষয়ে তাকে সাহায্য করাই হচ্ছে তাঁর প্রধান কাজ। শিক্ষকের styleএর কাজ হওয়া উচিত শুধু ছাত্রকে দেখিয়ে দেওয়া যে কি রকম ধরণের style তার আদর্শ হিসেবে নিজের সাম্‌নে সর্ব্বদা ধরে রাখা উচিত। কিন্তু তাই বলে শিক্ষকের নিজের চাল জোর করে তাঁর ছাত্রের গলাধঃকরণ করাবার চেষ্টা কর্লে সেটা সমীচীন হবে না। অবশ্য এ কথা সত্য যে কোনও কোনও ওস্তাদের গাইবার ভঙ্গী এত মনোহর যে, তার হুবহু প্রতিচ্ছবি বজায় রাখ্‌তে পারলে সেটা একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হ'ত। কিন্তু এ কাজ গ্রামোফোনের,—শিল্পীর নয়। কারণ অপরের গাইবার ভঙ্গী নিছক নকল করে আর এক জন কখনও তার সমকক্ষ শিল্পী বলে গণ্য হতে পারে না, তা সে ভঙ্গী যতই সুন্দর হোক্ না কেন! অবশ্য এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, এক জনের গানের ভঙ্গীর অপরের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করা দূষণীয়। এ প্রভাব না পড়াটা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। এটা সম্ভব নয় এই জন্য যে, আমাদের দৈনিক জীবনের ওপর অপরের কথাবার্ত্তা ও কার্য্যকলাপ বড় কম প্রভাব বিস্তার করে না ও এটা সঙ্গীত সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। এবং বাঞ্ছনীয় নয় এই জন্য যে জীবনের নানান্ স্রোত আমাদের চরিত্র গঠনের বড় কম সহায়তা করে না; কাজে কাজেই এ সব স্রোত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্লে তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হবার সম্ভাবনা ষোলআনা। সুতরাং একজনের প্রকাশভঙ্গীর অপরের styleএর ওপর প্রভাব বিস্তার করার মধ্যে দূষ্য কিছুই নেই, যদি সঙ্গীতে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা যায়। তাই নূতন কোনও চালের মধ্যে যদি সত্যকার সৌন্দর্য্য কিছু থাকে, তবে শোন্‌বামাত্র তার দাম দিতে জানা শিক্ষকের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ তাঁর এ সত্যটি কখনই ভোলা উচিত নয় যে, তাঁর কাজ ছাত্রকে তার স্বরূপটি তার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করবার পক্ষে সহায়তা করা। এটা বড় গুরুতর দায়িত্ব এবং এ জন্য শিক্ষকের শুধু সহানুভূতি নয়, কল্পনা ও মনের প্রসারেরও বড় কম দরকার হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের শিক্ষকদের মধ্যে, বিশেষতঃ সঙ্গীতশিক্ষক বা ওস্তাদদের মধ্যে এ দায়িত্বজ্ঞান বড় দেখা যায় না। কিন্তু এরূপ শিক্ষকের অভাব থাক্‌লে আমাদের সঙ্গীতে নিজ নূতন বৈচিত্র্য বা রসের আমদানী হওয়া সম্ভব নয়, এটাও ঠিক্।

অপটু

শ্রীরামেন্দু দত্ত

নিভৃত ভবনে পাঠালে একেলা
কঠিন সাধন তরে,—
এবারে আসিয়ে অপটুর এই
আয়োজনহীন ঘরে।
জানি না কেমনে অর্ঘ্য সাজায়,
তোমার বোধন-বাঁশরী বাজায়,
কি দিয়ে তোমার পূজার সাজিটি
সাজায় ভকতি ভরে।
কোন জ্ঞান মোর হল না আজো যে
কাঁপিতেছি সেই ডরে॥

কত দিন তুমি দেখিয়া আমায়
ব্যস্ত বৃথাই কাজে,
গিয়াছ ফিরিয়া প্রভাতে, প্রদোষে,
নিশীথ-আঁধার মাঝে!
অভাব তোমার বুঝি নাই কভু,
তাই বুঝি আজ জাগাইলে প্রভু!
কঠোর কণ্ঠে, বজ্র-পরশে,
বেদনা—তীব্র করে?

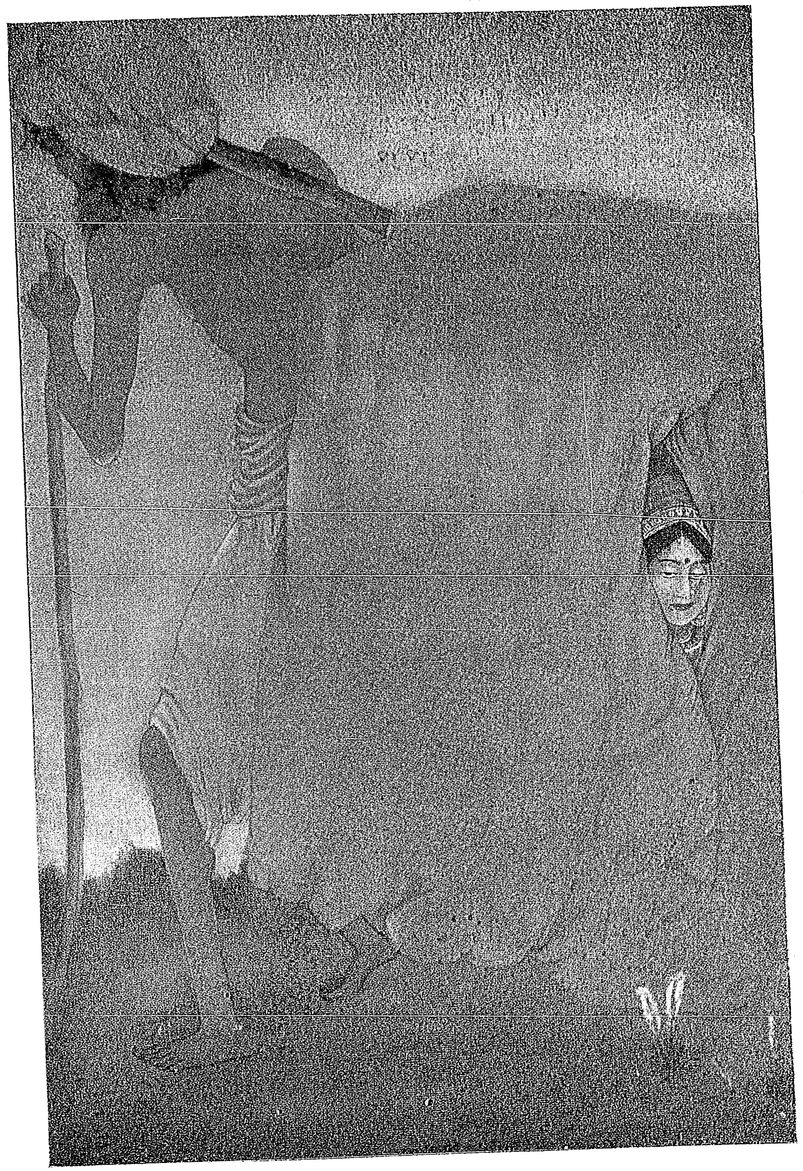

পরদানসিন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

বেগম সমরুর জীবনী *

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা বেগম সমরুর কাহিনীতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তিনি দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় শাহ্ আলমের দেওয়া এক বিস্তীর্ণ জাগীর ভোগ করিতেন। এই জাগীর গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থলে (দোয়াবে) অবস্থিত, এবং আলিগড় হইতে মুজফ্‌ফরনগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বেগম সমরু নামেই জাগীর ভোগ করিতেন; কাজে ছিলেন স্বাধীন সম্রাজ্ঞী—প্রজার দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্রী।

অতি বিচিত্র এই বেগম সমরুর ইতিহাস। তিনি মুসলমান-কন্যা, কিন্তু বিবাহ করিয়াছিলেন একজন জার্ম্মান্ ভাগ্যান্বেষীকে,—নাম তাঁহার ওয়াল্টার রাইন্‌হার্ড, ওরফে সমরু। বেগম যে-সময় ভারতের ভাগ্য-নাট্যশালায় অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, তখন দেশের মহা দুর্দ্দিন। কিন্তু এই বিরোধ ও বিপ্লবের যুগেও মোগল, মারাঠা ও ইংরাজের সহিত স্বাধীনভাবে বিচরণ, এবং নিজ এলাকায় সন্তুষ্ট প্রজাবর্গের মাতৃস্থানীয় হইয়া তিনি সুশাসনের গৌরব লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নারী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ছিল তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম্মপটু সরল প্রাণ—ছিল আপনার প্রতি অটল বিশ্বাস—ছিল ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ—সর্ব্বোপরি ছিল প্রজার মনোরঞ্জন করিবার ইচ্ছা। এই-সব গুণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, একমাত্র ধর্ম্মানুরাগ ও দানের মহিমায় তিনি অমর হইয়া আছেন। ভারতের সর্ব্বত্রই আজিও তাঁহার অতুল কীর্ত্তি রহিয়াছে।

সার্ধানার অধীশ্বরী বেগম সমরুর জীবনের বড় বড় ঘটনা সীমানের *Rambles*, ফ্রাঙ্কলিনের *Shah-Aulum* ও বেগমের পূর্ব্বতন সেনাপতি জর্জ্জ টমাসের জীবনী-পাঠে জানা যায়। ইহা ছাড়া সে-যুগের অনেক ইউরোপীয়—মেজর আর্চার, টমাস্ বেকন্, মেজর থর্ন, কাপ্তেন মান্‌ডী, বিবি ডীন, প্রভৃতি—সার্ধানা পরিভ্রমণ করিয়া, বেগমের সম্বন্ধে কত কি লিখিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী লেখকেরা—র‍্যাট্‌কীন্‌সন্ (*N. W. P. Gaz.* ii), কীগ্যান্ (*Sardhana*), কীন্, বেলী ফ্রেসার (*Mily. Memr. of Lt. Col J Skinner*), প্রভৃতি—বেগমের জীবন-কথা লিখিতে গিয়া প্রধানতঃ উল্লিখিত লেখকদেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

কিন্তু পর্য্যটকদের সব-কথা ইতিহাসের দিক্ দিয়া মূল্যবান্ বলিয়া মনে করা যায় না, কেন না অনেক ঘটনার বিবরণ তাঁহাদিগকে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হয়। তবে যে-সকল ঘটনার তাঁহারা সাক্ষী—যে সকল স্থানের বৃত্তান্ত তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়া লিপিবদ্ধ করেন, তাহা অবশ্যই গ্রহণীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই হিসাবে সার্ধানা-ভ্রমণকারী ইউরোপীয়গণের বর্ণিত বেগমের বেশ-ভূষা আকৃতি-প্রকৃতি, চালচলন, সার্ধানা জাগীরের অর্থ-নৈতিক অবস্থা, ইত্যাদি কথার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

কিন্তু বেগম সমরুর একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিতে হইলে এত অল্পে তুষ্ট হওয়া চলে না; তাহার জন্য দরকার মূল উপকরণগুলি,—যাহা এ-যাবৎ কোন লেখকই ব্যবহার করিতে পারেন নাই।

মোগল, মারাঠা ও ইংরাজ—এই তিন মহাশক্তির সহিতই বেগম বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সুতরাং তাঁহার জীবনীর বেশির ভাগ উপাদান যে ফার্সী, মারাঠী ও ইংরাজী ভাষাতেই থাকিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। গত পাঁচ-ছয় বৎসরের অনুসন্ধানের ফলে আমি যে মূল উপকরণ-সম্ভারের সন্ধান পাইয়াছি, এই প্রবন্ধে তাহারই একটু আভাষ দিব। *

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে-সমস্ত নবাবিষ্কৃত উপাদানের কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে রচিত, লেখকের 'বেগম সমরু' (২য় সংস্করণ) সম্প্রতি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের ॥০ সংস্করণ

* গত জানুয়ারী মাসে, Indian Historical Records Commission-এর মাদ্রাজ-অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

ইংরাজী

(১) ইম্পিরিয়াল্ রেকর্ডস্ ঃ—সরকারের অনুমতি পাইয়া, আমি ভারত-গভর্মেণ্টের দপ্তর-খানায় অনুসন্ধান-কার্য্য আরম্ভ করি। তাহার ফলে, ১৮০০ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত বেগম সমরু সংক্রান্ত অন্ততঃ এক-শত দলিল-দস্তাবেজের সন্ধান মিলিয়াছে। এগুলির সাহায্যে বেগমের জাগীর, ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি, সৈন্য-বল, বার্ষিক রাজস্ব, জলকর ও স্থলকরের পরিমাণ, দান-ধ্যানের কথা, বেগমের বেতনভোগী আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও পুরাতন কর্ম্মচারীদের নাম, বৃত্তির পরিমাণ, প্রভৃতি বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা করা যায়। এই সকল উপকরণ হস্তগত হওয়ায় বেগম সমরুর শেষ জীবনের সঠিক ইতিহাস জানা সম্ভবপর হইয়াছে।

পঞ্জাব সেক্রেটারিয়েট রেকর্ডস্ ঃ—নানাস্থানে অনুসন্ধানের পর শেষে পঞ্জাবের সরকারী দপ্তরখানায় বেগমের ইংরাজী উইলের একখানি 'নকলের' সন্ধান পাইয়াছি। উইল যে মূল্যবান্ দলিল তাহার সন্দেহ নাই, কারণ বেগমের অগাধ বিষয়-সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা যে কিরূপে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। বেগমের দান-পত্রে (deed-of-gift) প্রকাশ, যে, মূল ইংরাজী উইলের সঙ্গে আরও চারখানি "উইল" একত্র রাখা হইয়াছিল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমি সেগুলির সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই।

বেগম এবং কোম্পানীর মধ্যে পত্র-ব্যবহার প্রধানতঃ দিল্লীতে অবস্থিত রেসিডেণ্টের হাত দিয়াই হইত। এই-সকল চিঠিপত্রের নকল দিল্লী রেসিডেন্সিতে থাকিত। সিপাই-বিদ্রোহের পর রেসিডেন্সির দপ্তর পঞ্জাবে স্থানান্তরিত হয়। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, রীতিমত অনুসন্ধান করিতে পারিলে পঞ্জাবের দপ্তরখানা হইতে বেগম সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ কাগজপত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে।

(৩) *Refutation* :—এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের লেখক—বেগম সমরুর পালিত-পুত্র ও উত্তরাধিকারী, ডাইস্ সোম্বার। বেগমের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তিনি বিলাত গিয়া, বড় ঘরের এক ইংরাজ-মহিলাকে বিবাহ করেন। কিন্তু এই বিবাহ তাঁহার জীবনে সুখের কারণ না হইয়া পরম দুঃখের—সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। 'দশচক্রে ভগবান ভূত'—আর দশচক্রে ডাইস সোম্বারকে পাগল প্রতিপন্ন করিয়াছিল। সুতরাং দশচক্রে না করিতে পারে, এমন অনর্থ জগতে আর কিছুই নাই। যাহা হউক ডাইস্ পাগল সাব্যস্ত হইলেও একদিন গোপনে প্যারিসে সরিয়া পড়েন, এবং সেখানে বসিয়া, ১৮৪৯ আগষ্ট মাসে, ৫৮২ পৃষ্ঠাব্যাপী এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া জগতের হাটে আপনার সুস্থ মস্তিষ্কের প্রমাণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বেগম সমরুর জীবনী-লেখকের নিকট *Refutation* গ্রন্থখানি অমূল্য। ইহাতে বেগমের উইলের শেষাংশ, দান-পত্র, কোম্পানীর সহিত সন্ধিপত্র, ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তির তালিকা, প্রভৃতি অতি দরকারী কাগজপত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এ ছাড়া গ্রন্থখানিতে কোম্পানী, বেগম সমরু, এবং ডাইস্ সোম্বারের এমন-সব প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা আমি ভারত-গভর্মেণ্টের দপ্তরখানাতেও দেখিতে পাই নাই।

গ্রন্থের ৩৩৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ডাইস্ সোম্বার লিখিয়াছেন,—"বেগম সমরুর একখানি জীবন-চরিত প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় আমি কিছু কিছু তথ্য লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—বিশেষ যত্নসহকারেই উপাদানগুলি আমাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, অন্য কাগজপত্রের সঙ্গে সেগুলিও আমার কাছ হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।" খুব সম্ভব, ডাইস্ সোম্বারের লেখা 'ডায়েরীর এই খোলা পাতাগুলি' বিলাতের কোথাও সযত্নে রক্ষিত আছে। এগুলি কোনদিন আবিষ্কৃত হইলে বেগমের জীবনের অনেক দরকারী কথা বাহির হইয়া পড়িবে, সন্দেহ নাই।

মারাঠী

(১) দিল্লী য়েথীল মরাঠ্যাঁচী রাজকারণেঁ—হিঙ্গ্নে-প্রমুখ পেশ্বাগণের দূতেরা দিল্লীতে স্থায়িভাবে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা দিল্লী হইতে নিজ প্রভুদের কাছে

গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে যাহা লিখিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

পুনায় যে-সব চিঠিপত্র লিখিতেন, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া রাও বাহাদুর দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনিস্ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সাময়িক সংবাদপূর্ণ পত্রগুলি সে-যুগের উত্তর-ভারতের ইতিহাস-রচনার পক্ষে অমূল্য উপকরণ। মারাঠা-শক্তিই তখন হিন্দুস্থানে প্রবল, সুতরাং সমসাময়িক মারাঠী-কাগজপত্রের মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই-সকল মারাঠী-পত্র হইতে জানা যায়,—কেন বেগমের সেনাপতি জর্জ্জ টমাস্ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন; কেমন করিয়া বেগম 'খৎ' লিখিয়া দিয়া ব্রিটিশ-[illegible]ীয় কর্ণেল ষ্টুয়ার্টকে দুর্দ্দান্ত শিখদের কবল হইতে মুক্তি দেন। এছাড়া আরও এমন-সব কথা জানা যায়, যাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বেগম সমরুর হাতে ক্ষমতার আর অন্ত ছিল না, তাই বিপদে পড়িলে সকলকেই তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইত।

ফার্সী

(১) ইব্রতনামা—(অধ্যাপক সরকারের ফার্সী পুঁথি) ঃ—গ্রন্থকার—ফকীর খয়ের-উদ্দীন্ মুহম্মদ—বেগম সমরুর সমসাময়িক। তিনি বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের পুত্র—শাহ্জাদা জুয়ান্-বখ্তের মন্ত্রী ও নিত্যসহচর; পুঁথিতে বর্ণিত অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ইব্রৎনামার মূল্য কতটা, সে-সম্বন্ধে ডেনিসন্ রস (*J. R. A. S.* 1902, pp. 136-41) আলোচনা করিয়াছেন।

ইব্রৎনামার সাহায্যে বেগমের জীবনের অনেকগুলি ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। বাদশাহ্কে মারাঠাদের কবলমুক্ত করিবার জন্য শাহ্জাদা জুয়ান্-বখ্ৎ যখন কৃত-সঙ্কল্প, তখন ইব্রৎনামার গ্রন্থকার খয়ের-উদ্দীন্ কুমারের প্রতিনিধিরূপে সর্ব্বাগ্রে বেগম সমরুর শরণাপন্ন হইলে বেগমও শাহ্জাদাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন।—সাহরাণপুরের বিদ্রোহী রোহিলা-সর্দ্দার গোলাম কাদির বাদশাহ্কে অসহায় অবস্থায় পাইয়া রাজধানী দিল্লীর বুকে চাপিয়া বসিলে (১৭৮৭), বেগম সমরুই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহীকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।—বাদশাহী ফৌজ যখন বিদ্রোহী নজফ্ কুলীর গোকুলগড় (রাজপুতানায়) অবরোধে ব্যস্ত, সেই সময় একদিন ভোর-রাত্রে শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে মোগল-বাহিনী বিপর্য্যস্ত হইয়া পলায়নপর হয়। বাদশাহ্ তখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। সেই দারুণ দুঃসময়ে রণরঙ্গিণী বেগম সমরু সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া বিপন্ন বাদশাহ্ ও তাঁহার পরিবার-বর্গকে রক্ষা করেন—শত্রুকে সমুচিত শিক্ষা দিয়া নিমকের মান অক্ষুণ্ণ রাখেন। এই সমস্ত ব্যাপার ইব্রৎনামায় বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) ওয়াকিয়া-ই-শাহ্ আলম্ সানি (অধ্যাপক সরকারের ফার্সী পুঁথি) ঃ—ইহা দৈনিক ঘটনার একখানি ডায়েরী। পুঁথির অনেকগুলি পাতা নাই; কিন্তু যাহা আছে, তাহার সাহায্যে ১৭৩৯ হইতে ১৭৯৯, অর্থাৎ নাদির শাহ্র দিল্লী-লুণ্ঠন হইতে প্রায় লর্ড লেকের দিল্লী-প্রবেশ পর্য্যন্ত সময়ের তারিখ সহ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। স্থানীয় লোক বলিয়া লেখক দিল্লীতে সংঘটিত অনেক সমসাময়িক ঘটনা ও জনরবের কথা বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার এই ডায়েরীর সাহায্যে বেগমের জীবনের অনেক ছোটখাট ব্যাপারের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) পদ্যে লেখা বেগমের একখানি ফার্সী জীবন-চরিত বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে। (Dr. Rieu's *B. M. Cat. of Persian Mss.* ii. 724*a*. Add. 25830). ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বেগমের খাস্-মুন্সী—লালা গোকুলচাঁদ রচনা করেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—'মুন্সী জয়সিং রায়ের গদ্যে লেখা বেগমের জীবনীখানি হারাইয়া যাওয়ায়, এই পুঁথিখানি লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছে।' Rotary Process-এর সাহায্যে আমি গোকুলচাঁদের পুঁথির প্রথম চারি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি আনাইয়া বিশেষ কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাই নাই, কিন্তু বাকি অংশ না পাওয়া পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত কোন কিছু বলা চলে না।

পুঁথিখানির প্রথম দুই পৃষ্ঠার উপর বেগমের উত্তরাধিকারীর সহি—"D. O. Dyce." পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেগমের জীবনী লিখিবার উদ্দেশ্যে ডাইস্ সোম্বার ডায়েরীর কতকগুলি খোলা পাতায়, সযত্নে সংগৃহীত অনেক তথ্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। খুব সম্ভব, এই একই উদ্দেশ্যে গোকুলচাঁদের পুঁথিও সংগৃহীত হয়। পুঁথিখানি শেষে ব্রিটিশ মিউজিয়মে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ডায়েরীর পাতাগুলির সন্ধান মিলিতেছে না।

বেগম সমরু ভারতের ভাগ্য-নাট্যশালায় উল্লেখযোগ্য

ভূমিকার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন;—তাঁহার জীবনী ইতিহাসের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়। কেহ কিছু নূতন উপকরণ দিয়া আমাকে সাহায্য করিলে সেই বিস্মৃত-প্রায় ইতিহাসের পুনরুদ্ধারেরই সহায়তা করা হইবে, সন্দেহ নাই। *

* এই কয়েকখানি পুস্তকের এখনও সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। এগুলির সন্ধান হইলে বেগম সমরু বা তাঁহার উত্তরাধিকারী—ডাইস্ সোম্বার সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য জানা যাইতে পারে। পাঠকদের মধ্যে যদি কাহারও নিকট এই পুস্তকগুলি থাকে, দয়া করিয়া জানাইলে বাধিত হইব:—

(1) *A tour through the Upper Provinces of Hindustan between the years of 1804 and 1814*, by A.D. [Mrs. A. Deane]. London 1823.

(2) *The Heirs of Dyce Sombre V. the Indian Government.* The History of a suit during thirty years between a private individual and the Government of India. Westminster, 1865. 8°.

(3) In the Prerogative Court of Canterbury. Dyce Sombre against Troup, Solaroli intervening, and Prinsep, and the Hon. East India Company, also intervening. In the goods of D. O. Dyce Sombre,...deceased. Scripts—pleadings—answers—interrogatories—minutes—and exhibits. (Deposition of witnesses). 2 vols. 8° [Privately printed :] London [1855 ?]

(4) *Reports of Revenue Settlement*, N.-W.P. vol i.

বাঁধন-হারা

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী বি-এ

১

বক্ষে জাগিছে বক্ষের ব্যথা,
চক্ষে ঝরিছে বারি;
মর্ম্মের রুদ্ধ কত কি যে কথা,
সঞ্চিত সারি-সারি।

২

ক্রন্দন গেছে মূর্চ্ছনা করে,
উচ্ছ্বাস-সাথে দ্বন্দ্ব;
বৃন্ত-কুসুম সন্ধ্যায় ঝরে,
জাগ্রত থাকে গন্ধ।

৩

মন্থর-পদে কত না বর্ষ,
অনন্তে হল লীন।
বাহিরের যত মিথ্যা হর্ষ,
সান্ত্বনা আনে ক্ষীণ।

৪

দ্বাদশ-বর্ষ ভগ্ন এ ঘরে
সিঞ্চিল সে যে মধু;
আধ-অন্তর অপূর্ণ করে
চক্ষু মুদিল বধূ।

৫

শূন্য এ ঘর, শূন্য যে সবি,
রিক্ত হৃদয় আজি;
তপ্ত হৃদয়ে, পূর্ণ সে ছবি
উজ্জ্বলে আছে সাজি।

৬

স্তব্ধ নিশীথে স্নিগ্ধ পবনে,
সঙ্গীত আসে কত;
উল্লাস যত ম্লান ভবনে,
শান্ত জনম-মত।

৭

মৃত্যু আসিয়া করেছে মুক্ত;
অন্তরে হাহাকার;
বিচ্ছেদ-মাঝে হয়েছি যুক্ত,
বন্ধনে একাকার।

৮

স্বর্ণলতায় ধরিয়া বক্ষে,
ধরিত্রী আজ ধন্যা;
দগ্ধ হৃদয় কাঁদে অলক্ষ্যে
লুপ্ত আলোক-বন্যা॥

ক্ষেত্র-কর্ষণ

বরণীয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি এক দিন ভারত-সাম্রাজ্য-ভুক্ত ছিল। আজ এই দ্বীপগুলি ওলান্দাজদের অধীন। অধীন হ'লেও এই সব দ্বীপের অধিবাসীরা একেবারে পদ-দলিত নয়। বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় ও সওদাগর-শ্রেণী তাদের মোটেই ঘৃণা করে না; সুখের পায়রার মতো দু'দিনের জন্য সেখানে এসে মধু সঞ্চয় ক'রে তার পর যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে দেশে পালিয়ে যায় না, তাদের এই ওলান্দাজ প্রভুরা! তারা সে দেশকেই তাদের স্বদেশ ক'রে নেয়। সেই খানেই জায়গা জমি কিনে ঘর বাড়ী তৈরী ক'রে পুরুষানুক্রমে বসবাস করে। যে সব ওলান্দাজ পুরুষেরা সুমাত্রার সুন্দরী বা যবদ্বীপের যাবনী-বালাকে বিবাহ করে, সেখানকার য়ুরোপীয় সমাজ তাকে এক ঘ'রে ক'রে জাতে ঠেলে রাখে না। সেই ওলান্দাজের যাবনী স্ত্রীকে সসম্মানে তাদের সমাজের মধ্যে গ্রহণ করে। ওলান্দাজদের

সুমাত্রার সুসজ্জিত একটি কিশোর বালক

ভিতর যারা ধনী বা অবস্থাপন্ন পরিবার, তারা তাদের ছেলে মেয়েদের বিদ্যা-শিক্ষার উৎকর্ষতার জন্য হল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেয় বটে, কিন্তু লেখা পড়া শেষ ক'রেই তারা আবার ফিরে আসে তাদের সেই নব মাতৃভূমি দ্বীপালীর স্নেহাঞ্চলের মধ্যে! এমনি ক'রে ওলান্দাজরা সেখানে রাজত্ব ক'রছে, তাদেরই ঘরের লোক হ'য়ে তাদেরই আপনার জনের মতো সস্নেহ অনুরাগের বাঁধনে বেঁধে।

পূর্ব্ব ভারতের এই দ্বীপালীগুলির প্রধান সহর হ'চ্ছে বাতবীয়, শ্যামরঙ্গ, ও শূরাভয়া। এ তিনটিই যবদ্বীপের সহর; কারণ যবদ্বীপই হ'চ্ছে এ অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-ভূমি। প্রচুর পরিমাণে চাউল, চিনি ও রবার উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর মধ্যে এই দ্বীপালীর একটা খ্যাতি আছে। দীর্ঘ-প্রশস্ত উৎকৃষ্ট রাজপথ এবং বহুবিস্তৃত রেলপথের জন্যও এতদ্দেশ একটা প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছে। তিন হাজার

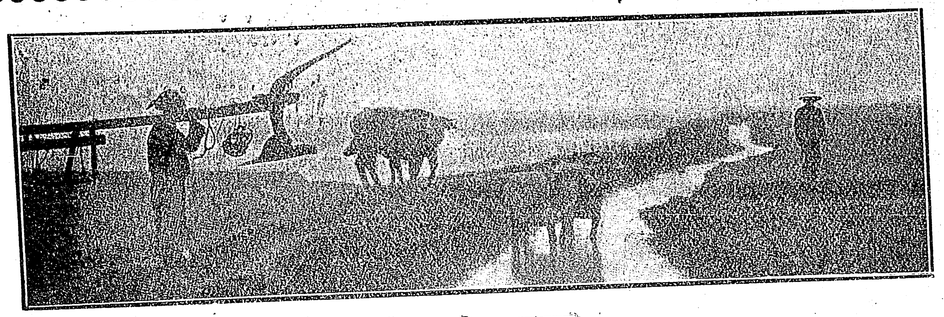

যবদ্বীপের একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী

দু'শ বাহাত্তর মাইল ব্যবধানের মধ্যে দু'হাজার ছ'শ বাষট্টি মাইল রেল-পথের সাহায্যে যাতায়াত ক'রতে পারা যায়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময় সম্পদে যবদ্বীপ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। অসংখ্য হ্রদ তড়াগ ও নদ নদীর সমাবেশে এ প্রদেশ সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা; কিন্তু নদনদীগুলি এতই সঙ্কীর্ণ ও বেগবতী যে নৌ-

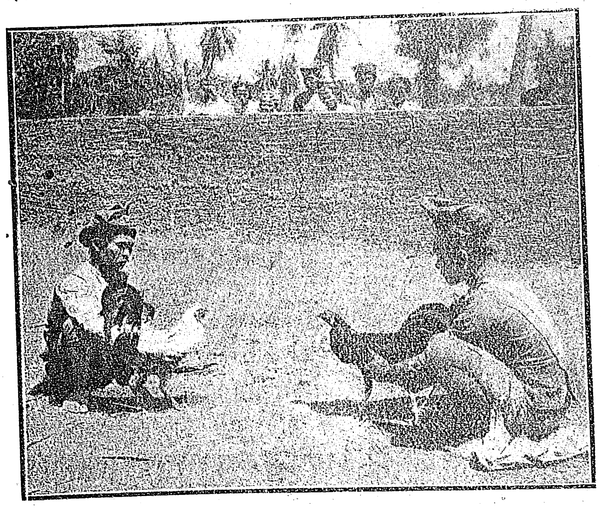

মুগীর লড়াইয়ের দর্শকেরা

চলাচলের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়। একটি সুদীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী যা ব্রহ্মদেশে থেকে সুরু হ'য়ে একেবারে মালাক্কা পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, তারই শাখা-প্রশাখায় এই দ্বীপালী পর্ব্বতসঙ্কুল। এর মধ্যে প্রায় একশ' পঁচিশটি আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব জানতে পারা গেছে। এই দ্বীপালীর আবহাওয়াও অতি চমৎকার। পঁচাত্তর থেকে আশী ডিগ্রীর মধ্যে সে দেশের আবহাওয়ার মাত্রা ওঠা নামা করে, সুতরাং য়ুরোপীয়দের পক্ষে এখানে বসবাস করাটা খুবই সহজ হ'য়ে উঠেছে। পূর্ব্বোক্ত তিনটি সহরের লোক সংখ্যা হ'চ্ছে যথাক্রমে একলক্ষ বিশহাজার, একলক্ষ ও একলক্ষের কিছু কম। সহরের খুচরো কারবার সমস্তই প্রায় চীনেদের হাতে।

যবদ্বীপে প্রাচীন হিন্দু ও পরে বৌদ্ধ সভ্যতার সবিশেষ বিস্তারলাভ ঘটেছিল। এখনও সে দ্বীপের মধ্যস্থলে যে বিরাট "বড় বুদ্ধের" মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে

মাদুরা দ্বীপের সুন্দরী

মুগীর লড়াইয়ের খেলোয়াড়রা

পাওয়া যায়—তা অপূর্ব্ব! খৃঃ নবম শতাব্দীতে এই মন্দির নির্ম্মিত হ'য়েছিল ব'লে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন।

রবার গাছে অস্ত্রোপচার।
(আটা সংগ্রহ করবার জন্য বৃক্ষ-কাণ্ড ক্ষত করে দিতে হয়)

সুগন্ধ-পত্র চয়ন।

১৪৭৫ খৃঃঅব্দে যখন মুসলমান আক্রমণে এই দ্বীপ বিধ্বস্ত হয়েছিল, সেই সময় থেকে এ দেশের প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-পূজা-পদ্ধতি লোপ পায়। "বড় বুদ্ধের" মন্দির একটি

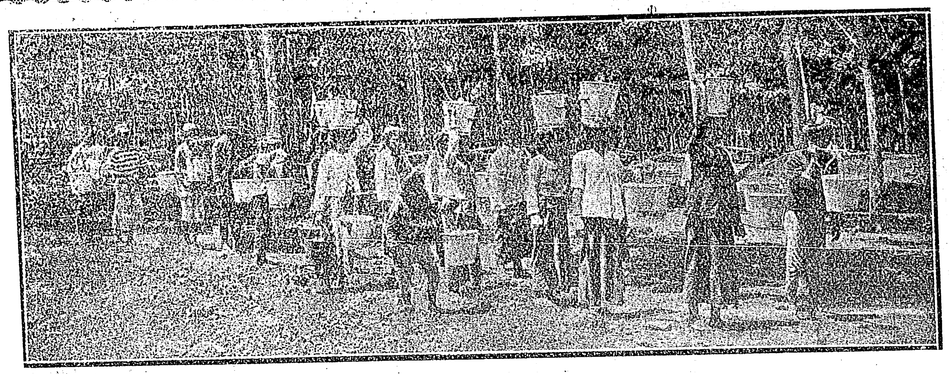

রবারের আটা সংগ্রহ (রবারের কারবারের জন্য যবদ্বীপের প্রসিদ্ধি আছে)

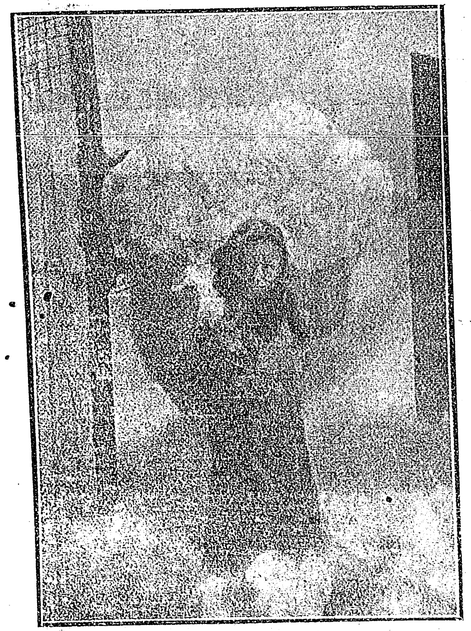

তূলা সংগ্রহ

প্রকাণ্ড গিরিদেউল। এ মন্দির ভিত্তি-মূল থেকে গেঁথে তৈরি হয়নি। দেড়শত ফিট উচ্চ একটি পর্ব্বতকে শিল্পীর তক্ষণ-যন্ত্র দীর্ঘকাল ধ'রে অসীম অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের সঙ্গে খোদাই ক'রে এক অপরূপ সুন্দর মন্দিরে রূপান্তরিত ক'রে-ছিল। এই মন্দিরের সর্ব্ব নিম্নতলস্থ চৌকা ছাদের দৈর্ঘ্যই হ'চ্ছে পাঁচশ কুড়ি ফিট। এই মন্দির জগতের এক বিস্ময়ের সামগ্রী। ভারতের এক অতীত যুগের গৌরবময় ইতিহাস এই মন্দিরের প্রত্যেক কারুকার্য্যের সঙ্গে বিজড়িত। কি বিরাট কল্পনা, কি অসীম অধ্যবসায়, কি বিচিত্র শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় নিয়ে এই গগনস্পর্শী

বালীদ্বীপের সুন্দরী

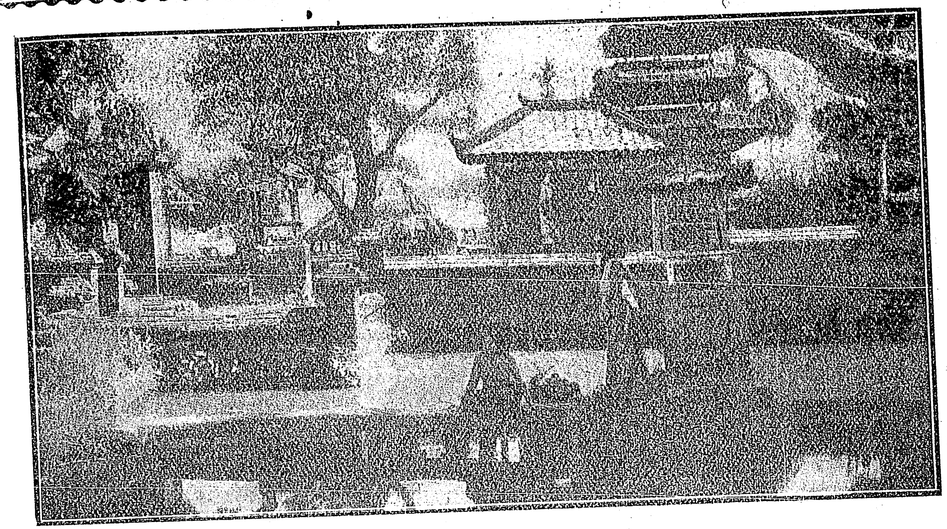

বালীর একটী মন্দির-প্রাঙ্গণ

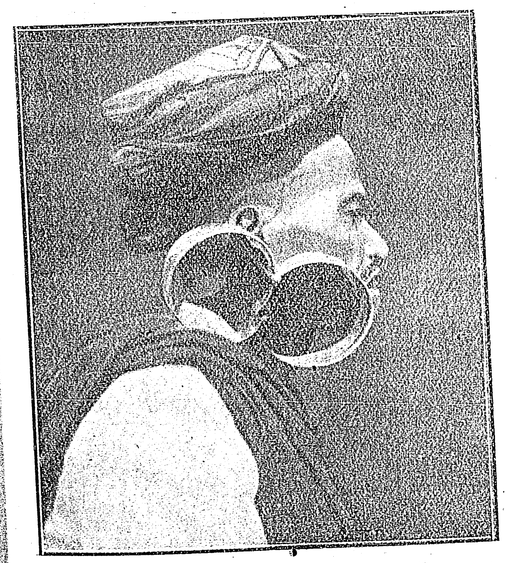

সুমাত্রার আদিম অধিবাসীর কর্ণাভরণ

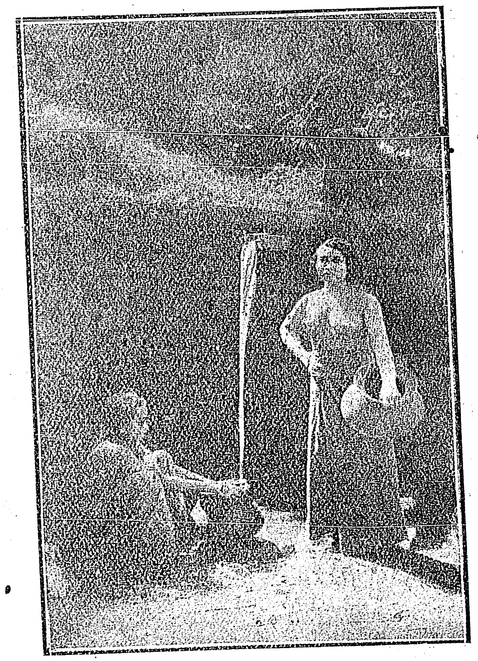

বালীর গরীবের মেয়েরা জল নিতে এসেছে

সুমাত্রার জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা ও তাঁর সখীর দল

যবদ্বীপের চাষার মেয়ে

বালীদ্বীপের নর্ত্তকী বালিকা

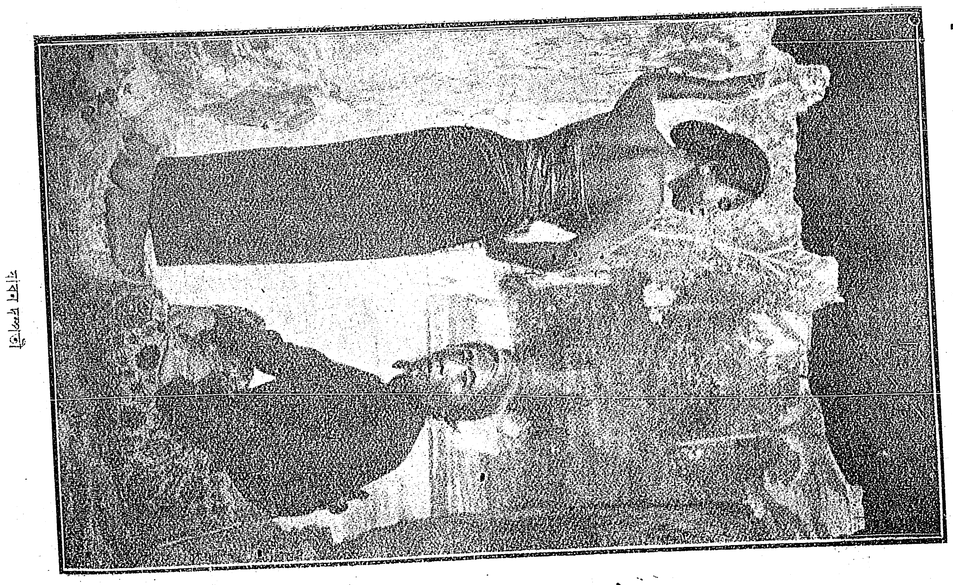

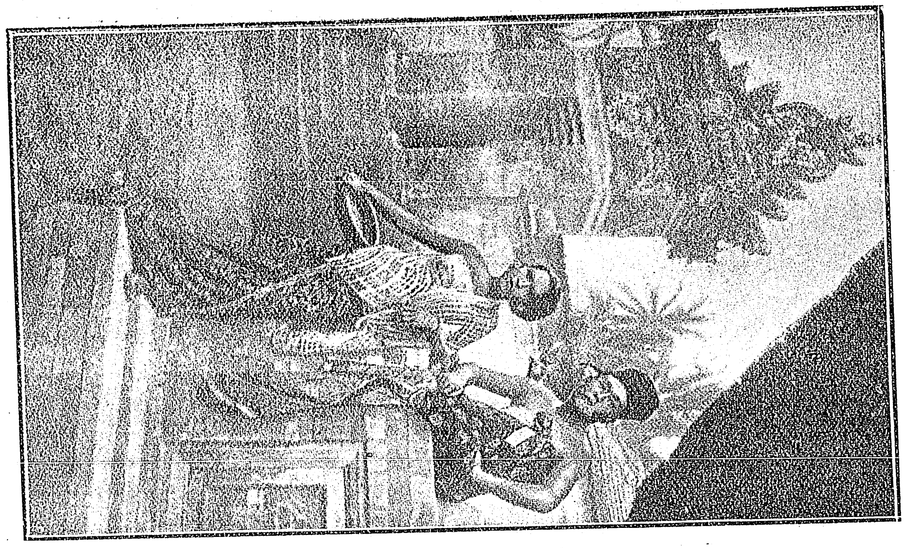

বালীর দম্পতী

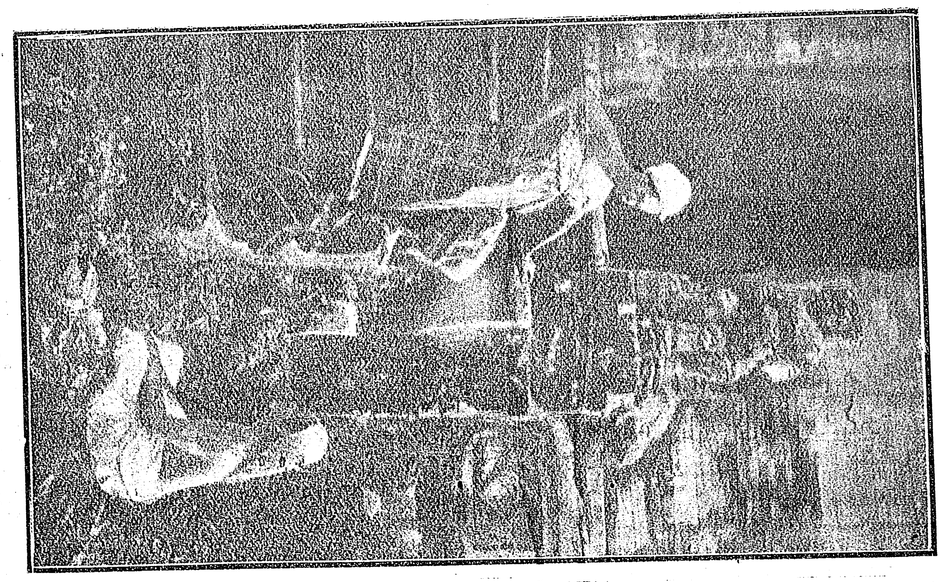

বালীর কুঞ্জকাননে দুই বন্ধুর বিশ্রামালাপ

কড়াইসুঁটী বাছাই (যবদ্বীপ থেকে পৃথিবীর নানা দেশে কড়াইসুঁটী চালান হয়)

পূর্ব্ব-যবদ্বীপের সুন্দরী

বিপুল বিস্তৃত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও পর্য্যন্ত যবদ্বীপকে সৌন্দর্য্য-উপাসকের তীর্থ-ভূমি ক'রে রেখেছে ! প্রেমবনান ও তুম্পাঙ প্রভৃতি যবদ্বীপের অন্যান্য অংশেও হিন্দু-বৌদ্ধ স্থাপত্য-শিল্পের বহু ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

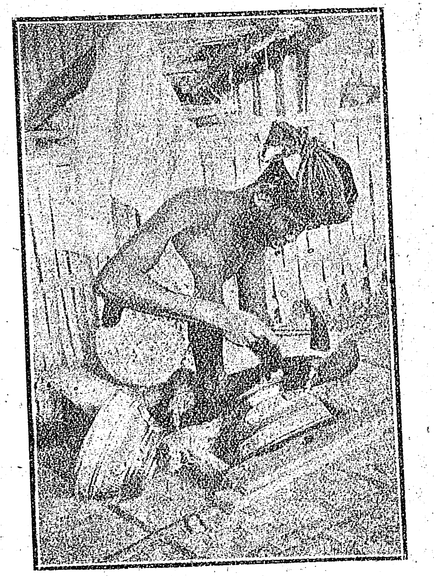

পিতলের উপর কারুকার্য্য (যবদ্বীপের কারিগর)

পূর্ব্বভারতের দ্বীপালীগুলির অধিবাসীরা অধিকাংশই যবদ্বীপের লোক। মধ্য ও পূর্ব্ব-প্রদেশে যবদ্বীপের ভাষাই প্রচলিত। কেবল পশ্চিমাঞ্চলে সুন্দানী ও মাদুরার দিকে

মাদুরীয় ভাষার চলন আছে। যবদ্বীপের অধিবাসীরা যদিও মালয় জাতীরই শাখা সম্ভূত, কিন্তু পরে অন্যান্য বহু জাতির সংমিশ্রণে তাদের মধ্যে একাধিক সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। সর্ব্বপ্রথম চীনেদের সঙ্গে যবদ্বীপের অধিবাসীদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল ব'লে জানতে পারা যায়। সুমাত্রায় ও বালী দ্বীপে হিন্দু-প্রভাব স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। সুমাত্রার

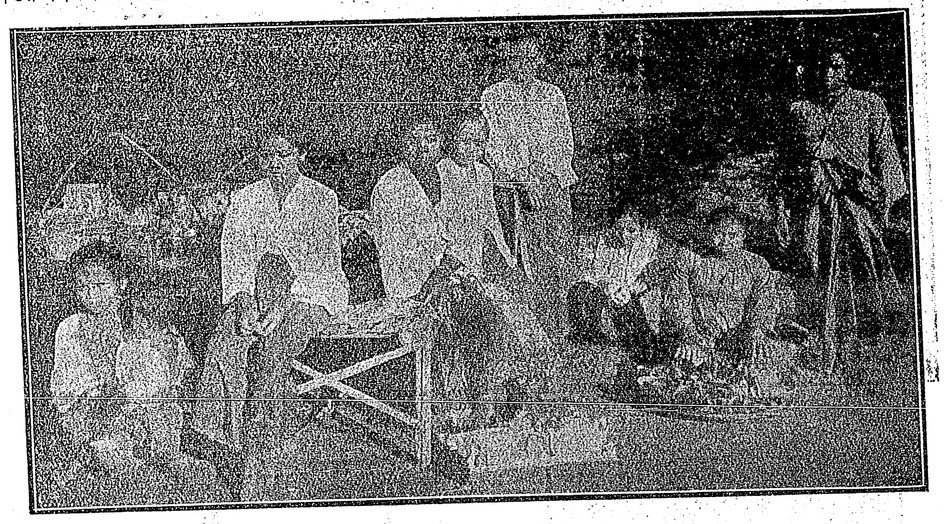

খুরাভয়ার খাবারওয়ালীরা

তৈরী ভাতের ফেরিওয়ালা
যবদ্বীপে ফেরীওয়ালাদের কাছে গরম ডাল ভাত তৈরি কিনতে পাওয়া যায়।

পার্শ্ববর্ত্তী মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণে ও তন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জে আরব মুসলমানগণের শোণিত-চিহ্ন উজ্জ্বল ভাবে বিদ্যমান। পাপুঁয়া, নিগ্রো প্রভৃতি বর্ব্বর আদিম অধিবাসীদের বংশাবলীও সেখানে অনেক অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। যবদ্বীপের অধিবাসীদের বেশ সুশ্রী—সুন্দর—সৌম্য—আকৃতি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা অধিকাংশই অলস, বিলাসী ও দুর্ব্বল চরিত্রের মানুষ; কিন্তু নিম্নস্তরের অধিবাসীরা ধীর, শান্ত প্রকৃতির লোক, তারা কঠোর পরিশ্রমী ও কৃষিকার্য্যে সুনিপুণ চাষী। তবে রাজকর্ম্মচারী হবার একটা দাস-মনোভাব তাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। রাজকর্ম্মচারীর জমকাল পোষাক প'রে অন্যের উপর

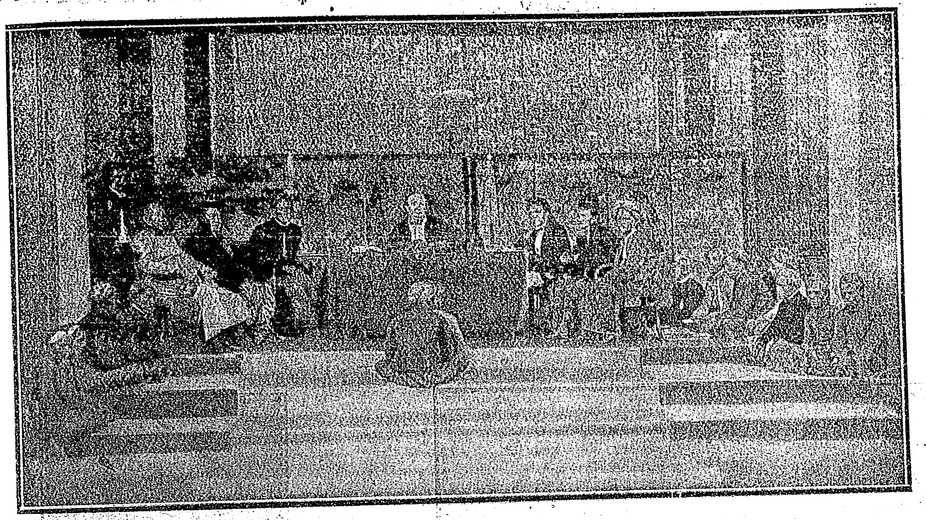

জোক্‌জোকর্ত্তার বিচারালয়

যবদ্বীপের স্থানীয় অধিবাসী।

কর্ত্তৃত্ব ক'রতে তারা খুবই ভালবাসে। রাজপুরুষের অধীনে একজন পদস্থ কর্ম্মচারী হওয়া তাদের জীবনের একটা মস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ব'ললেও চলে। যবদ্বীপের অধিবাসীরা কার্পণ্য কাকে বলে জানে না এবং মিতব্যয়িতা তাদের গুণের মধ্যে স্থান পায় নি। তারা সকলেই অমিতব্যয়ী, যে যা উপার্জ্জন করে নিঃশেষে তা ব্যয় ক'রে ফেলে, সঞ্চয় শব্দটা তাদের জীবন-অভিধানের পৃষ্ঠা থেকে মুছে ফেলেছে। যে কোনও তুচ্ছ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তারা এমন দিলদরিয়ার মতো খরচ ক'রে যে, নিজের পুঁজিপাটা ভাসিয়ে দিয়েও উপরন্তু ঋণগ্রস্ত হয়ে প'ড়ে। বিবাহ উৎসবের কথা ত' ছেড়েই দাও,—যদি পরিবারের কেউ কঠিন রোগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠে, যদি ক্ষেতের ফসল কোন বার আশাতীত রকম ফলে, যদি বংশের কেউ একটা উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদ পায়, তাহ'লেই অমনি তারা বাড়ীতে একটা বিরাট ভোজের আয়োজন করে। এই ভোজ উপলক্ষে নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুতুলনাচ প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ ও রংতামাসায় তারা একেবারে মেতে ওঠে। পুতুলনাচ তাদের একটা

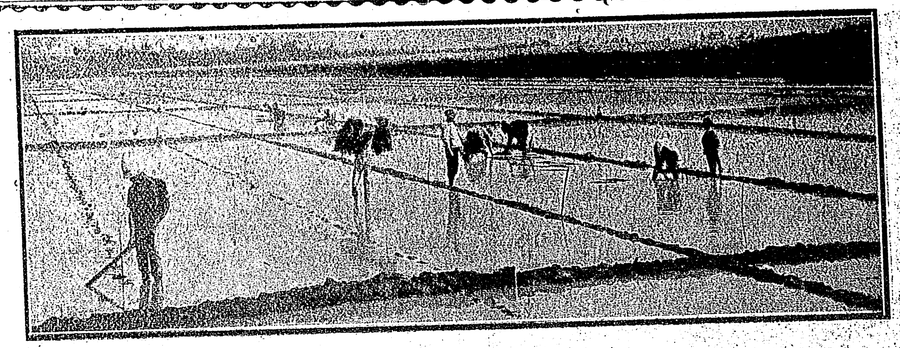

বীজ বপন

পূর্ব্ব যবদ্বীপের নিরাভরণ সৌন্দর্য্য

পশ্চিম যবদ্বীপের সুন্দরী।

প্রধান আমোদ। স্বরদ, বীণা, রবাব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রই তারা এখনও বাজায়। রঙ্গাভিনয়ও তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে; তবে সে এদেশী নাট্যাভিনয়ের অনুরূপ নয়। সেখানে কবি তাঁর নাটক আবৃত্তি ক'রে যান, আর মুখোস-পরা সুসজ্জিত অভিনেতৃ-সম্প্রদায় বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁদের ভূমিকা অভিনয় ক'রে যান।

সেখানকার সম্ভ্রান্ত ধনী সম্প্রদায়ের লোকেরা যে অলস ও বিলাসী সে কথা পূর্ব্বেই ব'লেছি। তারা জরির কাজ করা ঝক্‌মকে ও রেশমী পোষাক প'রে বেড়াতে ভালবাসে,

হীরে জহরত ও মণিমুক্তার অলঙ্কার ব্যবহার করা তাদের মধ্যে খুব প্রচলিত। নানা কারু কার্য্য-খচিত সুন্দর বাড়ীতে তারা বাস করে। পথে যাবার সময় একজন অনুচর তাদের মাথার উপর নানা কারু-

যবদ্বীপের পল্লীবাসিনীরা

ককি চয়ন

যবদ্বীপের মুখোস-পরা অভিনেতারা

কার্য্য বিশিষ্ট রেশমী ঝালর সংযুক্ত সোণালী শোভাছত্র ধারণ ক'রে চলে। তারা এই সব রাজারাজড়ার চাল ভারি পছন্দ করে। তাদের মধ্যে যারা একটু অবস্থাপন্ন লোক তারা প্রায়ই তিন মহল বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়ে বাস করে। একটী মহল হ'চ্ছে তোষাখানা, একটি মহল হ'চ্ছে অতিথি অভ্যাগতদের অবস্থানের জন্য, এবং একটী মহল হ'চ্ছে নিজের অন্তঃপুর। যারা সাধারণ গৃহস্থ তারা দু'মহল বাড়ীতেই থাকে,—তাদের তোষাখানা ও অতিথি-নিবাস একমহলেই এবং অন্তঃপুর অপর মহলে। দরিদ্রেরা বাঁশ খুঁটির নির্ম্মিত এবং আতপত্র বা তৃণাচ্ছাদিত পর্ণকুটীরে বাস করে।

বাঙ্গালীর বীরপুরুষ

চাষাভূষো শ্রেণীর লোকেরা ভিতরে একটা ক'রে জাঙিয়া পরে, তার উপর লুঙ্গি ব্যবহার করে। গায়ে সাধারণতঃ একটা হাত-কাটা ও গলা-খোলা জামা পরে। তাদের লম্বা চুল তারা মাথার উপর চূড়ো ক'রে বেঁধে রাখে। একখানা রঙীন রেশমী রুমাল তারা (অক্ষম হ'লে সুতলী তিনিসও ব্যবহার করে) মাথায় বেঁধে তাদের শির-সজ্জার অভাব মেটায়। প্রখর রৌদ্রে বা বৃষ্টিতে ঘরের বাহিরে যাবার প্রয়োজন হ'লে তারা তালপাতা, বাঁশের চিয়াড়ী বা খড়ের তৈরি ছোট ছোট 'টোকা' মাথায় দিয়ে যায়। তাদের কোমরে পান দোক্তা ও চুরুটের একটী ক'রে 'বেটুয়া' বাঁধা থাকে। অন্দরে কিন্তু তারা এত পোষাক প'রে থাকে না, কেবলমাত্র একখণ্ড উত্তরীয় বস্ত্র বুকের উপর গেঁট বেঁধে এঁটে রাখে।

যবদ্বীপের সহরে মেয়ে ছেলেরা অনেকেই আজ কাল য়ুরোপীয় পোষাক পরতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু মফঃস্বলের মেয়েরা এখনও ওটা গ্রহণ করেনি, মধ্যপ্রদেশের মেয়েরা যে কামিজ পরে তার বুক খোলা থাকে না। কটিতে তারা এমনতর বাগরা পরে যা মাটিতে লুটিয়ে যায়, এবং ওড়নাখানি চাদরের মতো ভাঁজ ক'রে—পুরুষের ন্যায় কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখে। তারা বেণী রচনা করে না, এলোচুলেরই আঁটসাঁট খোঁপা বাঁধে, এবং তাতে বাহারি কাঁটা গুঁজে অথবা ফুলকলি দিয়ে সাজিয়ে রাখতে ভালবাসে। কাণে তারা বড় বড় ইয়ারিং ঝুলিয়ে রাখে—এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে অঙ্গুরীয়ক ও সুবর্ণ বাহুবলয় ব্যবহার করে। ছোট ছেলে মেয়েদের এখনও মল ও নূপুর পরিয়ে রাখা

হয়। জননীরা তাঁদের শিশুকে বহন ক'রে নিয়ে যাবার সময় একটি কাপড়ের ছালা ব্যবহার করেন। সেটি—পৈতের মত তাদের ডান কাঁধ থেকে নেমে এসে বাম উরুদেশের উপর পর্য্যন্ত ঝোলে। শিশুকে সেই ছালায় পুরে বাম কটি প্রান্তে ঝুলিয়ে নিয়ে তাঁরা স্বচ্ছন্দে ঘুর ফির বেড়াতে পারেন।

বালীদ্বীপের সম্ভ্রান্ত মহিলা

সুগন্ধ পুষ্প, গন্ধ-পুষ্পের নির্য্যাস বা সুবাসিত বৃক্ষ-পত্রের সৌরভে বস্ত্রাদি সুগন্ধময় করে নিতে যাবনী সুন্দরীরা অত্যন্ত ভালবাসেন। তাঁরা তাম্বুল-রাগে বিম্বাধর রঞ্জিত করে রাখেন, চারু চরণতলে, কমল করপুটে ও চম্পক অঙ্গুলী-শীর্ষে তাঁরা অলক্ত রেখা বা অপর কোনও ভেষজ লোহিত রাগ লেপনে রক্তিম ক'রে রাখেন। স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে প্রায়ই রিক্তপদে থাকেন। কেবল বাহিরে ও পথে যাবার সময় তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিনামা ব্যবহার করেন, সকলে জুতাটা বড় পছন্দ করেন না।

যবদ্বীপের অধিবাসীরা অধিকাংশই সহর অপেক্ষা পল্লীতে থাকতে ভালবাসে। প্রত্যেক পল্লী একটী স্বতন্ত্র সমাজ বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের পারিবারিক জীবন বেশ সুনিয়ন্ত্রিত। অবস্থাপন্ন উচ্চ বর্ণের লোকেরা সেখানে বহুবিবাহ করে। বহুবিবাহ তাদের সমাজে প্রচলিত আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র লোকেরা—একটীর বেশী বিবাহ প্রায়ই করে না। এটা তাদের—একনিষ্ঠতা বলে যেন কেউ না ভুল করেন,—দারিদ্র্যই হ'চ্ছে তাদের এই সংযমের প্রধান হেতু। যবদ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। এদের পূর্ব্বপুরুষরা সকলেই প্রাচীন কালে হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং এঁরা অনেকটা উদার প্রকৃতির লোক। মুসলমান ধর্ম্মের কঠোর গোঁড়ামীটুকু এঁদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। পৌত্তলিকতাকে এঁরা বিনা আপত্তিতে সহ্য করেন, এবং অমুসলমানদের একেবারেই ঘৃণা করেন না।

যবদ্বীপের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য হ'চ্ছে ভাত। জল তারা সিদ্ধ ক'রে নিয়ে খায়। জলপান করবার সময় তারা পাত্রটি মুখে স্পর্শ করে না, আলগোছা খায়। নৃত্য গীতের একান্ত পক্ষপাতী হলে'ও তাদের গীতবাদ্যের মধ্যে এমন একটা করুণ সুরের আভাস পাওয়া যায়, যে মনে হয়, বিষণ্ণতা যেন এদের একটা

জাতিগত দুর্ব্বলতা। কিন্তু এ বাহ্যিক বিষণ্ণতার জন্য তাদের জীবন যে সত্যই দুঃখময়—এ কথা মনে হয় না, বরং তাদের ধীর শান্ত প্রকৃতির সঙ্গে এ ভাবটা বেশ খাপ খেয়ে যায়।

ওলান্দাজদের শাসনাধীনে তারা যে বিশেষ অসুখে নেই, এটা তাদের মাঝখানে দুদিন বাস করলেই বুঝতে পারা যায়। ওলান্দাজরা এদের প্রকৃতি বুঝে' ঠিক যেমন ভাবে শাসন-দণ্ড পরিচালনা ক'রলে শাসকের ক্ষমতা খর্ব্ব হবে না ও প্রজাদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দেবে না, তেমনি ভাবে এ-দেশের রাজকার্য্য পরিচালনা ক'রছে। যবদ্বীপ কতকগুলি জমীদারীতে বিভক্ত। প্রত্যেক জমীদারীর মালিক এক একজন যাবন ওমরাহ। জমীদারী পরিচালনের জন্য —এরা ওলান্দাজ সরকারের কাছে

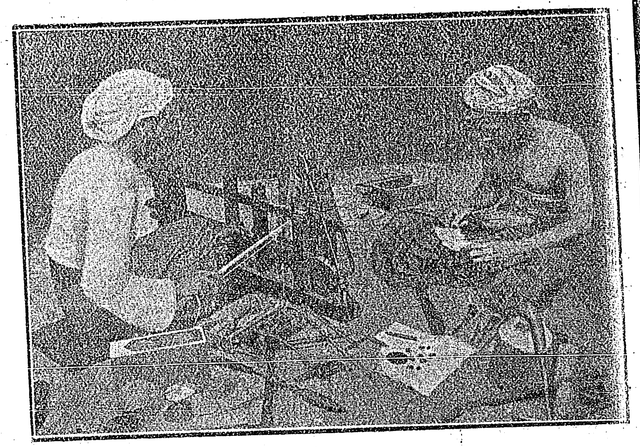

যবদ্বীপের লৌহ কর্ম্মকার

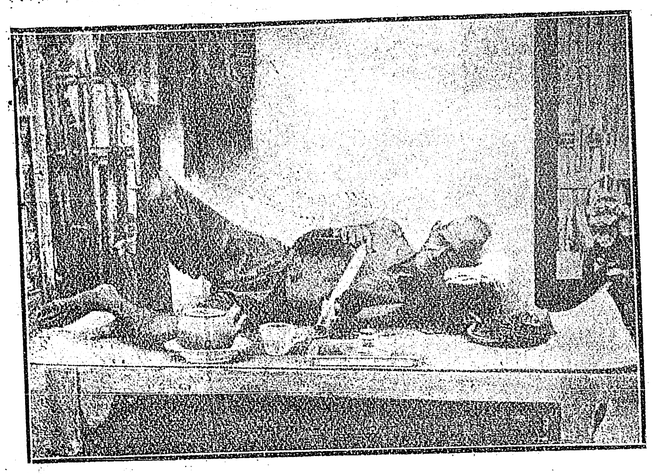

আফিমের আড্ডার সর্দ্দার

অর্থ-সাহায্য পায়। কিন্তু খাজনা আদায় ক'রে তাঁদের ওলান্দাজ সরকারের কাছারীতে জমা দিতে হয়।

মধ্যপ্রদেশে কিন্তু এখনও 'শোলো' ও 'জোক্‌জো' নামে দুটি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য আছে। এই দুই রাজ্যের পরিমাপ যথাক্রমে মাত্র ১১৩ ও ৫৬ বর্গমাইল। কিন্তু লোকসংখ্যা শুনলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়—একটীতে ষোল লক্ষ, অপরটীতে দশ লক্ষ লোকের বাস। শোলো বংশীয় নৃপতি শোলরাজ্য শাসন করেন, এবং জোক্‌জোর সুলতান হচ্ছেন সেখানকার শাসনকর্ত্তা। এই দুটি রাজ্যে প্রাচীন কালের যত সব ঐতিহাসিক রাজকীয় প্রথা এখনও প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়। যদিও এই দুই রাজ্যের ক্ষাত্র শক্তি ওলান্দাজ প্রতিনিধির করতলগত, তবু এরা সেই রূপ-কথার কোন্ স্বপ্ন-রাজ্যের রাজা-রাণীর মতো তাদের সেই তাদের রাজ-প্রাসাদের ভিতরে ও বাইরে প্রতিপদে পৌরাণিক রাজা-রাজড়ার যতকিছু আদপ কায়দা ও চাল চলন মেনে চলে। তাদের সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের বিরাট জাঁক জমকের ব্যাপার ও রাজ্যাভিমানের কাণ্ডকলাপ দেখলে মনে হয়, যেন অতীতের কোন এক রহস্যময় যুগের গৌরব-মণ্ডপের মধ্যে এসে পড়েছি!

'বাতেকের' কাজ অর্থাৎ তাঁতের সাহায্য না নিয়ে

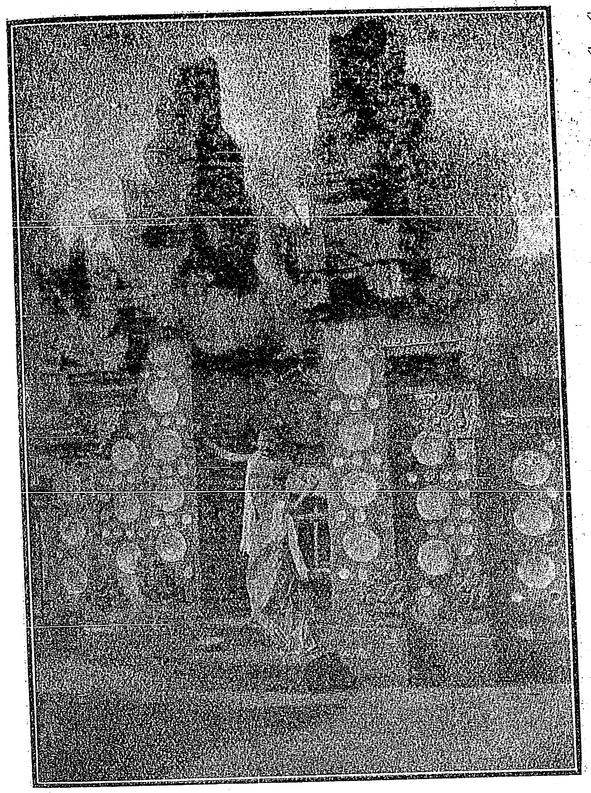

বালীর এক ধনপতির গৃহ-দ্বার

রেশম ও সুতির যে কাপড় বোনা হয়, তার জন্য যবদ্বীপের একটা প্রসিদ্ধি আছে। যবদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে যে দ্বীপশ্রেণী আছে, তার মধ্যে বালী ও লম্বক হ'চ্ছে প্রধান। এখানকার আদিম অধিবাসীরা এখনও হিন্দু বলে পরিচিত এবং সকলেই হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী। কেবলমাত্র বালীর সমুদ্র তীরে কয়েক ঘর মুসলমানের বস্তি আছে। বালীর আয়তন দুহাজার পঁচানব্বই বর্গমাইল, এবং লোক সংখ্যা ছয় লক্ষ হবে। এদের উপ-জীবিকা কৃষি, শিল্প, বস্ত্রবয়ন, স্থাপত্য ও অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি লৌহকর্ম্ম। বালীর অধিবাসীরা যদিও যবদ্বীপবাসীদেরই জ্ঞাতি, কিন্তু তথাপি তারা যবদ্বীপবাসীদের চেয়ে দীর্ঘকায় ও বলশালী। লম্বক ও বালী দুটিই পর্ব্বতসঙ্কুল দ্বীপ এবং ভীষণ আগ্নেয়গিরি পরিপূর্ণ। হরেক রকমের পশু পক্ষীর জন্য এ দুটী দ্বীপের খুব খ্যাতি আছে। লম্বকের আদিম অধিবাসীরা 'শশক' নামে পরিচিত। তাদের সংখ্যা হবে প্রায় তিন লক্ষ বিশ হাজার। কিন্তু এই তিন লক্ষ বিশ হাজার 'শশকদের' মাঝখানে মাত্র পঞ্চাশ হাজার বালীবাসী এসে বুক ফুলিয়ে চোখ রাঙিয়ে বাস ক'রছে। প্রায়ই এই দু'দলের মধ্যে পিটিমিটি বাধে, কিন্তু সংখ্যায় অল্প হ'লেও বালীবাসীরা এমন শক্তিশালী ও দুঃসাহসিক যে, দলে ভারি হ'য়েও শশকরা তাদের কিছু করতে পারে না। যবদ্বীপের উত্তর পূর্ব্বদিকে বাঙ্কা ও বিলীতন দ্বীপ অবস্থিত। এই দুটি দ্বীপে প্রচুর টিনের খনির অস্তিত্ব বিদ্যমান। এই সব খনি চীনেদের হাতে। বাঙ্কার আয়তন হবে ৪৮০ বর্গমাইল, কিন্তু এখানে চীনবাসীর সংখ্যা চল্লিশ হাজারের উপর। বিলীতনেও প্রায় বারোহাজারের উপর চীনের মানুষ বাস করছে। বিলীতনের

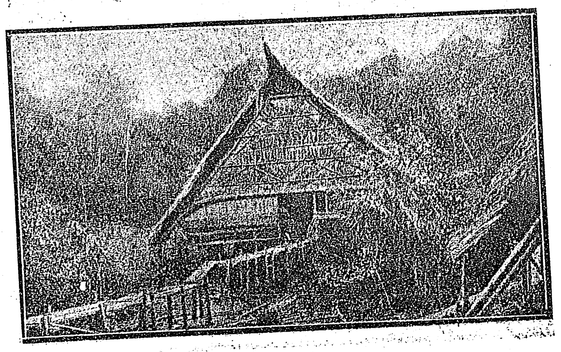

সুমাত্রার দরিদ্র কুটীর

আয়তন মাত্র সতেরশ তিয়াত্তর মাইল। চীনের মানুষ ছাড়া এখানে প্রায় তিরিশ হাজার মালয় অধিবাসী এসে বসবাস ক'রছে। বাঙ্কায় এদের সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজারের উপর। বিলীতনের মালয়ীরা বাতাকদের কুটুম্ব। এদের মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে—ওরাঙ্-দারাৎ এবং ওরাঙ্-লেখা। এরা এখনও তাদের সেই আদিম বর্ব্বরতা সম্পূর্ণ ভুলতে পারেনি।

যবদ্বীপের শান্তশিষ্ট নিরীহ অধিবাসীদের তুলনায় তাদের সুমাত্রাবাসী আচীন জ্ঞাতি অত্যন্ত কঠোর দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্দ্দান্ত। ওলান্দাজরা এই আচীনদের এখনও ঠিক সম্পূর্ণ বশে আনতে পারেন নি। এরা ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং দুরন্ত অভিমানী। হাতে হাতে অপমানের প্রতিশোধ তুলে নেয়। এদের মতো অসমসাহসিক জাত বড় একটা দেখা যায় না। যবদ্বীপবাসীদের চেয়ে এরা বহু গুণে কর্ম্মঠ ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী। আচীনদের

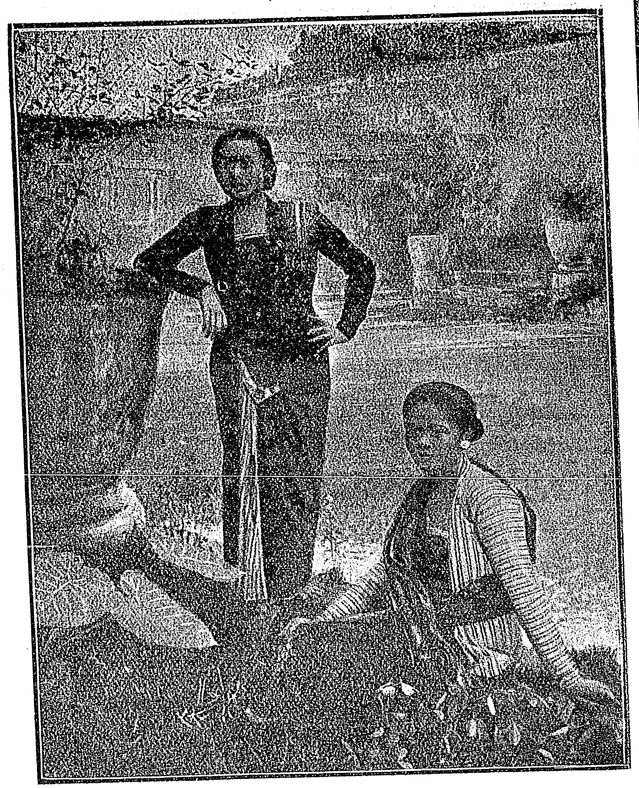

যবদ্বীপের দুটি উদ্যানচারিণী

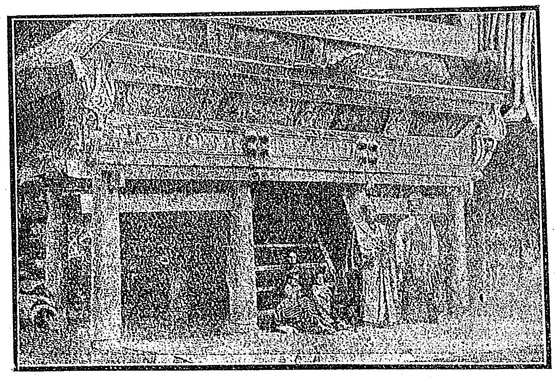

সুমাত্রার ধনীর গৃহ

মধ্যে আরব শোণিত প্রবাহিত আছে। এরা দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ লোক। খাঁটি মালয়ীদের মত মোটেই প্রিয়-দর্শন নয়। আচীনরা যা কিছু উপার্জ্জন করে সমস্তই নেশা, বেশ্যা, জুয়াখেলা আর মুরগীর লড়াইয়ের পিছনে উড়িয়ে দেয়। আফিম আর গাঁজা হ'চ্ছে এদের প্রধান নেশা। এত গাঁজা এরা খায় যে অনেকেই শেষটা পাগল হ'য়ে উঠে! এদেরও প্রধান খাদ্য ভাত। ধানের মরাইগুলিতে এরা বেশ রং চং ও কারুকার্য্য ক'রে রাখে।

আচীনের দক্ষিণে মালয়ের শাখা-সম্ভূত

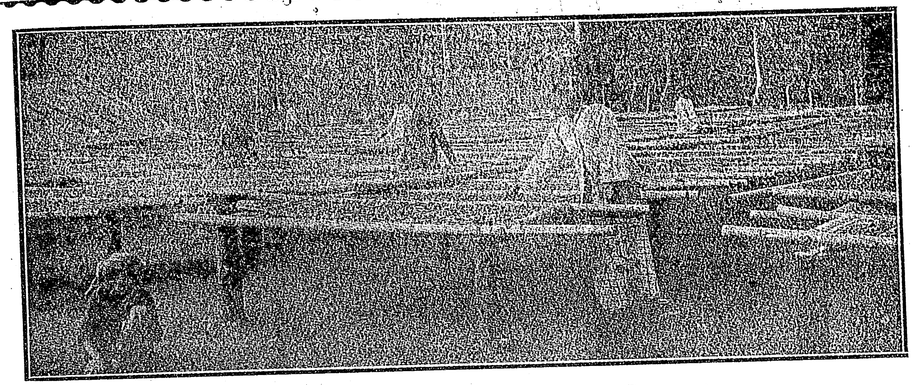

কোকোর পাতা রৌদ্রে দেওয়া হয়েছে (কোকো যবদ্বীপের একটি পণ্যদ্রব্য)

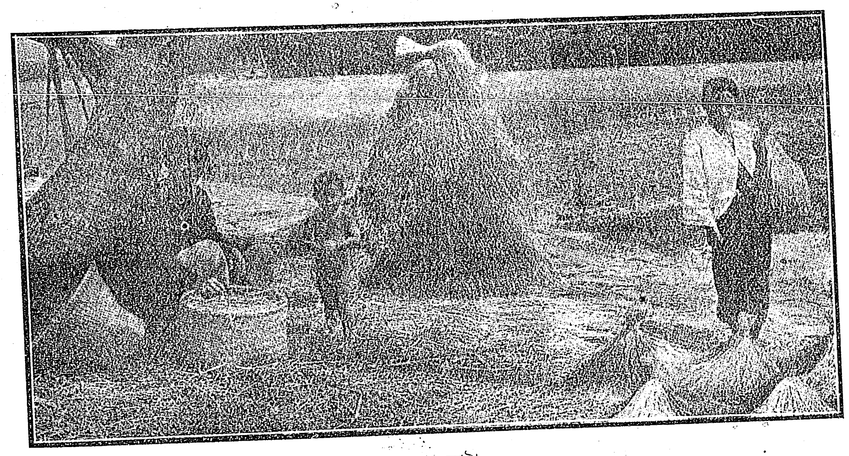

ধান কাটা

আরও অনেক জাত সুমাত্রায় বাস করছে। বাতাক, করিঞ্চী, শীয়াকজাম্বী, পাশুমা, লাম্পঙ্ প্রভৃতি আদিম জাতি ছাড়া ওরাঙ্ উলু ও ওরাঙ্ লুবু বলে আরও দু'দল পার্ব্বত্য বুনো জাত সেখানে আছে, যাদের বিষয় এখনও বিশেষ কিছুই জানতে পারা যায় নি। ভাষা সেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের বটে, তবে বিভিন্ন ভাষার পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই। কারণ সকল ভাষারই জনক হচ্ছে সেখানকার সেই আদিম খাঁটি মালয়ী ভাষা।

যবদ্বীপের চেয়ে সুমাত্রা আকারে চারগুণ বড় এবং সে ওলান্দাজরা এসে তাদের উপর প্রভুত্ব করছে। তাদের সেই মাতৃভূমি হলাণ্ডের চেয়ে চৌদ্দগুণ বৃহৎ! ভারতের এক কোণের এই বাংলাদেশটুকুর মধ্যেই যেমন বারোটি ইংলণ্ড ধরে, অথচ সেই ক্ষুদ্রতম ইংলণ্ডই আজ সসাগরা ভারতবর্ষকে মাত্র তার অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত করছে, তেমনি ক্ষুদ্রতম ওলান্দাজও আজ পূর্ব্বভারতের দ্বীপালীকে হেলায় করতলগত ক'রেছে। কিন্তু সুমাত্রা আকারে বৃহৎ হ'লেও সুমাত্রার লোক সংখ্যা বড় অল্প। প্রায় হাজার মাইল দীর্ঘ ও আড়াইশ' মাইল প্রস্থ এই দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র তিরিশ লক্ষ। তার কারণ সুমাত্রার অধিকাংশ

প্রদেশ এখনও জঙ্গলাকীর্ণ হ'য়ে পড়ে রয়েছে। এসব জঙ্গলে আজ পর্য্যন্ত মানুষের প্রবেশ লাভ ঘটেনি। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে সুমাত্রার জঙ্গল সাফ্ ক'রে ফেলতে পারলে ওখানে তিরিশ লক্ষর স্থানে সাতকোটী লোকের বসতি হ'তে পারবে।

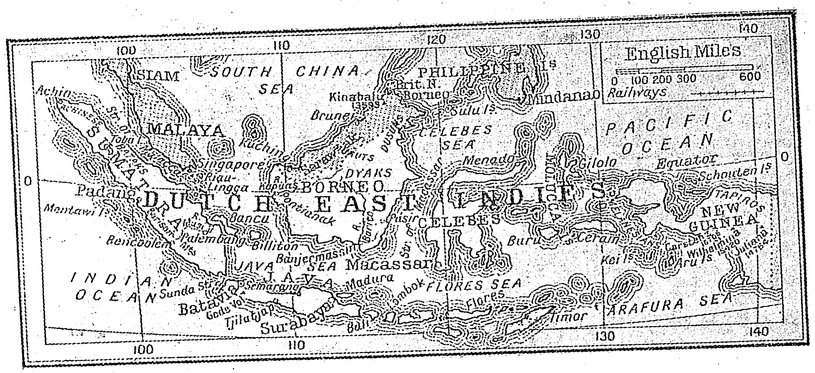

ও হ্রদ-তড়াগেরও সমাবেশ আছে। তবে সকল নদীতে নৌকা বা জাহাজ চলাচলের সুবিধা নাই। সব চেয়ে বড় নদী হল' চারটি,—অসহন, ইন্দ্রজিরী, হ্বারী ও মহর্ষী। হ্রদের মধ্যে তপ-হ্রদ সবচেয়ে বড়, প্রায় ৮০০ বর্গ মাইল হবে তার আয়তন।

যবদ্বীপের নারিকেল-কুঞ্জ

পূর্ব্বভারতের দ্বীপালীর মানচিত্র

সুমাত্রার মাঝখান দিয়ে ঠিক যেন তার মেরুদণ্ডের মত চলে গেছে সুদীর্ঘ বরিষাণ পর্ব্বত শ্রেণী। এর এক একটি শিখর বারোহাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। অনেকগুলি আগ্নেয়গিরির অস্তিত্বও এখানে বিদ্যমান। বহু নদনদী

সুমাত্রার স্তব্ধ বন্য-সৌন্দর্য্য বর্ণনার অতীত। পূর্ব্ব ভারতের দ্বীপালী সবগুলিই প্রাকৃতিক শোভায় অতুলনীয়। ভারতের মত সেখানেও ষড়ঋতুর লীলা বিরাজমান। তবে এখানকার সঙ্গে সেখানকার সময়ের অনেকটা পার্থক্য

বাবনীদের জলবিহার

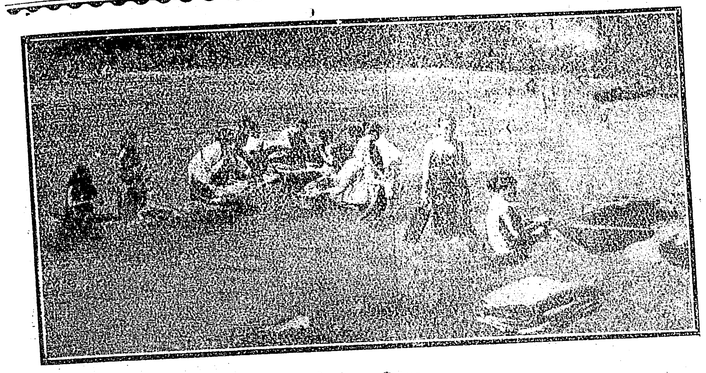

বরণীয় দ্বীপের অবস্থা প্রায় যবদ্বীপেরই মতো। আকারে বরণীয় দ্বীপ সুমাত্রার অপেক্ষা বড়! বরণীয় দ্বীপের সমগ্র অংশ ওলান্দাজদের অধীন নয়। সমুদ্রের উত্তর কূলস্থ সারাবক প্রদেশ এবং ইংরাজ অধিকৃত উত্তর বরণীয় ওলান্দাজের শাসনাধীন নয়।

আছে। সেখানে বর্ষা নামে পৌষ থেকে, শীত সুরু হয় ফাল্গুনে, গ্রীষ্মের দেখা পাওয়া যায় ভাদ্র আশ্বিনে, বসন্ত আসে আষাঢ়ে—এই ভাব!

আচীনের মুসলমানেরা তীর্থ ধর্ম্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী। প্রতি বৎসর এই দ্বীপগুলি থেকে অন্ততঃ দশ হাজার তীর্থযাত্রী মক্কা দর্শনে যায়। বিদেশীদের সংখ্যাও এ দ্বীপগুলিতে নেহাৎ কম নয়। চীনবাসীর সংখ্যাই হবে প্রায় পাঁচ লক্ষের উপর। আরব মুসলমান আছে অন্ততঃ তিন লক্ষ। য়ুরোপীয়দের সংখ্যা হবে আশী হাজারের উপর।

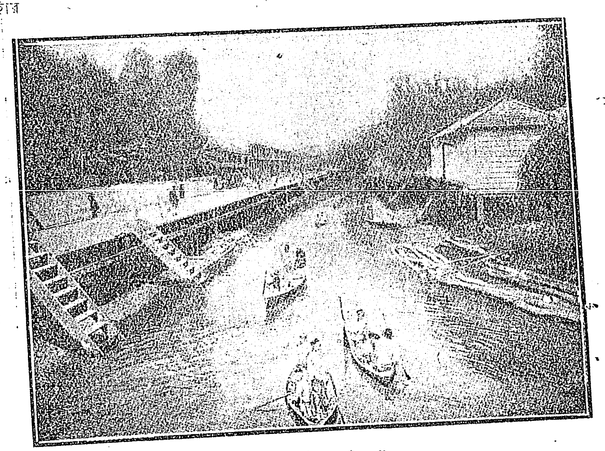

সুমাত্রার একটী ছোট নদী

সুমাত্রার মাঝী

বরণীয়তেও নানা বিভিন্ন জাতির বসবাস আছে, তাদের মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে দায়াকরা। এদের সংখ্যা হবে প্রায় দশ লক্ষ। এছাড়া দশন, মুরৎ, ভজন, ইলানুন, ও শীলাবীষ থেকে আগত বুগীদের সংখ্যাও বড় কম নয়।

দায়াকরা ঠিক খাঁটি মালয়ী নয়, দশন ও মুরংরাই হ'চ্ছে বরণীয়র আসল আদিম অধিবাসী। এরা এখনও পর্য্যন্ত মালয়ীদের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে

বস্ত্রশিল্প
(কাপড়ের উপর যবদ্বীপের মেয়েরা তুলি ও
রং দিয়ে ফুল আঁকছে)

বালীর-পল্লী দম্পতী

বারানি। বরণীয়র অভ্যন্তর প্রদেশে এদের বাস। ভজন, ইলানুন ও বুগীরা মালয় জাতিরই শাখাবিশেষ। এরা সমুদ্রোপকূলস্থ প্রদেশে বসবাস করে। এরা কৃষিকার্য্য, নৌকা নির্ম্মাণ, তাঁতের কাজ প্রভৃতি ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রায় চল্লিশ হাজার চীনবাসী ও মুষ্টিমেয় য়ুরোপীয় লোক এখানে ব্যবসাসূত্রে এসে বাস ক'রছে। চীনেরা ও য়ুরোপীয়েরা বরণীয় দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের তুলনায় এত বেশী চালাক চতুর ও বুদ্ধিমান যে এই দ্বীপের যতকিছু খনির কাজ সমস্তই এরা নিজেদের মধ্যে একচেটে ক'রে নিয়েছে। মলয়বাসীরা বিদেশীদের বলে 'কেহে'। এই আগন্তুক 'কেহের' দলকে বরণীয়বাসীরা যদিও বিশেষ সুনজরে দেখে না, তথাপি এ কথা তারা কোনও দিনই অস্বীকার ক'রতে পারবে না যে, এই 'কেহে' বাবুরাই তাদের দ্বীপের ব্যবসা বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির প্রধান উপলক্ষ।

(ক্রমশঃ)

স্বপ্ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

১৫

শঙ্করের যখন একটু চেতনা হইল, সে উদাস-দৃষ্টিতে তাহার শূন্যঘরের চারিদিকে চাহিল। তাহার মনে হইল সে যেন কোন অজানা স্থানে অসহায়ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। অস্ফুট-করুণ সুরে সে ডাকিয়া উঠিল—মা!

কাহার হস্তের মধুর স্পর্শ তাহার কপালে আসিয়া ঠেকিল। শঙ্কর একটু চমকিয়া চাহিল; দেখিল, তাহার মাথার কাছে এক নারী বসিয়া,—মুখখানি যেন কোথায় দেখিয়াছে, ঠিক মনে করিতে পারিতেছে না। নারীটী এতক্ষণ কম্পিত করুণ চোখে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল; এখন শঙ্কর চেতনা-লাভ করিয়াছে দেখিয়া, তাহার চোখ দু'টি আশার আনন্দে একটু দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার করুণ মধুর মুখ শঙ্করের চোখে বড় সুন্দর বোধ হইল। কিন্তু সম্মুখে ছড়ান বইগুলির দিকে চাহিতেই শঙ্করের মোহ-স্বপ্ন টুটিয়া গেল, আগেকার সব কথা মনে পড়িয়া গেল; মাথায় যেন একটু বেদনা অনুভব করিল, মাগো, বলিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। নাদিরের কথা, দিল্লী-লুণ্ঠনের কথা, তাহার মাতা ভগ্নীর কথা তাহার মনে বিদ্যুতের মত চমকিয়া গেল। সে একবার উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু নারীটী চক্ষের ইঙ্গিত দিয়া তাহাকে উঠিতে বারণ করিয়া শোয়াইয়া রাখিল। তাহারি মুখের দিকে চাহিয়া সে এই বাস্তব-জীবনের দুঃস্বপ্ন যেন ভুলিতে চাহিল। এ নারী কে, কোথা হইতে কিরূপে আসিয়াছে, তাহা সে জানিতে বুঝিতে চাহিল না। সে সকল বেদনা জ্বালা ভুলিয়া এখন শান্তির আশ্রয় খুঁজিতেছে। তাহারি হাতের স্নিগ্ধ-স্পর্শে শঙ্কর ধীরে চোখ বুঝিল। সে যেন কিছু বুঝিতে ভাবিতে চাহে না।

কিন্তু এরূপ ভাবে শঙ্কর বেশীক্ষণ পড়িয়া থাকিতে পারিল না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শরীরে একটু শক্তি পাইতেই সে ধীরে উঠিয়া বসিল। আপন অন্তরের বেদনা নিরুদ্ধ করিয়া সে ক্লান্তস্বরে বলিল—কে, কে তুমি মা?

নারীটি লজ্জিত-করুণ চোখে তাহার দিকে চাহিল,—সে তাহাকে চিনিতে পারিল না বুঝিয়া ব্যথা অনুভব করিল।

শঙ্কর ধীরে বলিল—তুমি, তোমায় যেন কোথায় দেখেছি—

মৃদুকণ্ঠে নারী বলিল—আমি, আমি জামেলা।

জামেলা, ওঃ! কিন্তু কৈ আলি? আমার বোনকে দেখেছ, আমার মাকে—মাকে?

না, তাঁদের ত আমি দেখি নি, আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনি পথে—

মাকে—মাকে দেখনি?

না, আপনি পথে পড়ে গেছলেন আমার বাড়ীর ঠিক সামনে, তার পর আমি যখন পথে বেরিয়ে এলুম আপনি চলে গেছেন, তাই আপনার পেছন পেছন—

ও, কিন্তু তাদের হয়ত ধরে নিয়ে গেছে, নাদিরের ওই পিশাচ সৈন্যেরা তাদের—ও! দেখ জামেলা—

আপনি একটু স্থির হয়ে শুন—

স্থির হতে বলছ—না—বৃথা এ শাস্ত্র-চর্চ্চা করেছি—শাস্ত্র নয়, অস্ত্র—অস্ত্র—তাঁরা হয়ত আগেই কোথাও পালিয়ে গেছেন, কি কোথাও লুকিয়ে আছেন—না, তুমি সিঁড়িতে রক্ত দেখনি—আমার মা বোনকে তারা জীবন্ত নিয়ে যেতে পারবে না, তারা হত্যা করেছে—ওই হিংস্র পশুর দল—রক্ত চাই—রক্ত—

আপনি শান্ত হয়ে—উঠবেন না—

ও, মাথাটা জ্বলে যাচ্ছে—

জামেলা ধীরে শঙ্করকে আবার শোয়াইয়া দিল, শঙ্কর শান্ত হইয়া শুইয়া চোখ বুজিল, এ আলোর দিকে চাহিতে

তাহার যেন কষ্ট হইতেছে। অন্ধকার নামিয়া আসুক, অন্ধকারে চারিদিক মুছিয়া এক হইয়া যাক। কিন্তু তাহার সম্মুখে স্নিগ্ধ নিবিড় অন্ধকার নামিল না, সে অন্ধকার ভরিয়া তারাদলের মত তাহার বোনের মুখ, মায়ের মুখ, জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

যখন দিল্লীর ওপর রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল, তখন শঙ্কর একটু শান্ত হইয়াছে। বাহিরেও হত্যাকাণ্ড শেষ হইয়াছে। যে সৈন্যেরা হিংস্র ব্যাঘ্রের মত সমস্তদিন লুণ্ঠন করিয়া নারী-নির্য্যাতন করিয়া হত্যাকাণ্ড অগ্নিলীলা করিয়া ঘুরিয়াছে, তাহারা দলপতি নাদিরের আদেশে এখন মেষের মত শান্ত। মহানগরী দিল্লী মৃত্যু-পুরীর মত স্তব্ধ, অন্ধকারময়; তাহার উৎসব-দীপমালা চির-নির্ব্বাপিত, তাহার লালসাতপ্ত নিশীথের ভোগ-উল্লাস নূপুর-নিক্কন সঙ্গীত-ধ্বনি চির-স্তব্ধ; সদ্য-বিধবার করুণ আর্ত্তনাদের মত বাতাস হাহা করিয়া বিদগ্ধ ভগ্ন শূন্য গৃহে-গৃহে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

শঙ্কর ধীরে ডাকিল—জামেলা!

আপনি সমস্ত দিন ছটফট করেছেন, এখন একটু—

মাথাটা যেন জ্বলে যাচ্ছে—

আপনার বোধ হয় জ্বর হয়েছে, ঘুমোতে চেষ্টা করুন—

ঘুম, না, আর ঘুম নয়, অনেক ঘুমিয়েছি—

না, আপনি উঠবেন না, শুয়ে থাকুন—

চারিদিক যেন বড় চুপচাপ, বড় ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে—

হত্যাকাণ্ড বোধ হয় শেষ হল।

না, শেষ হয়নি। হত্যা একবার সুরু হলে তার শেষ কোথায়, এর প্রতিশোধ—

একটু শান্ত হন।

শান্তি নয়, বিপ্লব চাই। দেখ, ওই যে তারাগুলো, ওরা কত সংগ্রাম কত বিপ্লবের সাক্ষী, কত রাজ্য সাম্রাজ্য ওদের সামনে স্বপ্নের মত গড়ে উঠে মিলিয়ে গেছে। যখন ওদের দলে গিয়ে পড়ি, ওদের হি [illegible]ব-নিকাশ কসি, তখন এই পৃথিবীর জীবন, রাজ্য, রাজধানী কত তুচ্ছ, কত ক্ষণিক বলে মনে হয়—আমাদের সত্যিকার জীবন ভুলে যাই—কিন্তু আমাদের সত্যিকার জীবন কি তুচ্ছ ক্ষণিক নয়?

কি জানি, আমায় আর ভুলিও না। দিনের বেলায় মনে হয় কত 'বড় আমরা। তখন আমার দেশ, আমার জাতির কথা বড় করে ভাবি। কিন্তু রাত্রির বেলা মনে হয়, এই বিশ্ব-সংসারে আমরা কত সামান্য,—তখন মনে হয় মায়া, সব মায়া—

সত্যই কি সব মায়া? আমারও জীবনে মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন সব মরীচিকা, ছায়াবাজী। আমি যা দেখছি শুনছি, তা সত্যি নয়; যে আমি দেখছি, ভাবছি, তাও সত্যি নয়—

আচ্ছা জামেলা, তোমার কি মনে হয়, মা বেঁচে আছেন—

বোধ হয় আছেন, কোথাও লুকিয়ে—

আবার বোধ হয় বলছ – সত্য কি? সবই কি শুধু বোধ হয়? কিছু ঠিক বুঝতে পারচ না! বোধ হয় আমি বেঁচে আছি! একটা যেন দুঃস্বপ্ন—

আচ্ছা, ওই তারাটার কি নাম?

ওটা, তারা নয়, গ্রহ, দেখ কি দুর্গন্ধ আসছে—

হাঁ, বোধ হয় কোন মৃত দেহের পচা গন্ধ—

আবার বোধ হয়! ঠিক কিছুই বোঝা যায় না। কেন তুমি জীবনকে এমন রহস্যময় করেছ, মৃত্যুর অবগুণ্ঠনে আবৃত করে রেখেছ—চারিদিকে শুধু অজানা—আচ্ছা জামেলা, তুমি কেন আমার কাছে এলে?

আমি আপনার শিষ্যা হতে চাই।

শিষ্যা!

গুরু বলিয়া জামেলা শঙ্করের পদধূলি লইল।

দেখ, এম্নি করে আর একদিন আর একজন আমার কাছে এসেছিল, সে আলি মহম্মদ—তাকে পেয়ে মনে হয়েছিল আমার স্বপ্ন সত্য সফল হতেও পারে, কিন্তু হায়—

গুরু আমাদের ত সে সাধনায় ডাক দেন নি—

ঠিক বলেছ মা, তোমাদের ডাকিনি—তোমার কাছ থেকে আলিকে আমি চেয়ে নিয়েছিলুম দেশ-মার জন্যে, তোমাকে ত আমি চাইনি—

গুরু!

না, জামেলা, আমি কারুর গুরু নই। এখনও আমার নিজের সাধনা শেষ হয়নি। আমার স্বপ্ন সত্য হবে কি না জানি না; কিন্তু সামান্য বাধায় আমি যে আশাহীন বিক্ষিপ্ত-

চিত্ত হচ্ছি—তুমি এ দুর্দ্দিনে মাতৃশক্তি' রূপে এলে চির আশার বাণী নিয়ে এলে—অন্ধকারে আমি যেন একটু পথ দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু এ বড় দুর্গম পথ—

তারাভরা আকাশের দিকে শঙ্কর চাহিয়া রহিল।

জামেলা!

জামেলার অন্তর কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে কোন সাড়া দিল না।

দেখ, এ মোগল সাম্রাজ্য স্বপ্নের মত মিলিয়ে যাবে, এ রাজসিংহাসন লুটিয়ে পড়বে। তার পর হিন্দুর নবসাম্রাজ্য —হিন্দুর—

আর মুসলমান?

হাঁ, মুসলমান। ও, তারাগুলো কি ঝকমক করছে—এদের দিকে চাইলে আর পৃথিবীর রাজ্য সাম্রাজ্যের কথা ভুলে যাই—তুমি এবার ঘুমাও, কত জাগবে—

আর আপনি?

আমার চোখে এ রাতে ঘুম আসবে না।

আমারও আসবে না।

দু'জনে স্তব্ধ করুণ চোখে রাত্রির অন্ধকার ও তারাগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন ভগ্নস্তূপের মধ্যে যমুনা ও আলিমহম্মদ স্তব্ধ বিনিদ্র ভাবে তারাগুলির দিকে চাহিয়া রাত্রি কাটাইতেছিল।

আলি ধীরে ডাকিল—যমুনা!

কি?

ভয় করছে?

না, তুমি ত রয়েছ।

আচ্ছা, তোমাকে আমি এমন ভাবে এনে খুব অন্যায় করেছি?

না, অন্যায় কি করেছ, তুমি ত আমাকে বাঁচাবার জন্যেইত—

আলি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। দিনের আলোয় দু'জনেই দু'একটি কথা বলিয়াছে। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে অনন্ত আকাশের তলে এ বিজন স্থানে দু'জনে যেন দু'জনের খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। দু'জনেই মন খুলিয়া কথা কহিতে চাহিতেছে।

আলি ধীরে বলিল—কাল সকালেই তোমার দাদার খোঁজে যাব, তাঁকে যদি পাই, তাঁর কাছে তোমায় রেখে আসব—

আর তাঁকে যদি না পাওয়া যায়, [illegible] ব্যবস্থা হইবে, সে কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিল না,—দু'জনেই সে কথা কিন্তু ভাবিতে লাগিল। যমুনা ধীরে বলিল—কিন্তু নগরে ত এখন নাদির রয়েছে, তুমি যাবে?

আমার ত নাদিরের সৈন্যের সাজ রয়েছে, কোন ভয় নেই, তুমি একটু একা থাকতে পারবে না?

খুব পারবো।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

আলি আবার ধীরে বলিল—তোমার দাদা নিশ্চয় বেঁচে আছেন, তিনি ত যন্তর-মন্তর দেখতে গেছলেন—

যমুনা ধীরে বলিল—হাঁ, বোধ হয় তাঁকে কেউ মারবে না। কেন যে তাহার দাদাকে কেউ হত্যা করিবে না, তাহার কারণ অবশ্য বিশেষ কিছু নাই। তবু যমুনা ভাবিতে পারিতেছিল না যে, তাহার দাদার মৃত্যু হইয়াছে।

আলি স্নিগ্ধস্বরে বলিল—তুমি একটু ঘুমাও—

আমার চোখে ঘুম আসছে না—আচ্ছা, তোমার ত একটি বোন আছে—তোমাদের বাড়ী ত বাজার থেকে অনেক দূরে—সেখানে বোধ হয়—

আলি মহম্মদ কোন উত্তর দিতে পারিল না। শিরিণের কথা মনে পড়িতে তাহার চোখে জল আসিল। গোপনে অশ্রু মুছিয়া সে বলিল—কাল সকালেই তার খোঁজ করব—সে যেরকম সাধ্বী পুণ্যবতী, আল্লা তার কোন অমঙ্গল করবেন না—

যমুনা কোন কথা কহিল না, সে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল, আলির কথাই যেন সত্য হয়।

তখন ভগ্ন বাড়ীর পাশের দিকে একটি ছোট ঘরে শিরিণ শান্তভাবে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, তাহার দুই পাশে দুইটি ছেলে মেয়ে। বাড়ীটি পুড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেলেও এই ঘরখানি বাঁচিয়া গিয়াছে। এই ঘরখানিতে সে দুই গৃহহারা অনাথ ছেলেমেয়ে লইয়া আশ্রয় লইয়াছে। ছেলেটি কোন রাজপুতের, বয়স ছ'বছর। মেয়েটি কোন দিল্লীবাসী হিন্দুর, বয়স পাঁচ বছর। আজিকার দারুণ হত্যাকাণ্ডে ইহারা মাতৃপিতৃহীন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পথে পথে

ঘুরিতেছিল। শিরিণ তাহাদের ভোলাইয়া আদর করিয়া আপনার কাছে আনিয়া রাখিয়া দিয়াছে। ইহাদের ঘুম পাড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ঘরের দ্বারের কাছে রাজশেখর রক্ষীরূপে বসিয়া ঘুমে ঢুলিতেছে। সে শিরিণকে এ বিপজ্জনক স্থান ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত দিল্লী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু শিরিণ কিছুতেই রাজী হয় নাই। সে জানিত, তাহার দাদা যদি বাঁচিয়া থাকেন ত নিশ্চয়ই ত তাহার খোঁজ করিতে এখানে আসিবেন। সে তাহার দাদার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। আর তাহার এ গৃহ ছাড়িয়া দিল্লী ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে? তার পর পথে অনেক ছোট ছেলেমেয়ে নিরাশ্রয় অসহায় ভাবে ঘুরিতেছে কাঁদিতেছে দেখিয়া সে ঠিক করিয়াছিল, সে তাহার এই ভগ্ন গৃহেই তাহার শক্তিমত কয়েকজনকে আশ্রয় দিবে। নদীর ধারে দুইটি ছোট ছেলেমেয়ে কাঁদিয়া ঘুরিতেছে দেখিয়া সে তাহাদের স্নেহের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতে রাজশেখর কিসের শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিল দূরে কয়েকটা শেয়াল মৃতদেহের সন্ধানে ঘুরিতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিল। হয় ত ভগ্ন বাড়ীর মধ্যে যেখানে ফতেমা চাপা পড়িয়াছে, সেখানে তাহারা মৃতদেহের গন্ধে আসিয়াছে।

ফতেমার কথা মনে পড়িতেই তাহার ঘুম চলিয়া গেল, দুই চোখ যেন জ্বলিতে লাগিল। তাহার ছন্নছাড়া জীবন-পথে ফতেমা কি অপরূপ নৃত্যদোদুল ছন্দে আসিল, কি জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিরেখা টানিয়া চলিয়া গেল; হয়ত সে তাহার বিচ্ছিন্ন জীবন এক প্রেমের সূত্রে আনন্দের হার গাঁথিয়া তুলিতে পারিত। হয়ত এই নটী সঙ্গিনীর সাথে তাহার জীবন মধুর সুন্দর হইত, কিন্তু বিধাতার তাহা বুঝি সহ্য হইল না। শিরিণকে সে ভক্তি করে; কিন্তু ফতেমাকে সে যে ভালবাসে। ফতেমাকে সে যে ভালবাসিয়াছে, ফতেমাকে হারাইয়া সে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। তাহারি চোখের নির্ম্মল উজ্জ্বল চাউনি, তাহারি মুখের সরল দীপ্ত হাসি চারিদিকের অন্ধকারে যেন ঝিলমিল করিতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠ-মধ্যাহ্নের প্রখর তাপে ফুলের মত যেন সে দগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তাহার সৌরভ রাত্রির অন্ধকার ভারাক্রান্ত করিয়া তাহার মন উদাস করিয়া তুলিল।

কেন এ সুখদুঃখের মায়াচক্র, কেন এ জীবন-মৃত্যুর দারুণ লীলা? কে যেন তাহার জীবন লইয়া খেলিতেছে। সে অন্তরে তৃষ্ণা জাগায়, কিন্তু কোন তৃষ্ণা ত তৃপ্ত হয় না। সে মনকে স্বপ্নে মাতায়, কিন্তু নিমেষে সব স্বপ্ন টুটিয়া যায়। সব রঙের মধুর খেলা কালো অন্ধকারে নির্ম্মম হস্তে মুছিয়া দিয়া সে আবার নতুন খেলা সুরু করে।

জীবনের চির অব্যক্ত অসীম নির্ম্মম রহস্যের মত এ তিমিরাবগুণ্ঠিত রাত্রির দিকে রাজশেখর খরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

১৬

রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটিয়া আসিতে লাগিল। ঊষার মলিন আলো পুত্রহারা মাতার চোখের চাউনির মত। এ আলোয় জুম্মামসজিদের স্বর্ণমণ্ডিত গম্বুজের চূড়াগুলি ঝিকমিক করিয়া রাঙা হইয়া জ্বলিল না, ঘরে ঘরে জাগরণ কলধ্বনি উঠিল না। শবাকীর্ণ ভগ্ন দগ্ধ দিল্লীনগরী হিমশীতল স্তব্ধ—মড়ার মুখের হাসির মত। মেঘের ফাঁক দিয়া আলো মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

শুধু জুম্মা মসজিদের মিনারের ওপর হইতে মুয়াজ্জিন দিবসের প্রথম নমাজের জন্য সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। করুণ ক্রন্দনের মত তাহার কণ্ঠস্বর। এ কণ্ঠস্বরকে ব্যঙ্গ করিয়া শবগন্ধভারাক্রান্ত বাতাস হা হা করিয়া বহিয়া গেল। কে জাগিবে? পুত্রহীনা মাতা, অপমানিতা নারীর হতাশ্বাসের মধ্যে আল্লার নাম কে করিবে?

শুধু একচক্ষু মির্জ্জা আজানের আহ্বান ধ্বনিতে জাগিয়া মনে মনে আল্লার নাম করিয়া আবার তাহার ছেঁড়া কম্বলখানি ভাল করিয়া জড়াইয়া শুইল। এক বাদশা চলিয়া যায়, আর এক বাদশা আসে,—এক রাজ্য মিলাইয়া যায়, আর এক রাজ্য ওঠে। তাহাতে তাহার কি আসে যায়? দিনে সে পথের ভিক্ষুক, এ মসজিদের প্রাঙ্গণ তাহার রাত্রের আশ্রয়। যুদ্ধের হারজিতে, সাম্রাজ্যের ভাঙাগড়ায় তাহার কিছুই ক্ষতি নাই। আল্লার নাম করিয়া কিছু ভিক্ষা পাইলেই তাহার যথেষ্ট। দিল্লীবাসীরা সব মরিয়া গিয়াছে; কিন্তু নাদিরের সৈন্যদের নিকট হইতে কিছু ভিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে,—তাহারা ত বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া ধনী হইয়াছে। এ কথা ভাবিতে ভাবিতে মির্জ্জা আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

শেষরাত্রে শঙ্কর একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মুয়াজ্জিনের আহ্বান ধ্বনিতে সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। স্তব্ধ মৃত্যু-শীতল ঊষার এ ধ্বনিতে সে যেন শিহরিয়া উঠিল।

জামেলা!

কি—

তুমি একটুও ঘুমোও নি—ও কিসের শব্দ—মসজিদে বুঝি—

হাঁ।

কি বলছে, জয় আল্লার জয়—

জামেলা মনে মনে বলিল, জয় আল্লার জয়, আল্লা আমার জীবনে তোমার জয় হোক—

না, জয় আল্লার জয় নয়, দেখছ না, মৃত্যুর জয়, নাদিরের জয়, নাদির-পিশাচের জয়—কে বলে আল্লার জয়?

শঙ্কর আবেগের সহিত উঠিয়া বসিল। জামেলা তাহাকে বাধা দিতে বা কিছু বলিতে সাহস করিল না। করুণ চোখে সে ঊষার আলোর দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রভাতের আলো রুদ্র চক্ষের নিষ্ঠুর হাসির মত প্রখর হইয়া উঠিল। শঙ্কর ধীরে উঠিয়া তাহার জ্যোতির্ব্বিদ্যার গ্রন্থগুলি বাছিতে লাগিল। জামেলা পূর্ব্বেই মেজেতে ছড়ান বইগুলি গোছাইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিল। কয়েকখানি পুঁথি বাছিয়া আলাদা করিয়া রাখিল। এইগুলি সে সঙ্গে লইবে। পুঁথিগুলির দিকে চোখ রাখিয়া সে ধীরে বলিল—তুমি কি করবে? পথ এখনও বোধ হয় নিরাপদ নয়—

জামেলা বুঝিল, শঙ্কর এ মৃত্যুপুরী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায়।

দেখ, কুতব মিনারের কাছে আমাদের এক গুপ্ত স্থান আছে—আমি একবার সেখানে যাবো, কিন্তু তুমি?

জামেলা নত নেত্রে বলিল, আমি আপনার সঙ্গে যাব।

শঙ্কর কিছু উত্তর দিল না। এ শূন্য গৃহে একা এক নারীকে সে কি করিয়া রাখিয়া যাইবে। মাঝে মাঝে মৃতদেহের দূষিত গন্ধ আসিতেছে, আজ আবার হত্যাকাণ্ড যে নতুন করিয়া সুরু হইবে না, তাহা কে জানে।

ধীরে শঙ্কর বলিল, চল তোমাকে তোমার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আমি—

করুণ হাসিয়া জামেলা বলিল—কিন্তু কোথায় আমার বাড়ী, আমি কোথায় যাবো?

সৈন্যেরা বুঝি তা পুড়িয়ে দিয়েছে—

তা যদি দিত, ত আমি সত্যি মুক্তি পেতুম—তা নয় গুরু, আমি আর আমার পুরাতন ঘরে ফিরব না—আমার ও গতজীবন শেষ হল—আমাকে আজ নবজীবনের দীক্ষা দিন—

শঙ্কর বিস্মিত বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে জামেলার মুখের দিকে চাহিল। এ রাত্রি-জাগরণ-ক্লিষ্টা নারীর মুখ কি বেদনার আভা-মণ্ডিত!

জামেলা একটু উদ্দীপ্ত সুরে বলিল—আমার বাড়ী ঘর, আমার সুখ সম্পদ, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—আমি পাপভারাক্রান্তা অনাথিনী গৃহহারা আপনার কাছে এসেছি—

পুঁথিগুলির দিকে চাহিয়া শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, তাহার জীবনে যেন কোন নবশক্তির আবির্ভাব হইতেছে। ধীরে সে বলিল, পারবে তুমি, সব সুখ সম্পদ ছেড়ে থাকতে পারবে?

পারবো আমি পারবো—

এসো আমার সঙ্গে।

দরজায় কাহার ছায়া পড়িতে দু'জনেই চমকিয়া উঠিল। নাদিরের কোন সৈন্য ভাবিয়া শঙ্কর তাহার দিকে ছুটিয়া গেল। কিন্তু সৈন্যটি স্থির দাঁড়াইয়া নতশিরে বলিল, আমি, আমি আলি মহম্মদ—

তাহার দিকে চাহিয়া জামেলার বুক একটু দুলিয়া উঠিল, সে আপনাকে দমন করিয়া শঙ্করের পায়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরীন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

কোনও কোনও ব্যাধির প্রতিষেধক হিসাবে পশুর রক্তের প্রয়োজন হয়। সম্প্রতি আমেরিকায় একটি হাসপাতালে দুইটি অশ্বের শরীর থেকে প্রতিষেধক হিসাবে রক্ত লওয়া হচ্ছে। অশ্ব দুটির নাম চার্লি ও জিম।

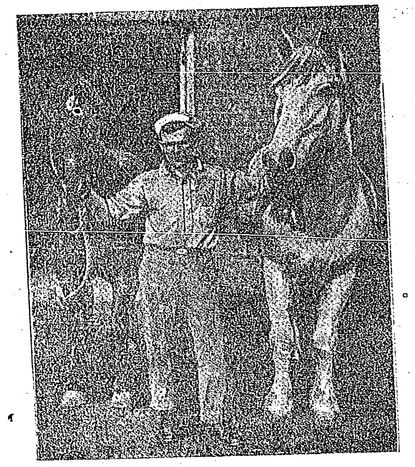

চার্লি ও জিম

চার্লি ও জিমের শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট; আর তাদের রক্তও প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহারের খুব উপযুক্ত। ছয় বৎসর ধ'রে তারা ক্রমাগত রোগীদের রক্ত সরবরাহ ক'রে আস্‌ছে বটে, কিন্তু সেজন্য তাদের কিছুমাত্র স্বাস্থ্যহানি ঘটেনি।

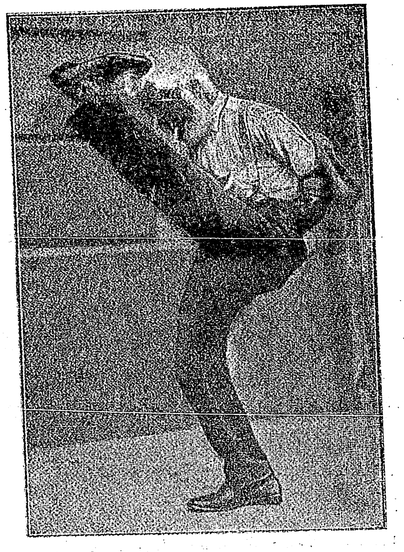

টম ওঙ্কো

পদব্রজে নানা দেশ ভ্রমণ করে টম ওঙ্কো প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর বয়স এখন ৭০ বৎসর। তিনি এখনও অনায়াসে তাঁর যে কোনও পা তুলে নিজের মাথায় ঠেকাতে পারেন। তিনি বলেন যে তিনি এখনও প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম অভ্যাস করেন; সেইজন্য তিনি এই বয়সেও ঐরূপ অসাধ্য কাজ করতে পারেন। তাঁহার যখন ৪০ বৎসর বয়স সেই সময়ে তিনি সমস্ত আমেরিকা পদব্রজে ভ্রমণ ক'রেছিলেন।

আমরা যে সব ঘড়ি ব্যবহার করি তার সাধারণতঃ দুটি বা তিনটি করে কাঁটা থাকে—একটি কাঁটা ঘণ্টা

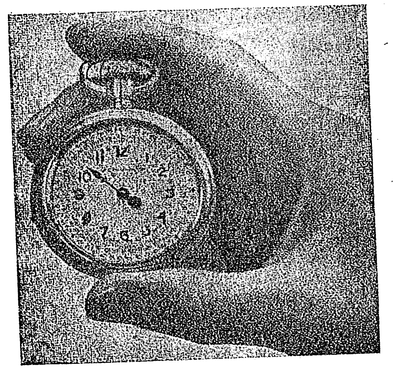

এক কাঁটার ঘড়ী

হিসাবে চলে। আর একটি কাঁটা মিনিট হিসাবে চলে। আবার ভাল ভাল ঘড়িতে আরও একটি কাঁটা অতিরিক্ত থাকে; সেটি সেকেণ্ড হিসাবে চলে।

সম্প্রতি একরকম ঘড়ি উদ্ভাবিত হয়েছে, যার কেবল একটি মাত্র কাঁটা। সেই ঘড়ি আবার একদমে ৪০ ঘণ্টার উপর চলে। ঘড়ির উপরকার সময়-লিখিত চাকতীখানিতে ঘণ্টা ও মিনিটের দাগ এমন ভাবে লিখিত আছে যে কাঁটাটি যখন যেখানেই থাক্ না কেন, ঘড়ি দেখবামাত্র বলা যেতে পারে যে, ক'টা বেজে ক'মিনিট হয়েছে।

বধিরের যন্ত্র

বধির লোকের সঙ্গে কথা ব'লতে আমাদের যতটা কষ্ট হয়, বধিরের মনে কিন্তু তার দশগুণ বেশী কষ্ট হয়। এই কষ্ট দূর কর্ব্বার জন্য এক রকম নতুন যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, তা বোধ হয় অনেকেই জানেন। এই যন্ত্রের কাজ হচ্ছে "অল্প আওয়াজকে খুব বেশী ক'রে শোনানো।" কিন্তু বধিরদের ব্যবহারের জন্য একটি নূতন "শ্রবণ" যন্ত্র তৈরী হয়েছে, সেটি এত ছোট যে, অনায়াসে একটি ছড়ির হাতলে আট্‌কে রাখা যেতে পারে। বধিরের যখনই কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলবার দরকার হয়, সে কথা বল্‌তে বল্‌তে লাঠির হাতলটি কাণের কাছে এমনভাবে নিয়ে আসে, যাতে তার সঙ্গীরা তার দুর্ব্বলতা আদৌ বুঝ্‌তে না পারে, অথচ সে তাদের কথা খুব ভাল ক'রে শুন্তে পায়। এতে বধিরতার লজ্জা তাকে মর্ম্মপীড়া দিতে পারে না এবং বক্তারও চীৎকার করে কথা কইবার দরকার হয় না।

টেলিফোন যন্ত্রে একজন লোকের সঙ্গে কথা বল্‌তে হ'লে তা শোনবার জন্যে টেলিফোনের অপরপ্রান্তে আর একজন লোকের থাকা দরকার। কিন্তু কিছুদিন হ'ল আমেরিকায় "টেলিগ্রাফোন" বলে একরকম যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, যাতে কথা বলবার সময় টেলিফোনের অপর প্রান্তে কোনও লোকের থাকবার দরকার নাই। সেই যন্ত্রে নিজের বক্তব্য বলে গেলে পর সেটা আপনিই লিপিবদ্ধ হয়ে যায় এবং উদ্দিষ্ট লোকে যখন ইচ্ছা এসে সেটা কাণে দিলেই বক্তার সব কথা শুন্‌তে পাবে। টেলিগ্রাফোন যন্ত্রে কোনও কথা বলবার আর সেই বক্তব্যটির ধ্বনি খুব বেশী জোরে বাড়াবার দুটি

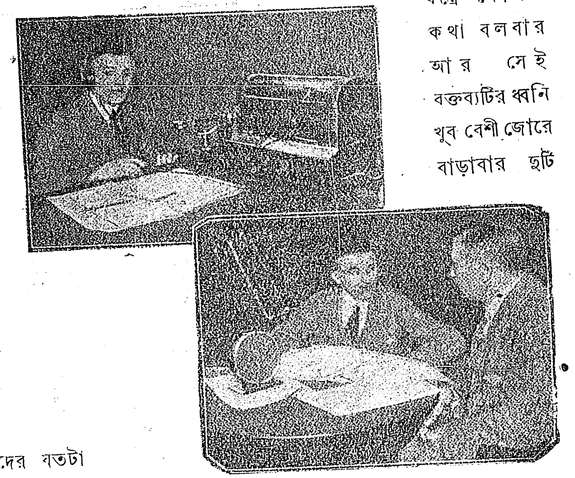

টেলিগ্রাফোন্

পৃথক যন্ত্র আছে। কেউ যখন টেলিফোন করে, "বক্তব্যের" যন্ত্রটি কথাগুলি ধরে রাখে; আর যে লোকটির কথা শুনবার দরকার সে এসে যখন দ্বিতীয় যন্ত্রটি চালিয়ে দেয়, বক্তার সব কথাগুলি তখন প্রথম যন্ত্র থেকে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্ত হ'তে থাকে।

যক্ষ্মার বিষ যে প্রত্যেক লোকেরই দেহের ভিতর আছে, ডাঃ ফর্ণেট সেটা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক লোকের দেহের ভিতরে যে স্তরে চর্ব্বি আছে, সেই চর্ব্বির স্তরের মধ্যে যক্ষ্মার বীজাণু সর্ব্বদা গুপ্তভাবে থাকে। ডাঃ ফর্ণেট "ইথার বাষ্পের" দ্বারা

যক্ষ্মার বীজাণু পরীক্ষা

সেই চর্ব্বি গলিয়ে তার অভ্যন্তরস্থ যক্ষ্মার জীবাণু সকলকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক ও প্রবীণ স্বাস্থ্যানুসন্ধিৎসুর মত যে "কফি" দেহের পক্ষে অত্যন্ত অনুপকারী। কিন্তু ডাঃ প্রেস্‌কট খরগোস, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি পশুদের উপর অনেক পরীক্ষার পর প্রমাণ করেছেন যে কফি দেহের পক্ষে অনুপকারী ত নয়ই বরং বিশেষ উপকারী। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে কফি শরীরকে উত্তেজিত করে সমস্ত ক্লান্তি দূর ক'রে দেয়। দ্বিতীয়তঃ কফি হৃৎপিণ্ডের কাজ অল্প বাড়িয়ে শরীর বেশ গরম করে রাখে। অন্যান্য উত্তেজক ঔষধের মত কফি কিয়ৎক্ষণ পরেই দেহে অবসাদ আনয়ন করে না।

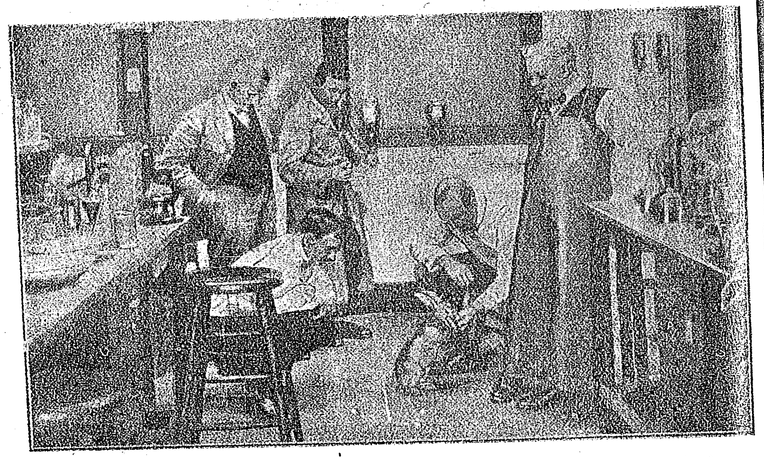

কফির উপকারিতা—(শশকের শরীরে কফি প্রভাব কতখানি তাহাই পরীক্ষা ক'রে দেখা হচ্ছে।)

ক্ষৌর কর্ব্বার সময় আয়নার চিবুকটি বেশ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত না হ'লে কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হয় না; অনেক সময়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। এই অসুবিধা ভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে অনেকে বিরক্ত হয়ে নিজে ক্ষৌর কার্য্য করা অভ্যাস একেবারে ত্যাগ ক'রেছেন। কিছুদিন থেকে এক রকম বিলাতি আয়নার আমদানী হচ্ছে, যা'র তলার দিকে একটি বৈদ্যুতিক বাতি আটকান আছে। বাতিটি এরূপ ভাবে

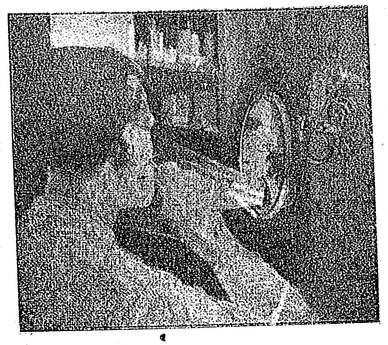

তাড়িত দীপ সংযুক্ত ক্ষৌর দর্পণ

এমন স্থানে আটকান যা'তে কেবলমাত্র চিবুকটি আলোকিত হয় অথচ চোখে কিছুমাত্র লাগে না। সুতরাং এখন থেকে স্বয়ং ক্ষৌর কার্য্য কর্‌তে আর কাউকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হবে না।

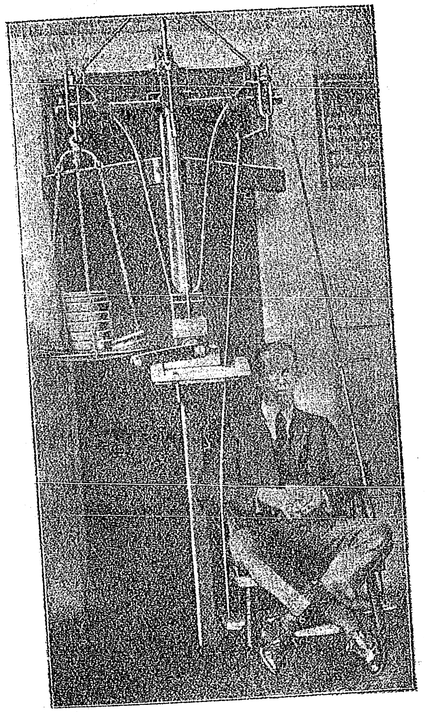

দেহের ক্ষয়

আমাদের দেহ যে প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, সেই সাংঘাতিক ব্যাপারটা কার্ণেজি বিদ্যালয়ের একজন বৈজ্ঞানিক একটি যন্ত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন একটি লোকের দেহের ওজন নেবার পর যদি আবার পাঁচ মিনিট পরেই আর একবার তার ওজন নেওয়া যায় তাহ'লে দেখা যাবে যে লোকটী ওজনে অনেক কমে গিয়েছে। তিনি বলেন এই ক্ষয়ের কারণ হচ্ছে শরীর যে সকল রাসায়নিক উপাদানে তৈরী সেগুলি প্রতিমুহূর্ত্তে ক্ষয় হয়ে যায় বলে।

রূপদর্পণ

আমেরিকায় সম্প্রতি "রূপদর্পণ" নাম দিয়ে এক-রকম আরসী তৈরী হচ্ছে; সেই মুকুরে আপনার সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখবার পক্ষে সুন্দরীদের ভারী সুবিধা হয়। আরসীখানির একটি হাতল আর তার উপরে পাশাপাশি ভাবে সাজান তিনখানি আয়না। সুন্দরীদের প্রসাধনের যা কিছু ভুলচুক সবই সেই ত্রিশিরা আরসীর সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে—এমন কি তাঁদের মাথার পিছন দিক্‌কার কবরী কিরূপভাবে সাজান আছে ও গ্রীবার পশ্চাৎভাগে কতটা পাউডার লেগেছে বা লাগবে সেটুকুও স্পষ্ট ধরা যায়।

আমাদের দেশে ব্যবসায়ীরা গরুর গাড়ী বা মোটরলরী বা মুটে মারফৎ মালপত্র ক্রেতাগণের কাছে সরবরাহ করে। কিন্তু সেই ব্যবস্থাটা যেমন ব্যয়সাপেক্ষ তেমনি সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আমেরিকার একজন ব্যবসাদার ফারার (Farrar) সাহেব তাঁর নিজের মোটর সাইকেলে মাল নিয়ে খরিদ্দারদের সরবরাহ করে দেখিয়েছেন যে, এইরূপ ব্যবস্থায় অর্থ ও সময় উভয়দিক দিয়েই লাভবান হওয়া যায়।

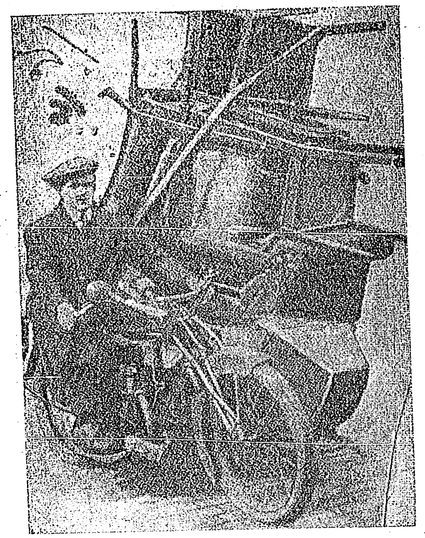

মোটর সাইকেলে মাল সরবরাহ

আজকাল হাতঘড়ির ব্যবহার খুব প্রচলিত হয়েছে কিন্তু খুব কম হাতঘড়িই ঠিক মত সময় নিরূপণ করে। সখনই ঘড়ি ঠিকমত সময় নিরূপণ করতে পারে না, লোকে মনে করে যে তার ঘড়ি খারাপ হয়ে গেছে, না হয় ঘড়িতে তৈল দেওয়ার প্রয়োজন ইত্যাদি। কিন্তু ঘড়ি কেন যে খারাপ হয় সেটা কেউই বুঝেন না বা বুঝতে চেষ্টা

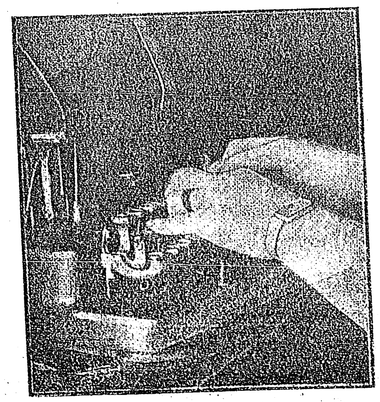

টাইপের কাজের সময় হাতঘড়ী ব্যবহার করা উচিত নয়

করেন না। তাঁরা যদি ঠিক নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে তাঁদের ঘড়ি অতি সুন্দর ভাবে সময় নিরূপণ কর্চ্ছে। নিয়মগুলি এই :—

ক। ঘড়ি কেনবার সময় বিশেষ ক'রে দেখে নেবেন যে ঘড়ি ঠিক নিয়মিতভাবে চল্‌ছে কি না? খ। ঘড়িতে যখন দম দিবেন খুব ধীরে ধীরে যেন দম দেওয়া হয়। দম দেবার সময় ঘড়িটি যেন হাত থেকে না পড়ে যায়। হাত থেকে ঘড়ি পড়ে গেলে আর কিছুতেই সে ঠিক থাক্‌বে না।

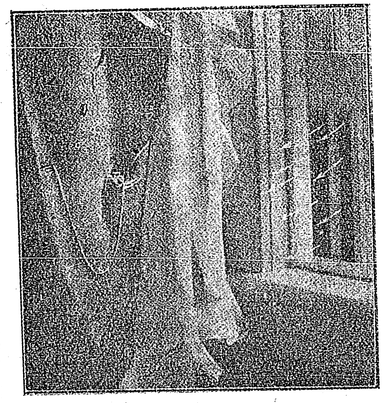

জানালার ধারে আনলায় রক্ষিত জামার পকেটে ঘড়ী রাখা উচিত নয়

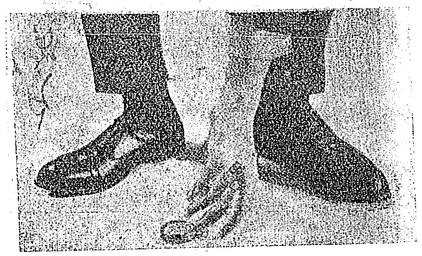

মাটিতে পড়িয়া যাওয়া ঘড়ীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর

গ। বৎসরে একবার করে ঘড়িতে তেল দেবেন। ঘ। যখন কোনও কাজ কর্ব্বেন ঘড়িটি হাত থেকে খুলে টেবিলের উপর রেখে কাজ করবেন। ঙ। ঠাণ্ডা বা খোলা জায়গায় কখনও যেন ঘড়ি না রাখা হয়; তা'হলে ঘড়িতে শীঘ্র মর্‌চে পড়ে। চ। রাস্তার মাঝখানে বা যেখানে খুব ধুলো এরূপ স্থানে যেন ঘড়ির কলকব্জা খোলা না হয়। ছ। বন্ধ করবার সময় ঘড়ির মাঝখান যেন টেপা না হয়—একটা ধারের দিক টিপে দিলেই ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। জ। রাস্তায় চলবার সময় ঘড়ির মুখ যেন দেহের দিকে থাকে তা'হলে নষ্ট হ'বার খুব কম সম্ভাবনা।

শোক-সংবাদ

আজ বাঙ্গলার বড় দুর্দ্দিন; তিন দিনের ব্যবধানে ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বাঙ্গালার দুই ইন্দ্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গলার দুই সার বিনা মেঘে বজ্রপাতে বঙ্গদেশ বিমূঢ়, স্তম্ভিত আশুতোষ বাঙ্গলা দেশ অন্ধকার করিয়া অমর- হইয়াছে।

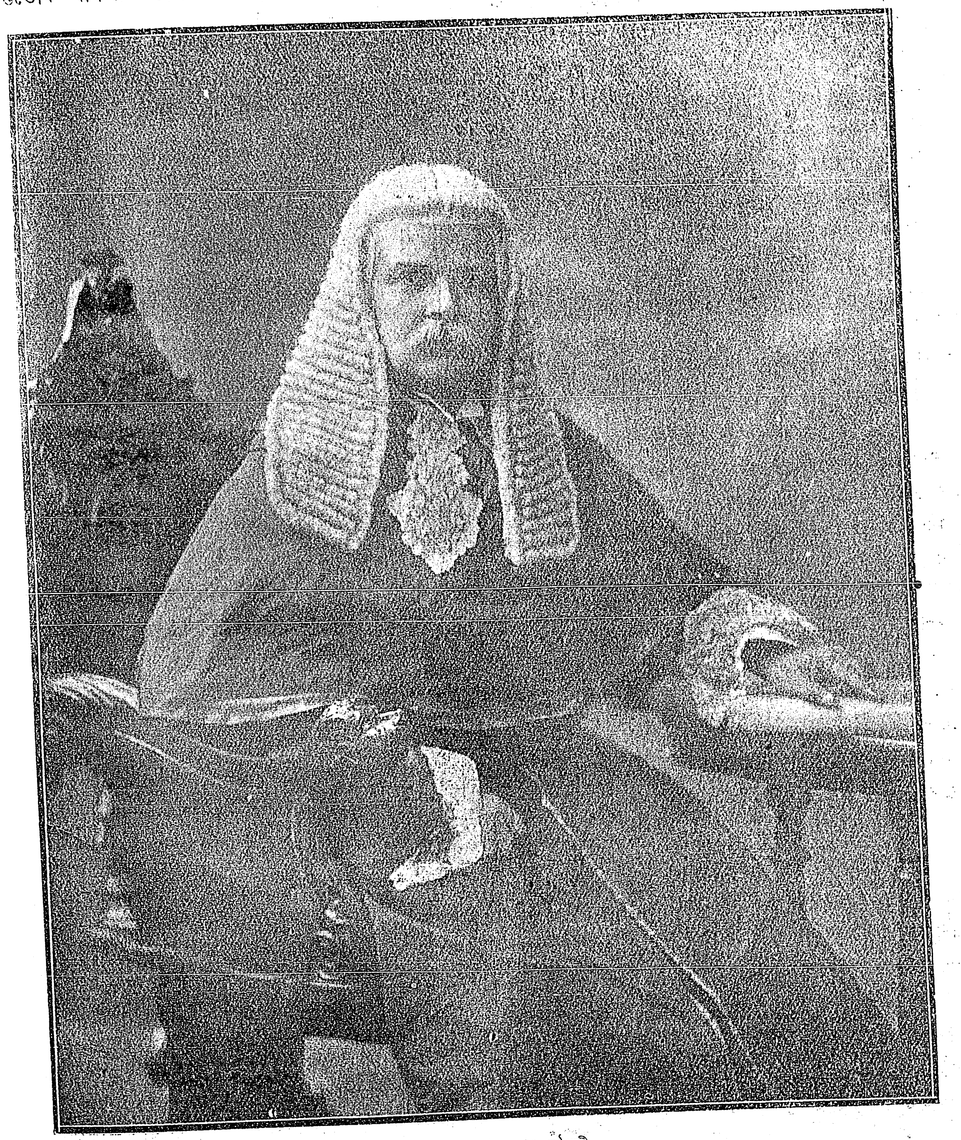

৺সার আশুতোষ চৌধুরী

৺সার আশুতোষ চৌধুরী

বিগত ২৩এ মে শুক্রবার প্রাতঃকালে বালিগঞ্জ সার্নিপার্কে চৌধুরী-ভবনে বাঙ্গলার বরেণ্য জননেতা, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, প্রথিতযশা ব্যবহারাজীব সার আশুতোষ চৌধুরী লোকান্তরিত হইয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া পীড়িত ছিলেন বটে, কিন্তু পীড়া যে খুব সাংঘাতিক হইয়াছিল, এমন কোন সংবাদ পূর্ব্বাহ্ণে সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নাই; সেজন্য জনসাধারণ তাঁহার পরলোক গমন সংবাদ শুনিবার প্রত্যাশা করে নাই, এবং সেজন্য প্রস্তুত হইবারও অবসর পায় নাই। আর, সে অবসরও ছিল না,—হৃদয়ের স্পন্দন রহিত হইয়া সহসা তাঁহার মৃত্যু হয়। শনিবার প্রাতঃকালে সংবাদপত্রে তাঁহার লোকান্তর-গমন সংবাদ শুনিয়া জনসাধারণ স্তম্ভিত হয়।

চৌধুরী মহাশয়ের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহযোগী হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ, প্রধান বিচারপতি মহোদয়, ব্যবহারাজীবগণ এবং বহু আত্মীয়-স্বজন শবানুগমন করিয়াছিলেন। কালীঘাটের শ্মশানে যথারীতি তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

স্বর্গীয় চৌধুরী মহাশয় প্রতিভার অবতার ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করেন। তিন বৎসর পরে গণিতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস অনার্স প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন। তাহার দুই বৎসর পরে সম্মানের সহিত ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তিনি অচিরে ব্যবহারাজীবগণের শীর্ষস্থানে অবস্থিত হ'ন। ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন তাঁহার জীবনের একমাত্র, কিম্বা প্রধান লক্ষ্য ছিল না। কর্ম্মক্ষেত্রে অমিত পরিশ্রমের পরও তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম ও সুকুমার-কলার চর্চ্চা করিতেন। তিনি স্বয়ং যেরূপ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন, গুণিগণের তদ্রূপ সমাদর করিতেন। তাঁহার ও তদীয় পত্নী পরলোকগতা প্রতিভা দেবীর আমন্ত্রণে প্রায়ই তাঁহাদের বালিগঞ্জস্থিত ভবনে সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতানুরাগী গুণিগণের সম্মিলন হইত। সঙ্গীত শাস্ত্রের যথোচিত আলোচনার জন্য তাঁহাদের উদ্যোগে একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মিলনে তিনি সভাপতির পদে বৃত হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনে তিনি কায়মনোবাক্যে যোগদান করেন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদেরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, এবং জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি পরিষদের সভাপতির পদে সমাসীন থাকিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে সফলতা-মণ্ডিত করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তাহার পূর্ব্ব বৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আইন ব্যবসায়ে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বিচারকের পদে সমাসীন থাকিয়া সুবিচার বিতরণেও তিনি তদ্রূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সুবিচারে অর্থী প্রত্যর্থী সকলেই সন্তোষ লাভ করিতেন—কাহারও ক্ষোভের কোন কারণ ঘটিত না।

সার আশুতোষ চৌধুরী মহৎ বংশের সন্তান। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন পাবনা জেলায় হরিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দুর্গাদাস চৌধুরী রাজসাহী জেলার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। সার আশুতোষ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র; তাঁহার পরে তাঁহার আরও ছয়টি ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন।

কর্ম্মজীবনে সার আশুতোষ যেরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন, সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনেও তিনি তদ্রূপ জনপ্রিয় ছিলেন। আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী সার আশুতোষ বিনয়ের অবতার। তাঁহার অমায়িকতা, বন্ধু-বাৎসল্য, সরলতা, অহমিকাশূন্যতা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করিয়া আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতাম।

দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী প্রতিভা দেবী পরলোকে গমন করিলে পত্নী-বৎসল আশুতোষ বিশেষ মর্ম্ম-পীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচটি সন্তান বর্ত্তমান। তন্মধ্যে চারিটী পুত্র ও একটী কন্যা। আমরা সার আশুতোষের

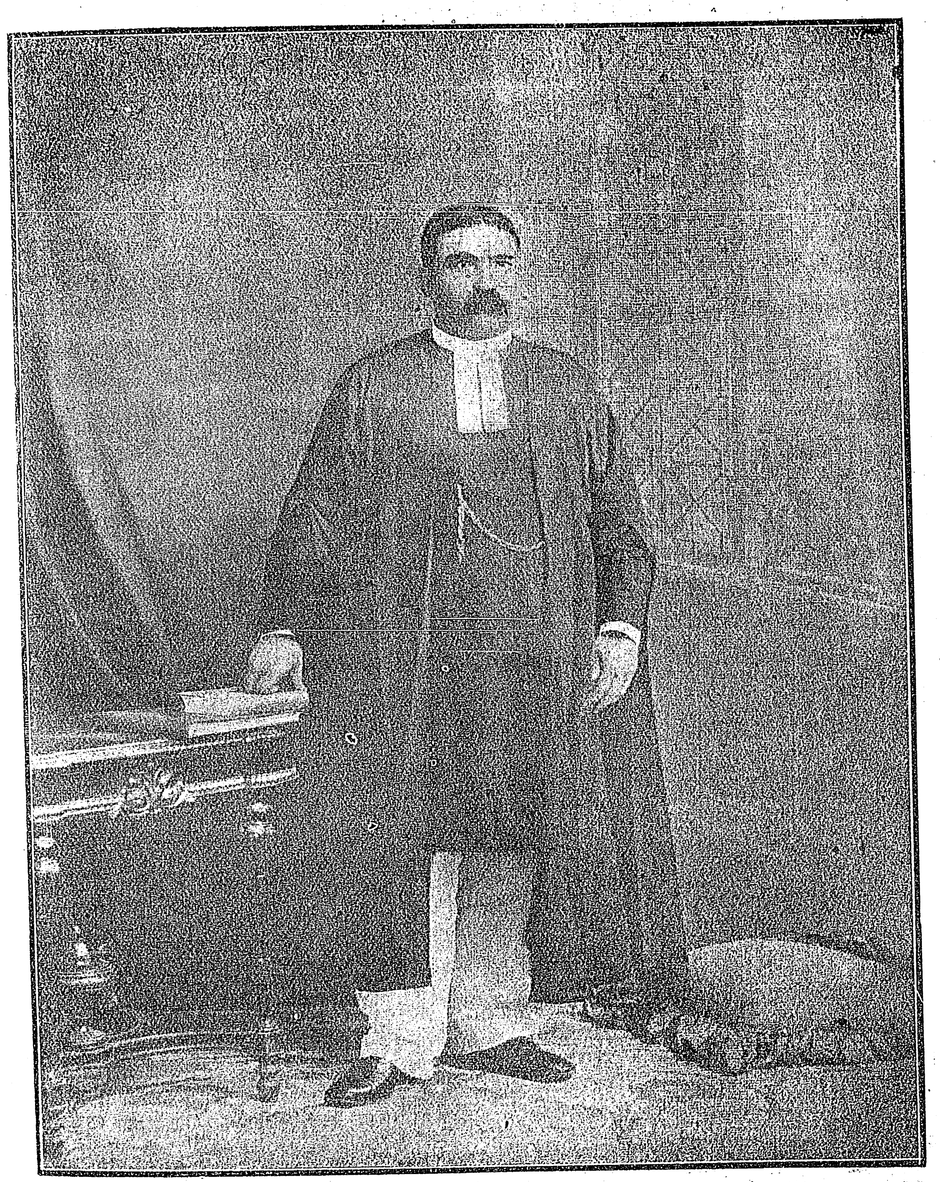

৺সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পরিবারবৃন্দের শোকে আমাদের অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মত ও পন্থা বিভিন্ন হইলেও সার আশুতোষ চৌধুরীর স্বদেশানুরাগ কাহারও অপেক্ষা অল্প ছিল না। বঙ্গ-ভাষারও তিনি একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। সমাজ সংস্কারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডি-কেটের সদস্যরূপে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকরূপে তিনি বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। সেই সৌম্যমূর্ত্তি, প্রিয়দর্শন, সুপুরুষ, বন্ধুবৎসল, অমায়িক, মিষ্ট-ভাষী বাঙ্গলার সুসন্তানের বিয়োগে বাঙ্গলা মায়ের ক্রোড় যে শূন্য হইল, সেই শূন্য স্থান আর কেহ যে সহজে পূর্ণ করিতে পারিবেন, এমন বোধ হয় না। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

৺সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! সার আশুতোষ চৌধুরীর আকস্মিক তিরোধানে স্তব্ধ, স্তম্ভিত, বিস্মিত বাঙ্গালীর মোহ-ঘোর কাটিতে না কাটিতে ২৬এ মে সোমবার প্রাতঃকালে সুপ্তোত্থিত বাঙ্গালী শুনিল, পাটলীপুত্র নগরে ২৫এ মে রবিবার সন্ধ্যাকালে বাঙ্গালার অদ্বিতীয় পুরুষসিংহ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাপ্রস্থান করিয়াছেন; স্পেশিয়াল ট্রেণে তাঁহার শবদেহ পাটনা হইতে কলিকাতায় আসিতেছে। তড়িৎবেগে এই সংবাদ কলিকাতায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অমনি সহর শুদ্ধ লোক হাবড়া ষ্টেসনের দিকে ছুটিল—সার আশুতোষকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য।

বাঙ্গলার দুইজন মনীষীর অপ্রত্যাশিত আকস্মিক লোকান্তর গমনের সংবাদে জনসাধারণ যতটা না বিস্মিত হইয়াছিল, ততোধিক বিস্মিত হইয়াছিল উভয়ের অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখিয়া। উভয়েই আশুতোষ, (এবং উভয়েই সার্থকনামা), উভয়েই একই রাজদত্ত (সার) উপাধি-ভূষিত, উভয়েরই মনীষা প্রায় সমতুল্য, গণিত শাস্ত্রে উভয়ের অসামান্য কৃতিত্ব, উভয়েই হাইকোর্টের যশস্বী ব্যবহারাজীব ও বিচারপতি, উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য, দুইজনেই educationists, উভয়েই সম্মানভাজন জননেতা, এবং দুইজনেই কাউন্সিলের সদস্য। আর তাঁহারা উভয়েই কি না তিন দিনের অগ্র-পশ্চাতে বাঙ্গলা দেশকে অন্ধকার করিয়া, বাঙ্গালীজাতিকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রয়াণ করিলেন!

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নশ্বর-দেহ স্পেশিয়াল ট্রেণে নির্দ্ধারিত সময়ের ঘণ্টা দুই পরে হাবড়া ষ্টেসনে পৌছিয়াছিল। বিশাল সাগরবৎ জনসঙ্ঘ ধীর স্থির স্তব্ধ ভাবে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ধৈর্য্য সহকারে প্রতীক্ষা করিয়াছিল। তার পর সময়োচিত ভাবাবেগে নীরবে শবানুগমন করিয়া বেলা তিনটার সময় কালীঘাটে যেখানে তিন দিন পূর্ব্বে চৌধুরী মহাশয়ের নশ্বর দেহ ভস্মে পরিণত হইয়াছিল, সেই শ্মশান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। মুখো-পাধ্যায় মহাশয়েরও পাঞ্চভৌতিক দেহ সেইখানেই পঞ্চভূতে মিশ্রিত হয়। পথি মধ্যে হ্যারিসন রোড বাহিয়া সেই বিরাট বপু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বারাণ্ডায় আনিয়া অর্দ্ধঘণ্টাকাল রক্ষিত হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, পশ্চিমা, নাখোদা, ভাটিয়া, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত,—সর্ব্বশ্রেণীর, সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের লোক সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি শেষ সম্মান-প্রদর্শনের জন্য হাবড়া ষ্টেসন হইতে ৺কালীঘাট পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। সহরের প্রায় সমস্ত দোকান পাট, আপিস আদালত, বিদ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কাহাকেও অনুরোধ, উপরোধ করিতে হয় নাই; সকলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সার আশুতোষকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। বাঙ্গালী গুণের আদর করিতে শিখিয়াছে, প্রতিভার সমাদর করিতে শিখিয়াছে, সম্মানভাজনকে জাতীয় ভাবে সম্মান প্রদান করিতে শিখিয়াছে—দেশাত্ম-বোধের সম্যক পরিচয় দিয়াছে।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনা বাঙ্গলার বাহিরে প্রবাসে সংঘটিত হইলেও মা বঙ্গ-জননী তাঁহার প্রিয়তম সন্তানকে শেষবার বক্ষে ধারণ করিতে বঞ্চিতা হন নাই। গঙ্গা-তীরবাসী সার আশুতোষের চিতাভস্ম বক্ষে ধারণ করিয়া জননী জাহ্নবীও ধন্যা হইয়াছেন। ৺কালীঘাটের মহা-শ্মশান বাঙ্গালীর মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

সার আশুতোষ একমেবাদ্বিতীয়ম্—সমগ্র ভারতে

দ্বিতীয় সার আশুতোষ নাই, এবং বোধ হয় কখনও হইবেও না। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি যে অপূর্ব্ব মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার পক্ষেই স্বপ্ন হইয়াছিল। গণিতের কূট প্রশ্নসমূহের সুমীমাংসা করিয়া যে সকল প্রবন্ধ তিনি বিলাতী গণিত বিষয়ক সাময়িক পত্রসমূহে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইতেন, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষার পরিচয় পাইয়া লণ্ডনের ম্যাথেম্যাটিক্যাল সোসাইটি, রয়েল এ্যাষ্ট্রনমিক্যাল সোসাইটী, ও রয়েল সোসাইটী ছাত্র আশুতোষকে ঐ সকল সমিতির সদস্য পদে বরণ করিয়া লন। তাঁহার প্রতিভাচ্ছটা ছাত্রাবস্থাতেই চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল; শিক্ষা সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই শিক্ষা-বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

সার আশুতোষের ছাত্র-জীবন যেমন প্রতিভা-মণ্ডিত, আইন ব্যবসায়েও তিনি তদ্রূপ অচিরে যশঃ অর্জ্জন করেন। তার পর হাইকোর্টের বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া তিনি সুবিচার বিতরণ করিয়া যেরূপ কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দেন, তাহার ফলে তিনি একাধিকবার কিছুদিন করিয়া হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গত-প্রাণ সার আশুতোষের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। অপর কেহ তাঁহার ন্যায় সুদীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারের পদে কার্য্য করেন নাই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এমন অখণ্ড ভাবে মিলিত হইয়া-ছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে সার আশুতোষ, এবং সার আশুতোষ বলিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বুঝাইত। দিবাভাগে মার্ত্তণ্ডের উজ্জ্বল প্রভায় তারকা-নক্ষত্রগণ যেরূপ অদৃশ্য থাকে,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার আশুতোষের কাছে অপর সকলেই সেইরূপ ম্লান, অদৃশ্য হইয়া পড়িতেন। তাঁহার ন্যায় অননুকরণীয় প্রতিভাও যেমন কাহারও ছিল না, সেইরূপ তাঁহার ন্যায় অদম্য কর্ম্মশক্তিও কাহারও ছিল না; সেইজন্য তাঁহার অতি প্রবল ইচ্ছা-শক্তির কাছে সকলকেই মস্তক নত করিতে হইত—তাঁহার ইচ্ছানুসারেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসি-তেন। বাঙ্গালী জাতির মনুষ্যত্বের উন্মেষের জন্য তাহাদের যেরূপ শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক, তদুপযোগী করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছিলেন; পাশ করিবার কল হইতে তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিলেন। দেশাত্মবোধ-প্রণোদিত হইয়া হাট কোট, চোগা চাপকানের স্থলে বিদ্যাসাগরের ন্যায় সার আশুতোষ সরস্বতী ধুতি চাদরের সম্মান বাড়াইয়া-ছিলেন। অনাদৃতা অনাথা বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারই চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা দান ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে মৌলিক গবেষণা সম্ভবপর হইয়াছে।

সার আশুতোষ সরস্বতী কেবল বাঙ্গালী নহেন,—তিনি ভারতবাসী। তিনি ভারতে অদ্বিতীয়—ভারতের গৌরবমুকুট তিনি; ভারত-জননীর কমনীয় কণ্ঠভূষাহারের তিনি দ্যুতিমান মধ্যমণি—মানবতার চরমোৎকর্ষের হিমাদ্রির অভ্রভেদী উন্নতশীর্ষ চূড়া তিনি—জাতীয়তার বিজয়কেতন তিনি—তেজস্বিতার অগ্নিগর্ভ বিসুভিয়স তিনি—বুদ্ধিতে তিনি বৃহস্পতি—মনস্বিতায় চাণক্য।—তাই আজ সার আশুতোষ সরস্বতীর বিয়োগে বঙ্গদেশে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে।

রাজা বনবিহারী কাপুর বাহাদুর

আমরা শোকসন্তপ্ত-চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, বর্দ্ধমানের স্বনামপ্রসিদ্ধ, সুধী রাজা বনবিহারী কাপুর বাহাদুর আর ইহজগতে নাই। বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় ৭১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজা-ধিরাজ বাহাদুর রাজা বনবিহারীর পুত্র। মহারাজাধিরাজ যখন নাবালক ছিলেন, তখন রাজা বনবিহারী বিশেষ দক্ষতার সহিত বর্দ্ধমানের বিস্তৃত জমিদারী পরিচালন করেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অমায়িক ও জমিদারী কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতি কমই দেখিতে পাওয়া

যায়। তিনি বাঙ্গালা কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন, বৃটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি নীরবে যে কত দুস্থ লোককে সাহায্য করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। যখন জেলা-বোর্ড-সমূহে বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যবস্থা হয়, তখন তাঁহাকে বর্দ্ধমানের জেলা-বোর্ডের ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়; কিন্তু তিনি সে পদ গ্রহণ করেন নাই; জেলা বোর্ডের সদস্য-ভাবেই জেলার উন্নতি কায়মনোবাক্যে সাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্দ্ধমানে যেবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়, সেবার রাজা বাহাদুরের আদর আপ্যায়নের, তাঁহার সৌজন্যের কথা বাঙ্গালার সাহিত্যসেবকগণ এখনও বিস্মৃত হন নাই; তাঁহার নিকট ধনী-দরিদ্র ছিল না; তিনি সকলকেই সমভাবে আদর যত্ন করিতেন; তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইত। আমরা স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের আত্মীয় স্বজনগণের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺রাজা বনবিহারী কাপুর বাহাদুর

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

১। চৈতন্যদেবের তিরোভাব

চৈতন্যদেব কিরূপে অপ্রকট হ'লেন? মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যতগুলি পুস্তক পড়িয়াছি, তাহাদের প্রায় প্রত্যেক বহিতেই লেখা আছে যে, তিনি নীলাচলে অবস্থান কালে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দারুময় মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া অদৃশ্য হইলেন। 'বেদবাণী' নামক একখানা বহিতে লেখা আছে যে, চৈতন্যদেব জ্বর রোগে মারা যান। এতদুভয়ের মধ্যে কোনটী সত্য বলিয়া মনে করিব? উক্ত 'বেদবাণী'র মহাশয় চৈতন্যদেবের জ্বর রোগে মৃত্যু সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জানাইলে বাধিত হইব। শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২। সঙ্গীত বিষয়ক প্রশ্নাবলি

১। (ক) রেখাব বর্জ্জিত, (খ) গান্ধার বর্জ্জিত, (গ) মধ্যম বর্জ্জিত, (ঘ) পঞ্চম বর্জ্জিত, (ঙ) ধৈবত বর্জ্জিত, (চ)

নিষাদ বর্জ্জিত, (ছ) রেখাব ও মধ্যম বর্জ্জিত, (জ) রেখাব ও পঞ্চম বর্জ্জিত, (ঝ) রেখাব ও ধৈবত বর্জ্জিত, (ঞ) রেখাব ও নিষাদ বর্জ্জিত, (ট) গান্ধার ও পঞ্চম বর্জ্জিত, (ঠ) গান্ধার ও ধৈবত বর্জ্জিত, (ড) গান্ধার ও নিষাদ বর্জ্জিত, (ঢ) মধ্যম ও ধৈবত বর্জ্জিত, (ণ) মধ্যম ও নিষাদ বর্জ্জিত, (ত) পঞ্চম ও নিষাদ বর্জ্জিত, কোন্ কোন্ রাগিণী আছে।

২। (ক) রেখাব ও গান্ধার বর্জ্জিত, (খ) গান্ধার ও মধ্যম বর্জ্জিত, (গ) মধ্যম ও পঞ্চম বর্জ্জিত, (ঘ) পঞ্চম ও ধৈবত বর্জ্জিত, (ঙ) ধৈবত ও নিষাদ বর্জ্জিত কোনও রাগিণী আছে কি না? থাকিলে, তাহাদের যথাক্রমে নাম কি কি?

৩। কোন্ কোন্ রাগরাগিণীতে (ক) কোমল ও শুদ্ধ রেখাব, (খ) কোমল ও শুদ্ধ গান্ধার (গ) শুদ্ধ ও কড়ি মধ্যম, (ঘ) কোমল ও শুদ্ধ ধৈবত (ঙ) কোমল ও শুদ্ধ নিষাদ উভয়ই ব্যবহৃত হয়?

৪। মূর্চ্ছনা কালে বিবাদীস্বর স্পর্শ না করিয়া চলে কি না? না করিলে রাগিণী ভ্রষ্টা হয় কি না?

৫। (ক) ভীম ও ভীমপলশ্রী (খ) ভূপ ও ভূপালী, (গ) যোগ ও যোগিয়া এইগুলি একই রাগিণীর নামান্তর কি না?

৬। এলচী, কসৌটী, কৌঁসিয়া, খমসা, খাটু, জলা (জিলা নহে), দারড়ী, নাতিয়া, নাত, পঞ্জী, ফাগ, সেতারখানি, মজমুয়া, ...কিয়া, মিঠাজহর, রসিয়া, সাবন, সুরমীর্জ্জা, সুরহীর, সেহড়া এগুলি রাগিণী, না তাল?

৭। হারমনিয়ামের "C" সুরে ষড়জ ধরিলে রেখাবাদি অবশিষ্ট-গুলির কোন্ কোন্ সুর হিন্দুস্থানী শুদ্ধ scaleএর সহিত পৃথক্ হইবে?

৮। তার যন্ত্রে তরব তিন চারি সেট করিয়া রাখিলে এবং শুদ্ধ স্বরের সহিত কোমল স্বরগুলিও তরবে বাঁধিলে ঝঙ্কারের অতি-প্রাচুর্য্য হেতু যন্ত্রে গৎ বাজাইতে বা আলাপ করিতে কোনও অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। শ্রীযামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী

৩। ছাত্রের জ্ঞাতব্য

(ক) জার্ম্মানীতে যেমন Indiche Nachrichten und information Bureau আছে, ইংলণ্ডে সেইরূপ বিদেশী ছাত্রদের আবশ্যক বিষয় জানিবার জন্য কোন information Bureau আছে কি না? থাকিলে উহার ঠিকানা কি?

(খ) ইংলণ্ডে A. T. S (Assistant Traffic Superintendentship) পড়িতে কত দিন সময় লাগে—কি খরচ পড়ে—কি কি গুণ আবশ্যক...বয়সের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে কি না... Art Studentরা প্রবেশ করিতে পারে কি না...Guaranteed Service কি না?

(গ) ইংলণ্ডে Chartered Accountantship পড়িতে কি কি গুণ আবশ্যক...কতদিন সময় লাগে...কোন টাকা জমা দিতে হয় কি না...খরচ আন্দাজ কত পড়ে...prospect কি?

(ঘ) ইংলণ্ডে Railway Economics বা Banking পড়িতে হইলে কতদিন সময় লাগে...খরচ কত পড়িতে পারে... ভর্ত্তির নিয়মকানুন কি...কোন সময় admission লইতে হয়... উন্নতির আশা কিরূপ?

(ঙ) Electrical & Mechanical Engineering ইংলণ্ডে পড়িতে হইলে কতদিন সময় লাগে...কত খরচ পড়ে...পড়িবার সময় allowance পাওয়া যায় কি না...ভর্ত্তির নিয়ম কি?

(চ) উপস্থিত ইংলণ্ডে একজনের কম পক্ষে থাকিতে কত খরচ পড়ে এবং উপরি উক্ত বিষয়গুলি আমেরিকা বা জার্ম্মাণীতে পড়া চলে কি না? কোন জিজ্ঞাসু

৪। স্বয়ংচালিত হল

১। বৈশাখের 'ভারতবর্ষে' যে 'স্বয়ংচালনোপযোগী হলে'র কথা বাহির হইয়াছে, উহার মূল্য কত এবং কোন্ ঠিকানায় পাওয়া যায়? উহার একটী আনাইতে হইলে ডাকমাশুল বা রেলভাড়া সমেত কত টাকার প্রয়োজন? শ্রীরসময় চৌধুরী, শ্রীরমেন্দ্রজয় ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅখিলচন্দ্র চৌধুরী

৫। X Ray Tube

(ক) X Ray Tube কত ছোট পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের কোথাও পাওয়া যায় কি না...দাম আন্দাজ কত।

(খ) Infra-range বা Infra-Red Ray'র গুণ কি এবং কি উপায়ে তৈয়ারি করা যায়।

(গ) কোনও মাসিকপত্রে দেখিয়াছিলাম যে Radio Receiving-set 'ম্যাচ-বক্সের' মত ছোট বাহির হইয়াছে, ইহা কি সত্য... তাহা হইলে, কোথায় পাওয়া যায় এবং দাম কত। শ্রীজীবনকৃষ্ণ আঢ্য

৬। বৃন্দাবনী কাপড়ের ছাপ

বৃন্দাবনের ছাপের কাপড়ে ও চাদরে যে কালীর ছাপ দেওয়া লতাপাতা ফুল থাকে—আধুনিক খদ্দরের শালেও দেখিতে পাই চারিদিকে সেইরূপ সুন্দর লতাপাতা ফুলের ছাপ দেওয়া হইয়া থাকে। এই সব ছাপ যে কালীতে দেওয়া হয় তাহার প্রস্তুত প্রণালী কি? শ্রীরাখালচন্দ্র রায়

উত্তর

পারদ জমাইবার প্রক্রিয়া

যতটুকু পারদ হইবে, ঠিক ততটুকু তুঁতিয়া আবশ্যক; অর্থাৎ উভয় দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া খলে স্থাপন পূর্ব্বক পেষণ করিতে হইবে। উত্তমরূপে পিষ্ট হইলে উহা যখন কর্দ্দমবৎ হইবে, তখন উহা দ্বারা যে কোন আকৃতি হউক প্রস্তুত করা যায়। অর্থাৎ ঘটী, পুতুল, গেলাস যাহা হউক তাহাই প্রস্তুত হইতে পারে।

শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চড়ক-পূজা

শাস্ত্রীয় উৎসব। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে শৈবগণ এই পূজা করিয়া থাকেন। সাধারণ কথায় ইহাকে কোন কোন স্থানে গাজন বলে। উক্ত সংক্রান্তিতে শৈবশ্রেষ্ঠ বাণরাজা দেবাদিদেব মহাদেবের প্রীতি কামনায় বন্ধুগণের সহিত শিবভক্তিসূচক নৃত্য-গীতাদিতে, ও ঢাক বাদ্যে প্রমত্ত হইয়া স্বীয় শরীরের রুধির দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করেন। সে অবধি (শৈবসম্প্রদায়) চৈত্রমাসে ও চৈত্র সংক্রান্তি দিনে মহাদেবের পরিতোষের নিমিত্ত উক্ত উৎসব করিয়া থাকেন! এই উৎসব চৈত্রমাসের ১ম দিন হইতে আরম্ভ হইয়া সংক্রান্তি দিনে সমাপ্ত হয়। এই চড়কোৎসবে চট্টগ্রাম, বরিশাল. ফরিদপুর, মেদিনীপুর, কলিকাতা, তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে প্রত্যহ শিবপূজা, শিবসঙ্গীত (শিবভক্তি-সূচক গান), হরগৌরী ও নানা প্রকার পুতুল সাজাইয়া প্রতি গ্রামে ভ্রমণ করাইয়া থাকে। যাহারা সন্ন্যাসগ্রহণে অক্ষম. তাহারা এই এক মাস গৈরিক বসন ধারণ, সংযম, নিয়ম, ব্রতপালন করিয়া সাধারণ সন্ন্যাসের ফললাভ করেন। চট্টগ্রাম, বরিশাল ও ফরিদপুরে শিবের পূজার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। চৈত্র সংক্রান্তিতে ঐ পদ্ধতি অনুসারে পূজা হইয়া গেলে পরে চড়কগাছ পুঁতিয়া তাহাতে পুতুল ঘুরানি হয়। পূর্ব্বে ঐ গাছে সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠদেশে লৌহশলাকার দ্বারা চর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া তাহাকে ঘুরান হইত। বর্ত্তমান রাজবিধানে প্রাণনাশের আশঙ্কায় তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণাপথের শৈব-তামিলগণ মহা সমারোহে এই সময়ে উক্ত উৎসব সম্পাদন করিয়া থাকে। তামিল ভাষায় ইহাকে "চেড্ডল" (চৈত্রোৎসব) বলে। এই উৎসবে অতি কঠোর ভক্তি ও সংযমসূচক বঁটীঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ, ঝুলঝাঁপ, শলাকাঝাঁপ, লৌহশলাকা দ্বারা জিহ্বা ও হস্তবেধ, ধূনার অগ্নিতে ঝাঁপ প্রভৃতি কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এখন সবগুলি নাই। এই বিষয়ে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ উত্তর খণ্ডের নবম খণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে।—

"চৈত্রে শিবোৎসবং কুর্য্যাৎ নৃত্যগীত মহোৎসবৈঃ।
স্নায়াৎ ত্রিসন্ধ্যং রাত্রৌ চ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগী শিবোৎসবপরায়ণঃ।
ভক্তে জাগরণং কুর্য্যাৎ রাত্রৌ-নৃত্য কুতূহলৈঃ॥

পৌরাণিক যুগ হইতে ইহা প্রচলিত আছে। চড়কের বিবরণ স্কন্দপুরাণেও বর্ণিত আছে।

বৈষ্ণবের সমাধি

আর্য্যজাতি একই পরমেশ্বরের উপাসনা শাক্ত, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া যে সময় হইতে করিতেছে, সেই পুরাকাল হইতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রানুসারে বৈষ্ণবের শব অগ্নিদাহ করাই উচিত। আধুনিক ভেকধারী বৈষ্ণব-গণকে যে মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হয়, তাহা সন্ন্যাসীগণের অনুকরণে,—ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ তাহা নয়। সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রকাশক শাস্ত্রে সন্ন্যাসী-গণের দাহ নিষিদ্ধ। তিনশত বৎসরের মধ্যেই ভেকধারীগণকে মাটিতে পুঁতিয়া রাখার প্রথা চলিত হইয়াছে; তাহা শাস্ত্র-সঙ্গত নয়।

লোকাচার

মাতা কখনও কন্যাকে পিত্রালয় হইতে আহার না করিয়া যাইতে দেয় না। শ্বশুরালয়ে যাইয়া সেদিনে পুনঃ আহার করিতে শাস্ত্রকার নিষেধ করিয়াছেন। কুলবালা ও কুলাঙ্গনাগণ পান এবং আহারাদিতে কখনও ঔৎকট্য দেখাইবে না। শ্বশুরালয়ে যাইয়া স্বীয় গৃহস্থালীর শুভচিন্তা করিবে; ভোগ অপেক্ষা ভোগ নিবৃত্তিই প্রশস্ত। ঋষি কণ্বের মুখ দিয়া কবিপ্রবর কালিদাস শকুন্তলার শ্বশুরালয় গমন সময়ে এই কথাই বাহির করাইয়াছেন, যথা—"ভোগেষনুৎসেকিনী"। বিবাহের পর বধূ-বিনয়নে গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি রক্ষার উপদেশ শাস্ত্রে আছে। ভোগলালসার তীব্রতা স্ত্রীধর্ম্ম নয়। স্ত্রীধর্ম্ম স্নেহ, দয়া, পাতিব্রত্য, সন্তানোৎপাদন ও পালন, কোমলতা, বিনয়, সহিষ্ণুতা, পরিজন-সেবা, স্বধর্ম্ম, গৃহস্থালী রক্ষা, গৃহশিল্পচর্চ্চা প্রভৃতি। নিম্ন-লিখিত প্রমাণটি আহার নিষেধ বিষয়ে মৎস্য সূক্তের জ্যোতিস্তত্ত্বে দেখা যায়, যথা—

"ভুক্ত পিতৃগৃহে কন্যা ভুঙ্ক্তে স্বামিগৃহে যদি।
দৌর্ভাগ্যং জায়তে তস্যাঃ শপন্তি কুলনায়িকাঃ॥"

পতিগৃহে গমনকালে স্ত্রী পিত্রালয়ে ভোজন করিয়া যদি পতিগৃহে ভোজন করে, তবে তাহার দুর্ভাগ্য হয় ও কুলঙ্গনাগণ তাহাকে শাপ দেন।

বরণডালা

হিন্দুগণ শুভ-বিবাহে ও অন্যান্য শুভ ধর্ম্মকার্য্যে বরণডালা (সংস্কৃত—ডল্লক) ব্যবহার করিয়া থাকে। বিবাহে বরের আগমন সময়ে ও দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা পূজা প্রভৃতিতে ইহা দ্বারা বরণ করা হয় বলিয়া ইহাকে "বরণডালা" বলে। বিবাহে স্ত্রী-আচারেও ইহার প্রয়োজন হয়। ইহার অপর নাম প্রশস্তি-পাত্র; ইহা দর্শনে ও পাত্রস্থিত পবিত্র দ্রব্যাদি ব্যবহারে শরীর, ইন্দ্রিয় মনের প্রীতিসাধন করিয়া সাত্ত্বিক বৃত্তির উদ্রেক করে। অধিবাসন কার্য্যেও বরণডালার আবশ্যক হয়। প্রশস্তগন্ধপুষ্পাদির দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যে কার্য্য করা হয়—শাস্ত্রে তাহাকে অধিবাসন নামে অভিহিত করিয়াছে। শ্রদ্ধা-প্রীতি সহকারে কাহাকেও সৎকার্য্যে নিয়োগ করার নাম, শাস্ত্রে "বরণ" বলিয়া উল্লিখিত আছে—যেমন বিবাহে বরের, যজ্ঞাদিতে পুরোহিতের। উক্ত ডালায় যে সকল পবিত্র দ্রব্য থাকে, সেগুলি এই—মহী (গঙ্গা মৃত্তিকা), গন্ধ, শিলা (নুড়ি), ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল (অখণ্ড কলাছড়া), দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলী নির্ম্মিত), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা (হরিদ্রা), কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, সিদ্ধার্থ (শ্বেত সর্ষপ), দর্পণ, অলক্ত, হরিদ্রা-সূত্র, লৌহচামর, দীপ। দুর্গোৎসবে দশমী দিনে দেবী বিসর্জ্জনের পর শান্তিদান সময়ে উক্ত প্রশস্ত পাত্রের প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা মন্ত্রউচ্চারণপূর্ব্বক সপরিবার যজমানের মস্তকে স্পর্শ করা বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে নিয়ম আছে। উহা যাত্রাকালে দর্শন করাও শুভজনক, যেহেতু তাহাতে শুভ ও পবিত্র দ্রব্য সকল থাকে। সে সকল দ্রব্য শরীর, ইন্দ্রিয় মনের প্রসাধন ও শক্তির উন্মেষক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী

নব-বিধান

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০

সকালে ঘুম ভাঙিয়া শৈলেশের প্রথমেই মনে হইল সারা-রাত্রি ধরিয়া সে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল ঊষা নিত্য-নিয়মিত গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা;—সোমেন সঙ্গে, বোধ হয় সে খাবার তাগাদায় আছে,—সিঁড়িতে নামিবার পথে দেখা হইতে ঊষা মুখ তুলিয়া কহিল, তোমার চা তৈরি ক'রে ফেলেচে, মুখ-হাত ধুতে দেরি করলে সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে কিন্তু। একটু তাড়াতাড়ি নিয়ো।

শৈলেশ কহিল, বেশ ত, তুমি পাঠিয়ে দাও গে, আমার এক মিনিট দেরি হবে না। এই বলিয়া সে যেন লাফাইতে লাফাইতে গিয়া তাহার বাথ-রুমে প্রবেশ করিল। মনে মনে কহিল, আচ্ছা ইডিয়ট্ আমি। দাম্পত্য-কলহের যুদ্ধ-ঘোষণাকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা জ্ঞান করিয়া রাত্রিটা যে তাহার অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে, সকাল বেলায় এই কথা মনে করিয়া শুদ্ধ তাহার হাসি পাইল তাই নয়, নিজের কাছে লজ্জা বোধ হইল। সংসার করিতে একটা মত-ভেদ বা দুটা কথা-কাটাকাটি হইলেই স্ত্রী যদি স্বামীগৃহ ছাড়িয়া দাদার ঘরে গিয়া আশ্রয় লইত, দুনিয়ায় ত তা' হইলে মানুষ বলিয়া আর কোন জীবই থাকিত না! সোমেনের-মা হইলেও বা দু'দশ দিনের জন্য ভয় ছিল, কিন্তু ঊষার মত নিছক হিন্দু-আদর্শে-গড়া স্ত্রী,—ধর্ম্ম ও স্বামী ভিন্ন সংসারে আর যাহার কোন চিন্তাই নাই, সে যদি তাহার একটা রাগের কথাকেই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারকে ছাড়াইয়া যাইতে দেয়, তা' হইলে সংসারে আর বাকি থাকে কি? এবং এ লইয়া ব্যস্ত হওয়ার বেশি পাগ্‌লামিই বা কি আছে, ইহাই অসংশয়ে উপলব্ধি করিয়া তাহার ভয় ও ভাবনা মুছিয়া গিয়া হৃদয় শান্তি ও প্রীতির রসে ভরিয়া উঠিল! এবং ঠিক ইচ্ছা না করিয়াও সে ঊষার সঙ্গে বিভার ও তাহাদের শিক্ষিত সমাজের আরও দুই চারি জন মহিলার মনে মনে তুলনা করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক, বাবা, আর কাজ নেই, আমার নিজের মেয়ে যদি কখনও হয় ত সে যেন তার মায়ের মতই হয়। এমনি ধারা শিক্ষা দীক্ষা পেলেই আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দেব। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নব-নিযুক্ত মুসলমান খানসামা চা, রুটি, মাখন, কেক্ প্রভৃতি প্রাতরাশের আয়োজন লইয়া হাজির হইতে তাহার হঠাৎ যেন চমক্ লাগিল। এই সকল বস্তুতেই সে চিরদিন অভ্যস্ত, মাঝে কেবল দিন কয়েক বাধা পড়িয়াছিল মাত্র; কিন্তু টেবিলে রাখিয়া দিয়া বেহারা চলিয়া গেলে, এই জিনিসগুলির পানে চাহিয়াই আজ তাহার অরুচি বোধ হইল। ঊষা গৃহে আসিয়া পর্য্যন্ত এই সকলের পরিবর্ত্তে নিম্‌কি কচুরি প্রভৃতি তাহার স্বহস্ত-রচিত খাদ্যদ্রব্য সকালে চায়ের সঙ্গে আসিত, সে নিজে উপস্থিত থাকিত; কিন্তু আজ তাহার কোনটাই নাই দেখিয়া তাহার আহারে প্রবৃত্তি রহিল না। শুধু এক পেয়ালা চা কেৎলি হইতে নিজে ঢালিয়া লইয়া খানসামাকে ডাকিয়া সমস্ত বিদায় করিয়া দিয়া শৈলেশ পর্দ্দার বাহিরে একটা অত্যন্ত পরিচিত পদধ্বনির আশায় কান খাড়া করিয়া রাখিল। এবং না-খাওয়ার কৈফিয়ৎ যে একটু কড়া করিয়াই দিবে এই মনে করিয়া সে ধীরে ধীরে অযথা দেরি করিয়া পেয়ালা যখন শেষ করিল তখন চা ঠাণ্ডা এবং বিস্বাদ হইয়া গেছে; ফিরিয়া আসিয়া লোকটা শূন্য পেয়ালা তুলিয়া লইয়া গেল, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না,—ঊষা এ ঘরে প্রবেশ করিল না।

ক্রমে বেলা হইয়া উঠিল; স্নানাহার সারিয়া কলেজের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। খাবার সময় আজও ঊষা অন্যান্য দিনের মত কাছে আসিয়া বসিল; তাহার আগ্রহ, যত্ন বা কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন প্রভেদ বাড়ীর কাহারও কাছে ধরা পড়িল না, পড়িল শুধু শৈলেশের কাছে। একটা রাত্রির মধ্যে একটা লোক যে বিনা চেষ্টায় বিনা

আড়ম্বরে কতদূরে সরিয়া যাইতে পারে, ইহাই উপলব্ধি করিয়া সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কলেজে যাইবার পোষাক পরিতে এ ঘরে ঢুকিয়া এখন প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল টেবিলের উপরে সংসার-খরচের সেই ছোট্ট খাতাটি। হয় ত, কাল হইতেই এম্‌নি পড়িয়া আছে, সে লক্ষ্য করে নাই,—না হইলে তাহারই জন্য ঊষা এইমাত্র রাখিয়া গেছে তাহা সম্ভবও নয়, সত্যও নয়। আজও ত মাস শেষ হয় নাই,—অকস্মাৎ এখানে ইহার প্রয়োজন হইলই বা কিসে? তথাপি গলার টাই বাঁধা তাহার অসমাপ্ত হইয়া রহিল, কতক কৌতূহলে, কতক অনমনস্কতাবশে একটি একটি করিয়া পাতা উল্টাইয়া একেবারে শেষ পাতায় আসিয়া থামিল। পাতায় পাতায় একই কথা,—সেই মাছ শাক আলু পটল চালের বস্তা, দুধের দাম, চাকরের মাইনে,—কাল পর্য্যন্ত জমা হইতে খরচ বাদ দিয়া মজুত টাকার অঙ্ক স্পষ্ট করিয়া লেখা। এই লেখা যেদিন আরম্ভ হয় সেদিন সে এলাহাবাদে। তখনও তাহার হাত ছিলনা, আর আজ এইখানেই যদি ইহার সমাপ্তি ঘটে তাহাতেও তেম্‌নি হাত নাই। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রথম দিনের প্রথম পাতাটির প্রতি শৈলেশ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল। এই জিনিসটা সংসারে তাহার দুদিনের ব্যাপার। অগেও ছিলনা, পরেও যদি না থাকে ত সংসার অচল হইয়া থাকিবেনা,—দু'দিন পরে হয়ত সে নিজেই ভুলিবে। তবুও কত কি-ই না আজ মনে হয়। খাতাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পুনশ্চ টাই বাঁধার কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া হঠাৎ এই কথাটাই আজ তাহার সব চেয়ে বড় করিয়া মনে হইতে লাগিল, এ জগতে কোন-কিছুর মূল্যই একান্ত করিয়া নির্দ্দেশ করা চলেনা। এই খাতা, এই হিসাব লেখারই একদিন প্রয়োজনের অবধি ছিলনা, আবার এক-দিন সেই সকলই না কতখানি অকিঞ্চিৎকর হইতে চলিল!

অবশেষে পোষাক পরিয়া শৈলেশ যখন বাহির হইয়া গেল, তখন সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও সে ঊষাকে ডাকিয়া কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অপরিজ্ঞাত ভবি-ষ্যতের মধ্যে মন তাহার বারম্বার আছাড় খাইয়া মরিতে লাগিল, তথাপি অনিশ্চয় আশঙ্কাকে সুনিশ্চিত দুর্ঘটনায় দৃঢ় করিয়া লইবার সাহসও সে নিজের মধ্যে কোন ক্রমেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না।

১১

কলেজের ছুটির পরে শৈলেশ বাটী না ফিরিয়া সোজা বিভার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল অনুমান তাহার নিতান্ত মিথ্যা হয় নাই। ভগিনীপতি আদালতে বাহির হন নাই, এবং ইতিমধ্যেই উভয়ের মধ্যে একপ্রকার রফা হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া সে তৃপ্তি বোধ করিল। কহিল, কই সোমেনকে আন্‌তে ত লোক পাঠালে না বিভা?

বিভা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, ক্ষেত্রমোহন কহিল, হাতি যে কিন্‌ছিল সে নেই।

তার মানে?

ক্ষেত্রমোহন বলিল, তুমি গল্প শোননি? কে একজন মাতাল নাকি নেশার ঝোঁকে রাজার হাতি কিন্‌তে চেয়েছিল। পরদিন ধরে এনে এই বেয়াদপির কৈফিয়ৎ চাওয়ায় সে হাত জোড় করে বলেছিল, হাতিতে তার প্রয়োজন নেই, কারণ, হাতির যে সত্যিকারের খরিদ্দার সে আর নেই, চলে গেছে। এই বলিয়া সে নিজের রসিকতায় হাসিতে লাগিল, এবং পরে হাসি থামিলে বলিল, এই গল্পটা শুনিয়ে বৌঠাক্‌রুণকে রাগ করতে বারণ কোরো শৈলেন, সত্যিকার খদ্দের আর নেই—সে চলে গেছে। মায়ের চেয়ে পিসির কাছে এসে যদি ছেলে বেশি মানুষ নয়, তার চেয়ে না হয় ধার-গোর করে বিভাকে একটা হাতিই আমি কিনে দেব। এই বলিয়া সে বিভার অলক্ষে মুখ টিপিয়া পুনরায় হাসিতে লাগিল।

কিন্তু এ হাসিতে শৈলেশ যোগ দিলনা, এবং পাছে পরিহাসের সূত্র ধরিয়া বিভার সুপ্ত ক্রোধ উজ্জীবিত হইয়া উঠে, এই ভয়ে সে প্রাণপণে আপনাকে সম্বরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

ক্ষেত্রমোহন লজ্জিত হইয়া কহিল, ব্যাপার কি শৈলেশ?

শৈলেশ কহিল, বিভার কথায় সোমেনের সম্বন্ধে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, কিন্তু সে যখন হবেনা তখন আবার কোন একটা নূতন ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।

ক্ষেত্রমোহন কহিল, অর্থাৎ, ডাইনির হাতে ছেলে বিশ্বাস করা যায়না,—না?

শৈলেশ বলিল, এই কটূক্তির জবাব না দিয়েও এ কথা বলা যেতে পারে যে ঊষা শীঘ্রই চলে যাচ্চেন।

চলে যাচ্চেন? কোথায়?

শৈলেশ কহিল, যেখান থেকে এসেছিলেন,—তাঁর বাপার বাড়ীতে।

ক্ষেত্রমোহনের মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে স্ত্রীর মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, আমি এই বয়সই কতকটা ভয় করেছিলাম শৈলেশ।

বিভা এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও কহে নাই, স্বামীর সুপরিচিত কণ্ঠস্বরের অর্থ সে বুঝিল, কিন্তু মুখ ফিরাইয়া সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আমাকে নিমিত্ত করেই কি তুমি এই ব্যবস্থা করতে যাচ্চো? তা' যদি হয়, আমি নিষেধ কোরবনা, কিন্তু একদিন তোমাদের দুজনকেই কাঁদতে হবে বলে দিচ্চি।

শৈলেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তাহার পরে সে মুসলমান ভৃত্য রাখা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ সকালের সেই খাতাটার কথা পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বিবৃত করিয়া কহিল, যেতে আমি বলিনি, কিন্তু যেতে বারণও আমি দেব না। আত্মীয় বন্ধু মহলে একটা আলোচনা উঠ্‌বে, এবং তাতে যশ আমার বাড়বেনা তাও নিশ্চয় জানি, কিন্তু প্রকাণ্ড ভুলের একটা সংশোধন হয়ে গেল, তার জন্যে ভগবানকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দেব।

বিভা মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, ক্ষেত্র-মোহনও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোনরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করিল না। শৈলেশ কহিল, তোমাদের কাছে সমস্ত জানানো কর্ত্তব্য বলেই আজ আমি এসেছি। অন্ততঃ তোমরা না আমাকে ভুল কর।

ক্ষেত্রমোহন সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, তার সাধ্য কি। হাঁ হে শৈলেশ, ভবানীপুরে সেই যে একবার একটা কথাবার্ত্তা হয়েছিল, ইতিমধ্যে তাঁরা আর কেউ খবর টবর নিয়েছিলেন কি?

শৈলেশ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, তোমার ইঙ্গিত এত অভদ্র এবং হীন যে আপনাকে সাম্‌লানো শক্ত। তোমাকে কেবল এই বলেই ক্ষমা করা যায় যে, কোথায় আঘাত কোরচ তুমি জানোনা। এই বলিয়া সে ভিতরের উত্তাপে একবার নড়িয়া চড়িয়া আবার সোজা হইয়া বসিল।

ক্ষেত্রমোহন তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অবিচলিত-ভাবে এবং অত্যন্ত সহজে স্বীকার করিয়া লইয়া কহিল, সে ঠিক। যায়গাটা যে তোমার কোথায় আমি ঠাওর করতে পারিনি।

শৈলেশ নিরতিশয় বিদ্ধ হইয়া বলিল, নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই সেদিন যে ব্যবহার করলে,—তাতে আমি আর তোমার কাছে কি বেশি প্রত্যাশা করতে পারি! তোমার দম্ভে ঘা লাগ্‌বে বলেই কখনো কিছু বলিনি, কিন্তু বহুপূর্ব্বেই বোধ করি বলা উচিত ছিল।

ক্ষেত্রমোহন মুচকিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাই ত হে শৈলেশ, it reminds;—স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার! ওটা আজও ঠিক শিখে উঠ্‌তে পারিনি—শেখবার বয়সও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—কিন্তু তুমি যদি এ সম্বন্ধে একটা বই লিখে যেতে পারতে ভাই——আচ্ছা, তোমরা ভাই-বোনে ততক্ষণ নিরিবিলি একটু পরামর্শ কর, আমি এলাম বলে। এই বলিয়া সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

শৈলেশ চেঁচাইয়া বলিল, বই লিখ্‌তে হয়ত দেরি হতেও পারে, কিন্তু ততক্ষণ শুনে যাও, ওই যে তুমি ভবানীপুরের উল্লেখ করে বিদ্রূপ করলে, তাঁরা কেউ আমার খবর নিন্ বা না নিন্ আমাকে উদ্যোগী হয়ে নিতে হবে।

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের বাহিরে হইতে শুধু জবাব দিল, নিশ্চয় হবে। এম্‌নিই ত অযথা বিলম্ব হয়ে গেছে।

পরদিন সকালেই আসিয়া ক্ষেত্রমোহন পটলডাঙ্গার বাড়ীতে দেখা দিলেন। শৈলেশ স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, অকস্মাৎ অসময়ে ভগিনীপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কালকের অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপারের পরে অযাচিত ও এত শীঘ্র ইঁহাকে সে আশা করে নাই। মনে মনে কতকটা লজ্জাবোধ করিয়া কহিল, আজ কি হাইকোর্ট বন্ধ না কি?

ক্ষেত্রমোহন সহাস্যে বলিল, প্রশ্ন বাহুল্য।

শৈলেশ কহিল, তবে কি প্র্যাক্‌টিশ ছেড়ে দিলে না কি?

ক্ষেত্রমোহন বলিল, ততোধিক বাহুল্য।

শৈলেশ কহিল, বোধ করি আমিও বাহুল্য। আমার স্নানের সময় হয়েছে তাতে বোধ করি তোমার আপত্তি হবেনা ?

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিল, না। তুমি যেতে পারো।

বৌঠাকরুণ, আস্‌তে পারি ?

পূজার ঘর এ গৃহে ছিল না। শোবার ঘরের একধারে আসন পাতিয়া ঊষা আহ্নিকে বসিবার আয়োজন করিতেছিল ; কণ্ঠস্বরে চিনিতে পারিয়া ভিজা চুলের উপর অঞ্চল টানিয়া দিয়া আহ্বান করিল, আসুন।

ক্ষেত্রমোহন ঘরে ঢুকিয়াই অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, অসময়ে এসে অত্যাচার করলুম। হঠাৎ বাপের বাড়ী যাবার খেয়াল হয়েছে না কি ? বাবা কি পীড়িত ?

ঊষা কহিল, বাবা বেঁচে নেই।

ওঃ—তা'হলে মা'র অসুখ না কি ?

ঊষা বলিল, তিনি বাবার পূর্ব্বেই গেছেন।

ক্ষেত্রমোহন ভয়ানক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তা'হলে যাচ্ছেন কোথায় ? আছে কে ? এমন যায়গায় ত কোন মতেই যাওয়া হতে পারে না। শৈলেশের কথা ছেড়ে দিন, আমরাই ত রাজি হতে পারিনে।

ঊষা মুখ নিচু করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, পারবেন না ? না, কিছুতেই না।

কিন্তু এতকাল ত আমার সেই দাদার বাড়ীতেই কেটে গেছে ক্ষেত্রবাবু। অচল হয়ে ত ছিল না।

ক্ষেত্রবাবু কহিলেন, যদি নিতান্তই যান্, ফিরতে ক'দিন দেরি হবে তা সত্যি করে বলে যান। না হলে কিছুতেই যেতে পাবেননা।

ঊষা নীরব হইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, কিন্তু সোমেন ?

ঊষা কহিল, তার পিসি আছেন।

ক্ষেত্রমোহন হঠাৎ হাত জোড় করিয়া কহিলেন, সে আমার স্ত্রী। আমি তার হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।

ঊষা মৌন হইয়া রহিল।

পারবেন না ক্ষমা করতে ?

ঊষা তেম্‌নি নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্রমোহন নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, জগতে অপরাধ যখন আছে, তখন তার দুঃখ-ভোগও আছে, এবং থাক্‌বারই কথা। কিন্তু এর বিচার নেই কেন বল্‌তে পারেন ?

ঊষা কহিল, অর্থাৎ, একজনের অপরাধের শাস্তি আর একজনকে পোহাতে হয় কেন ? হয় এইমাত্রই জানি, কিন্তু কেন, তা আমি জানিনে ক্ষেত্রমোহন বাবু।

করে যাবেন ?

দাদা নিতে এলেই। কালও আস্‌তে পারেন।

ক্ষেত্রমোহন বাবু ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলেন, একটা কথা আপনাকে কোনদিন জানাবো না ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ মনে হচ্চে, গোপন রাখ্‌লে আমার অপরাধ হবে। আপনার আসবার পূর্ব্বে এ বাড়ীতে আর একজনের আসবার সম্ভাবনা হয়েছিল। মনে হয় সে ষড়যন্ত্র একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

ঊষা কহিল, আমি জানি।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তাহলে রাগ করে সেই ষড়যন্ত্রটাই কি অবশেষে জয়ী হতে দেবেন ? এতেই কি—

কথা শেষ হইতে পাইল না। ঊষা শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, জয়ী হোক্ পরাস্ত হোক্ ক্ষেত্রমোহনবাবু আমাকে আপনি ক্ষমা করুন,—এই বলিয়া ঊষা দুই হাত যুক্ত করিয়া এতক্ষণ পরে ক্ষেত্রমোহনের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিল।

সেই দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষেত্রমোহন নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

সাময়িকী

আমাদের 'ভারতবর্ষ' এই আষাঢ় মাসে দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল ; ইহার জন্য সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা শ্রীভগবানের চরণে আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করিতেছি। এগার বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গত পরলোকগত মনস্বী দ্বিজেন্দ্রলাল বার্ষিক ছয়টাকা মূল্যের সাময়িক-পত্র 'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন, তখন শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ পর্য্যন্তও ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইয়াছিলেন। তাহার পর, যখন দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই অকস্মাৎ সকলকে গভীর শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন, তখন কেহই মনে করেন নাই যে, 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হইবে। ভগবানের অপার করুণায়, সহৃদয় সাহিত্য-সেবকগণের সাহচর্য্যে, পাঠকপাঠিকাগণের আন্তরিক অনুরাগে প্রণোদিত হইয়া 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারিগণ বিপুল উৎসাহে অগ্রসর হইয়া 'ভারতবর্ষ'কে এই একাদশবর্ষ কাল সাহিত্য-সেবক ও পাঠকপাঠিকাগণের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আজ দ্বাদশ বর্ষে প্রবেশ করিয়া আমরা সকলের নিকট সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। 'ভারতবর্ষে'র সেবার জন্য আমরা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছি, আমাদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছি ; ত্রুটী-বিচ্যুতি যে হয় নাই, এ কথা কেমন করিয়া বলিব ; কিন্তু সে সকলই আমাদের অক্ষমতার ফল, আমাদের ইচ্ছাকৃত ত্রুটী নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় মনীষী ব্যক্তি কর্ণধার থাকিলে 'ভারতবর্ষে'র শোভা-সৌন্দর্য্য যে অধিকতর মনোজ্ঞ হইত, সে কথা কে অস্বীকার করিবে ? তবুও আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই একাদশ বৎসর 'ভারতবর্ষ' সম্পাদন করিয়াছি। 'ভারতবর্ষ' সাময়িক পত্রিকা-ক্ষেত্রে কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে, সে কথা পাঠকগণ বিচার করিবেন ; আমরা সেবক,—সেবার অধিকার লাভ করিয়াই আমরা কৃতার্থ। সকলের শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া আমরা দ্বাদশবর্ষে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম ; আমাদের পাথেয় বঙ্গভাষার সেবকগণের আশীর্ব্বাদ ; —তাহাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ; আশা আছে, এ সম্পদ হইতে কেহই আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না।

এখন দেখিতেছি, বাঙ্গলা দেশের প্রধান কথা তারকেশ্বর। শুধু তারকেশ্বর কেন, ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেবস্থানেরই কলঙ্ক-কাহিনী সুদীর্ঘকাল হইতে সকলে শুনিয়া আসিতেছেন, নীরবে সহ্য করিয়াও আসিতেছেন। মধ্যে মধ্যে সামান্য একটু-আধটুকু যে চেষ্টা হয় নাই, দেবস্থানগুলির ব্যবস্থার জন্য যে হিন্দুজনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু সে চেষ্টার মধ্যে তেমন আগ্রহ ছিল না, তেমন একাগ্রতা ছিল না ; তাই কোন ফলই হয় নাই ; দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত অর্থ দেবসেবার ব্যয় না হইয়া মঠাধিকারিগণের বিলাস-ব্যসনে নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে ; ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী নীরবে এ দৃশ্য দেখিয়াছে, এ ব্যভিচার সহ্য করিয়াছে। কিন্তু অন্যায় অত্যাচার ব্যভিচারেরও একটা সীমা আছে ; সহিষ্ণুতারও একটা গণ্ডী আছে। সেই সীমা সেই গণ্ডী অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাই, তারকেশ্বর তীর্থকে উপলক্ষ করিয়া এতকালের ধূমায়িত বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে ; তাই তারকেশ্বরে আজ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে ; মোহন্তকে অপসারিত করিবার জন্য হিন্দু নরনারী বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই প্রচেষ্টা সার্থক হইলে যে, অন্যান্য দেবস্থানের কলঙ্কমোচনেরও আয়োজন হইবে, তাহারও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যাহাতে দেবস্থানগুলির কলঙ্ক দূর হয়, যাহাতে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি ও অর্থ দেবসেবায় ও জনহিতে প্রযুক্ত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে দেশবাসী লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। আমরা বর্ত্তমানে প্রচেষ্টার সফলতা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

পাবনা সিরাজগঞ্জে অনেকগুলি সম্মিলন হইয়া গেল ; বঙ্গীয় রাষ্ট্র-সম্মিলন ; (২) হিন্দু-সভা ; (৩) খিলাফত সম্মিলন ; (৪) যুবক সম্মিলন ; (৫) খাদি প্রতিষ্ঠান। সকল সম্মিলনের কার্য্যই কোন রকমে সম্পাদিত হইয়াছে। খাদি-প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎসর্গীকৃত-জীবন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এদেশে খদ্দর প্রচলনের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার কথা না বলিলেও হয় ; সিরাজগঞ্জে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, নতজানু হইয়া সকলকে খদ্দর ব্যবহার করিবার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই বৃথা হইবে না। হিন্দুসভা-অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে অস্পৃশ্য ও অনুন্নত জাতিগুলিকে 'আচরণীয়' বলিয়া গ্রহণ করাই প্রধান। তাঁহারা শুধু বক্তৃতা করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই ; যাহাদের জল অচল ছিল, সেই সকল শ্রেণীর হস্ত হইতে সকলেই জল ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়া প্রস্তাবটী কথঞ্চিৎ কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। যুবক-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীমান দিলীপকুমার রায় যুবকদিগকে উন্নত-চরিত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য যে সুন্দর প্রাণস্পর্শী অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিলে বাঙ্গালী যুবকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাঁহাদের শিক্ষা সার্থক হইবে। রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতি সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ বেশ হইয়াছে। তিনি একটী খাঁটি কথা বলিয়াছেন ; দেশের লোকের দৃষ্টি যতদিন পল্লীর প্রতি আকৃষ্ট না হইবে, ততদিন স্বরাজই বল, আর যা-ই বল, কোন কিছুই হইবে না। আমরাও এতদিন ধরিয়া এই কথাই বলিয়া আসিতেছি। রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের সভাপতি

৺রাজা শ্রীনাথ রায়

ভাগ্যকুলের জমিদার রাজা শ্রীনাথ রায় ৺টা জুন প্রাতঃকালে তাঁহার ভাগ্যকুলস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। রাজার পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য হাজার হাজার লোক তাঁহার শবদেহ সৎকারের সময় শ্মশানে সমবেত হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই রাজা শ্রীনাথের ধর্ম্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল। দেশে এমন কোন সদনুষ্ঠান নাই, যাহার সহিত তাঁহার নাম জড়িত নাই। ঢাকা সারস্বত সমাজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজা শ্রীনাথ পূর্ব্ববঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচারের জন্য বৎসরে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ঢাকার চক্ষুরোগের চিকিৎসালয়টি তিনি তাঁহার পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সংক্রামক রোগীদের ওয়ার্ডটি তাঁহার পিতার নামে করিয়া দিয়াছিলেন। মুন্সিগঞ্জ এবং সীতাকুণ্ড জলের কলে তিনি অনেক টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। ঋণপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্য, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যকল্পে বহু অর্থ দান করিতেন। রাজা শ্রীনাথ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। গত ৫ বৎসরকাল হইতে তিনি কেবল ধর্ম্মসাধনা লইয়াই ধ্যান-ধারণাতেই কালাতিপাত করিতেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত সুবৃহৎ উপন্যাস "বিপর্য্যয়" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ৩৲

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় প্রণীত "মুক্তির ডাক" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ।৵০।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সত্যের সন্ধান" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ২৲।

শ্রীমতী কিরণলেখা রায় প্রণীত "জলখাবার" প্রকাশিত হইল মূল্য ২৲

ডাঃ বিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল প্রণীত "বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রেততত্ত্ব" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ॥০

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মণ্ডল প্রণীত "ঝড়ের আলো" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ১৷০

শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত "সাথী" প্রকাশিত হইল মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম-এ, বি-এল ও শ্রীশ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী সঙ্কলিত বিশুদ্ধিমার্গ প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল মূল্য ৩৲

আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালা ১০০ সংখ্যক পুস্তক শ্রীমতী সুষমা সিংহ প্রণীত "বাজীওয়ালী" প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'র পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ॥৹

৺কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা হইতে প্রকাশয়িতব্য 'সমাজহিতকর গ্রন্থমালা'র প্রথম সংখ্যা রূপে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দেবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম-এ সঙ্কলিত "আলোচনা চতুষ্টয়" প্রকাশিত হইল মূল্য ॥০

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea,**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

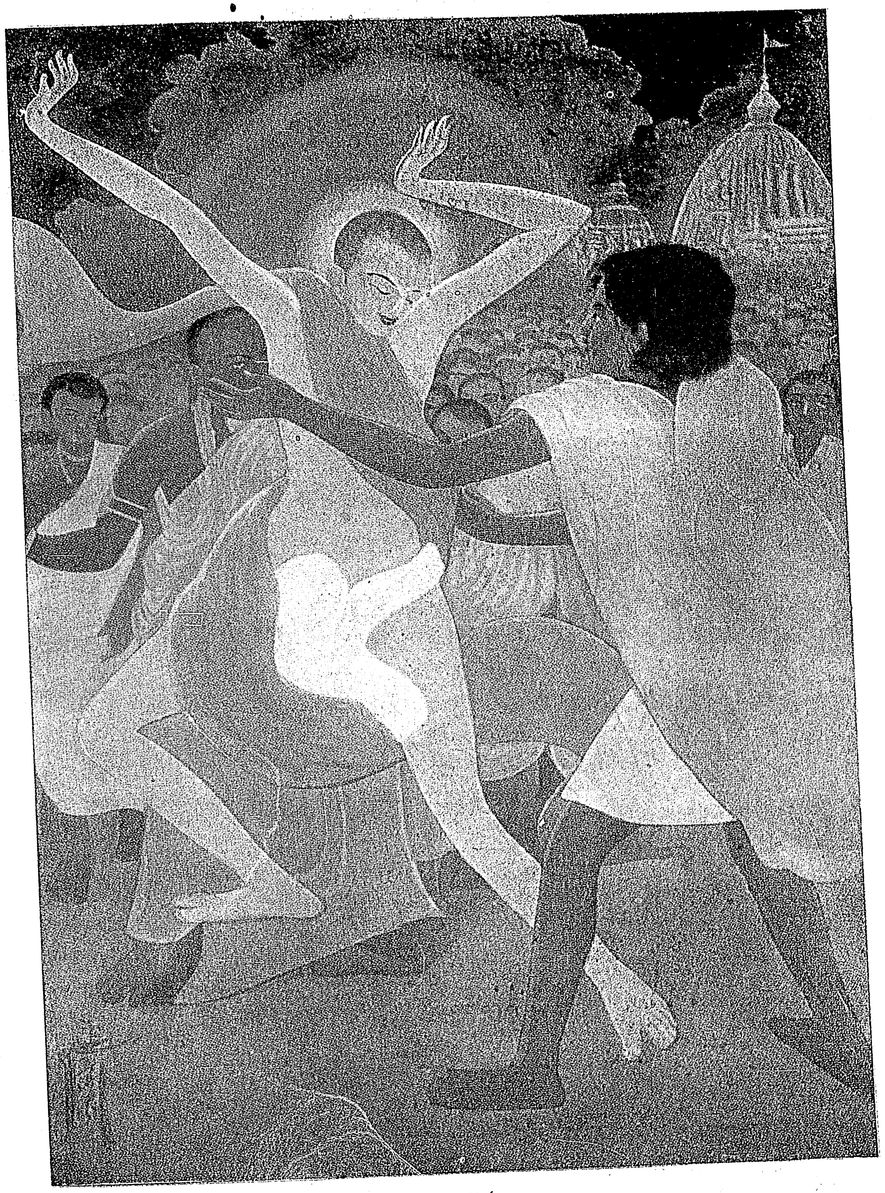

রথাগ্রে শ্রীচৈতন্য

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়.
শিল্পাচার্য্য—অক্ষ্র জাতীয় কলাশালা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.